সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
এম.ফিল (২য় বর্ষ)
রেজিঃ নং-৬৭, শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

436770

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
এম.ফিল (২য় বর্ষ)
রেজিঃ নং-৬৭, শিক্ষাবর্ষ : ২০০২-২০০৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Library
436770

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়কঃ
ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

436779

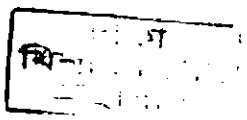

গবেষকঃ
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৬৭
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,
বাংলাদেশ।

তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নাম ও ঠিকানা

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

Dr. Muhammad Anser Uddin
Professor & Chairman
Department of Islamic Studies
University of Dhaka,
Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম. ফিল গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য দাখিলকৃত **"সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণা থিসিসটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'সামাজিক অনাচার' প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়ার দাবি রাখে। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত বা উপস্থাপিত হয়নি। আমি গবেষণা থিসিসটির পান্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

১৮/১২/০৫

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এর পূর্বে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি এবং কোন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অন্যকোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপন করিনি।

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৬৭
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০২-২০০৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেতঃ

১.	AIDS(এইডস)	ঃ	Acquared Immune Deficiency Syndrome.
২.	জেএমবি	ঃ	জামা'আতুল মুজাহিদীন অফ বাংলাদেশ।
৩.	UNO	ঃ	United Nations Organization.
৪.	GOVT.	ঃ	Government.
৫.	পিএফ.এ	ঃ	বেইজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশন।
৬.	NAP.	ঃ	National Action plan.
৭.	G.O	ঃ	Government Organization.
৮.	NGO	ঃ	Non Government Organization.
৯.	HIV	ঃ	Human Immune Virus.
১০.	FBI	ঃ	Federal Bureau of Investigation.
১১.	MAFIA	ঃ	ধ্বংসাত্মক আন্তর্জাতিক দূষ্টচক্র।
১২.	MOB	ঃ	উচ্ছৃংখল জনতার সমাবেশ।
১৩.	SAARC	ঃ	South Asia Association for Regional Co-operation.
১৪.	OSD	ঃ	Officer in Special Duty
১৫.	বিডিআর	ঃ	বাংলাদেশ রাইফেল্‌স।
১৬.	ভি.ডি.পি	ঃ	ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি।
১৭.	ওসি	ঃ	অফিসার ইনচার্জ।
১৮.	ডিবি	ঃ	ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ।
১৯.	এসি	ঃ	এসিস্ট্যান্ট কমিশনার।
২০.	এডিসি	ঃ	এডিশনাল ডিপুটি কমিশনার।
২১.	এসআই	ঃ	সাব ইন্সপেক্টর।
২২.	বিসিএস	ঃ	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস।
২৩.	ওসি.সি.	ঃ	ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার।
২৪.	আসক	ঃ	আইন ও সালিশ কেন্দ্র।
২৫.	দুদক	ঃ	দুর্নীতি দমন কমিশন।
২৬.	এম.এম.সি	ঃ	ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার।
২৭.	আইজি	ঃ	ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. ইউএনও	ঃ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
২৯. ইউপি	ঃ	ইউনিয়ন পরিষদ।
৩০. এলজিইডি	ঃ	লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট।
৩১. ওয়াসা	ঃ	ওয়াটার সাপ্লাই অথরিটি।
৩২. ডিপিএইচই	ঃ	ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং।
৩৩. TIB	ঃ	Transparency International Bangladesh.
৩৪. এন.এস.এফ	ঃ	ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফোরাম।
৩৫. ডাকসু	ঃ	ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন।
৩৬. পিএলও	ঃ	প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন।
৩৭. এম.পি	ঃ	মেম্বর অফ পার্লামেন্ট।
৩৮. টিভি	ঃ	টেলিভিশন।
৩৯. ভি আই পি	ঃ	ভেরি ইম্পরটেন্ট পার্সন।
৪০. BBS	ঃ	Bangladesh Bureau of statistic.
৪১. ইয়াবা	ঃ	এক ধরনের মাদক।
৪২. DNA	ঃ	(Deoxyribo Nucleic Acid).
৪৩. CIA	ঃ	Central Intelligent Agency.
৪৪. IPGMR	ঃ	Institute of Post Graduate Medicine Research.
৪৫. NNP(এন এন পি)	ঃ	National Nutrition Project.
৪৬. RAB	ঃ	Rapid Action Battalion.
৪৭. WHO	ঃ	World Health Organization.
৪৮. ACD(এসিডি)	ঃ	Association for Community Development.

বর্ণ সংকেতঃ-

ক্রমিক নং	বিশ্লেষণ	ক্রমিক নং	বিশ্লেষণ
১.	(ড.)= ডক্টর	৯.	(ইং)= ইংরেজী
২.	(আঃ)=আলাই হিস্ সালাম	১০.	(খৃঃ)= খৃষ্টাব্দ
৩.	(দঃ)= সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	১১.	(পৃঃ)=পৃষ্ঠা
৪.	(সাঃ)= সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম	১২.	(প্রাগুপ্ত)=পূর্বে উক্ত যাহা
৫.	(রাঃ)= রাদি আল্লাহু' আনহু	১৩.	(দ্রঃ)=দ্রষ্টব্য
৬.	(রহঃ)= রাহমাতুল্লাহি আলাইহি	১৪.	(আঃ)= আব্দুল
৭.	(মুঃ)= মুহাম্মদ	১৫.	(হিঃ)= হিজরী
৮.	(বাং= বাংলা	১৬.	(অনুঃ)= অনুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

তথ্য	বিবরণী	পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ---------- IX-X
ভূমিকা ঃ ---------- XI-XIII

প্রথম অধ্যায়ঃ ঃ সমাজ ও সামাজিক জীবনে ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি ----------	১-৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়- ----------	৩-৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	ইসলামী সমাজের উৎপত্তি ----------	৪-৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক অনাচার এর সম্পর্ক --------	৬-১৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	মানব সমাজে অনাচার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত ----------	১৭-২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সামাজিক অনাচার সমূহের প্রাথমিক ধারণা

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	অনাচারএর সংজ্ঞা ও পরিচিতি ----------	২৪-২৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক অনাচার এর স্বরূপ ও প্রকৃতি ----------	২৯-৩৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক অনাচার এর শ্রেণী বিন্যাস ----------	৩৪-৩৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	সময়ের পরিবর্তন ও বিবর্তনে অনাচার এর বিভিন্নতা ------	৩৯-৪৭

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সামজিক অনাচার ও ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক অনাচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি ---------	৪৮-৮৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক আচার আচরণে ইবাদাতের প্রভাব ----------	৮৪-৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক অনাচার দমনে হিজরতের ভূমিকা ----------	৯১-৯৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	অনাচার দমনে জিহাদের গুরুত্ব ----------	৯৩-৯৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ চলমান অনাচার সমুহ; একটি পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীও শিশু পরিস্থিতি ------	৯৮-১১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	মাদক ও মাদকাসক্তি ----------	১১৯-১৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক অনাচার হিসেবে বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র ---	১৩৩-১৪৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	সামাজিক নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস ----------	১৫০-১৬০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	চুরি-ডাকাতি ----------	১৬০-১৬১
ষষ্ট পরিচ্ছেদ	ঃ	বাংলাদেশে ছিনতাই এর ভয়াবহচিত্র ----------	১৬১-১৬৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	সুদ ও সুদপ্রথা ----------	১৬৩-১৬৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ	ঘুষ, উৎকোচ ও উপঢৌকন ----------	১৬৮-১৭০
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ	অসুস্থ চলচ্চিত্র ও অশ্লীল প্রকাশনা ----------	১৭১-১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সামাজিক অনাচার সম্পর্কিত ইসলামী দন্ডবিধি ও বিচার ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	অনাচার দমনে ইসলামী দন্ডবিধি ----------	১৭৬-১৮৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	আইন কার্যকর করণ ও বিচারপদ্ধতি ----------	১৮৪-১৮৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	শাস্তি-ই অনাচার প্রতিরোধের একমাত্র অবলম্বন নয় ----	১৯০-১৯৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার এর কারণ সমূহ ------	১৯৮-২০১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সুপারিশমালা ----------	২০১-২১০

উপসংহার ঃ ---------- ২১১-২১৪

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ---------- ২১৫-২২১

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুনাময় মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের জন্য সকল প্রসংশা, যার সীমাহীন অনুগ্রহে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব-মানবতার মুক্তির দূত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম যিনি পথহারা মানব জাতিকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।

অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনার শুরুতেই আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, যারা আমাকে অত্র শিরোনামে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ দিয়েছেন।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের স্বনামধন্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন স্যার এর প্রতি। যার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, অকুণ্ঠ ও সার্বক্ষণিক শ্রমের ফলের এই গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আমার গবেষণা কর্মটির জন্য যেভাবে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন, তার তুলনা বিরল। তিনি অভিসন্দর্ভটির পান্ডুলিপিটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এবং যথাযথ পরমর্শ দান করে আমার অস্বচ্ছ ও অজ্ঞাত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ, অধ্যায়-উপাধ্যায় বিন্যাস, উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য সংযোজন ও মুল্যবান পরামর্শই এ অভিসন্দর্ভটিকে মান সম্পন্ন করে তুলেছে। এসব কারণে আমার প্রতি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অবদান নিরবধি । আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

আমি চিরকৃতজ্ঞ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ স্যারসহ বিভাগের সকল স্যারের প্রতি, যাঁরা গবেষণাসুলভ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাকে প্রেরণা, উদ্দীপণাসহ সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জনাব আলহাজ্জ আবু নছর মোহাম্মদ নেছার উদ্দিন, অধ্যক্ষ বড়াকোঠা ইউনিয়ন ডিগ্রী কলেজ, উজিরপুর, বরিশাল এর প্রতি যিনি আমার কর্মস্থলে আইনগত ও মানবিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে এ গবেষণাকর্মের সুদূরপ্রসারী পথ পরিক্রমায় দায়ীত্ব শীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার বন্ধুবর জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তথ্য মন্ত্রণালয়কে তার মূলবান ব্যস্ততম মুহূর্তগুলোতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, পান্ডুলিপি সংশোধন করে নির্ভুল উপস্থাপনায় ফলপ্রসূ সহায়তা দিয়েছেন।

মক্তব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমার ছাত্রজীবনে যে সকল ওস্তাদ বৃন্দের সংস্পর্শে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সন্ধান পেয়ে এ মহৎ উদ্যেগে ব্রতী হওয়ার সৌভাগ্যটুকু অর্জন করতে পেরেছি, আমি সে সকল ওস্তাদবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার সহজ, সরল, কোমলমতি বাবা-মা কে যাদের অপত্য স্নেহ, অকৃতিম ভালবাসা, নিবিষ্ট মনের একনিষ্ঠ দো'আ আমাকে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেছে। তাদের সৎপরামর্শ ও উত্তম উপদেশ ছিল আমার জীবন চলার পথেয়, যা আমাকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করছে। এছাড়া আমার অত্যন্ত সহনশীল- ধৈর্যশীল স্ত্রী যার নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা ও আন্তরিকতা এ গবেষণাকর্ম বাস্তবায়নের পথ সহজ করেছে, তার কাছে ও আমি কৃতজ্ঞ।

গভীর ভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রদ্ধানিবেদন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা এবং বরিশাল, পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা এবং বরিশাল, অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি যারা তাদের গ্রন্থাগার থেকে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সংকোচহীন সহযোগিতা দান করেছেন।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার এ কষ্টার্জিত গবেষণা কর্মটুকু দেশ ও জাতীর জন্য কল্যাণকর ও পরকালীন জীবনে মুক্তির ওয়াছীলা হিসেবে কবুল করুক এটাই আমার সর্বশেষ প্রার্থনা । আমীন-

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাঃ- প্রাক ইসলামী যুগে মানুষের সমাজচিন্তা ও দর্শনের বাস্তব মূর্তি হিসেবে গর্হিত কার্যকলাপ ও অনাচারের ইতিহাস চির-শাশ্বত। ইসলামের আগমনে অনাচার মুক্ত সমাজ গড়ার শুভ ইচ্ছায় মুসলিম দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক গণের বিরামহীন প্রচেষ্টায় ইসলামী সমাজ নামক বৃহত্তর আদর্শিক সংস্থার সুত্রপাত ঘটে। ইসলামের আলোক রশ্মি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে গেলেও আদর্শচ্যুত নামধারী মুসলিম জাতি সামাজিক অনাচার নামক ঘাতক ব্যাধি লালন করে চলছেন সমাজ দেহের সর্বাঙ্গে। মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিগনিত বাংলাদেশও মরনব্যধি এইডস, ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর সামাজিক অনাচার নামক দুরারোগ্য ভাইরাসের শিকার।

পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে মিতালী আর বন্ধুত্বে আধুনিক সমাজ কাঠামো তৈরিতে সামাজিক মূল্যবোধ ভূ-লূন্ঠিত হচ্ছে। একই সাথে একই সময়ে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় সিরিজ বোমা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে জেএমবি নামধারী সন্ত্রাসী সংগঠনের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ, ফেনসিডিল, গাজা, আফিম, প্যথিডিন ইনজেকশন হিরোইন ইয়াবা সহ বিভিন্ন রূপি নেশায় আসক্ত যুব সমাজ। একই সুত্রে গাথা নর-নারীর পরস্পর শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের আর্তচিৎকারে ভারাক্রান্ত সু সজ্জিত বসুমতি । দুর্নীতির মত নির্লজ্জ-ঘৃণীত অপরাধ বিস্তৃত হচ্ছে উচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র প্রায় সকল সরকারী বেসরকারী পেশাজীবি ব্যক্তি ও সংগঠনের মাঝে গাণিতিক হারে। এদেশের তৃনমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সুদ-ঘুষ নামক পরিশ্রমহীন সহজ উপার্জনে এক শ্রেণীর মানুষ 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' আর ভিটে বাড়ী হারা নিঃস্ব অসহায় শোষিতের অভূক্ত আর্তনাদ ও আত্মবিলাপে জর্জরিত ফুটপাত, রাজপথ।

সীমান্ত রক্ষী শাসক শ্রেণীর অর্থলিপ্সা ও দায়িত্বে অবহেলার ফাকে পাচার, চোরাচালানী হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা গুলোর প্রাত্যহিক আলোচ্য বিষয়। মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির মেরুদন্ড ভেঙে দেয়ার এহেন অশুভ তৎপরতায় মেতে উঠেছে ইসলামী আদর্শ বিচ্যুত বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল। সামাজিক প্লাটফর্মে মুখরোচক আকর্ষণ মূলক প্রাঞ্জল বক্তব্যের পশ্চাতে সন্ত্রাস, নির্যাতন, দুর্নীতি, মদ্যপান, সুদ-ঘুষ, পরনিন্দা-পরচর্চা, মিথ্যাচার, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, অসদাচরণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনার অশ্লীলতা সহ অনেক গর্হিত কার্যকলাপে সমাজকে কলুষিত ও কর্দমাক্ত করে তুলেছে।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তৃনমূল অভিজ্ঞতার কসাঘাতে পিষ্ট হয়ে 'সামাজিক অনাচার' প্রতিরোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্র শিরোনামে গবেষণামূলক লেখনীর অদম্য কৌতুহল দীর্ঘ দিনের হলেও সময়-সুযোগ, যথাযথ সহযোগিতার অভাবে গবেষণা কর্ম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। অবশেষে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্দিন স্যারের গভীর প্রেরণা, অফুরন্ত সুযোগ ও ঐকান্তিক সহযোগিতা লাভের ফলে **"সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"** শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'সামাজিক অনাচার' সমূহ পর্যালোচনা ও প্রতিরোধের উপায় উদঘাটন সহ মাঠপর্যায় বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ও সুপারিশ ফুটিয়ে তোলা-ই আলোচ্য গবেষণাকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে লিখিত অলিখিত উভয় প্রকার আচরণবিধি মেনে চলতে হয়। সমাজে যে সকল কাজ আইনগত নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় সে কাজকে অপরাধ বলা হয়। আর অপরাধ জনিত আচার-আচরণ বা বিধিসম্মত আচারণবহির্ভূত ক্রিয়া কলাপ হচ্ছে 'সামাজিক অনাচার'। বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে এ ধরনের অনাচার প্রতিরোধের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য গবেষণাকর্ম সময়ের অপরিহার্য দাবী। অথচ এ সংক্রান্ত কোন গবেষণা কর্ম আমার জানামতে সার্থক ভাবে এ যাবৎ সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিচার করে আমি অত্র শিরোনামে গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করি। আমার এ গবেষণাকর্ম হুবহু গ্রন্থ নির্ভর না হওয়ার ব্যাপারে সদা সচেতন ছিলাম। তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, দলিল, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ, সাময়ীকি ও সূধীজনদের সাক্ষাত মাধ্যমে বিষয়টিকে তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য, সুস্পষ্ট, সাবলীল, প্রাঞ্জল করে সর্বস্তরের মানুষের জন্য বোধগম্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

আমি এ অভিসন্দর্ভটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তু আলোকপাত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ঃ সমাজ ও সামাজিক জীবনে ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক জীবন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে আলোকপাত করার জন্য এ আধ্যায়কে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী সমাজের উৎপত্তি, চতুর্থ পরিচ্ছেদে, সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক অনাচার এর সম্পর্ক, পঞ্চম পরিচ্ছেদে মানব সমাজে অনাচার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সামাজিক অনাচার সমূহের প্রাথমিক ধারণা

এ অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে অনাচার এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সামাজিক অনাচার এর স্বরুপ ও প্রকৃতি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সামাজিক অনাচার এর শ্রেণী বিন্যাস, চতুর্থ পরিচ্ছেদে সময়ের পরিবর্তন ও বিবর্তনে অনাচার এর বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সামজিক অনাচার ও ইসলাম

সামাজিক অনাচার এর উপর ইসলামের প্রভাব ও এক্ষেত্রে ইসলামের তাৎপার্য সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে চারটি পরিচ্ছেদে এ অধ্যায়কে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সামাজিক অনাচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সামাজিক অনাচার দমনে হিজরতের ভূমিকা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে অনাচার দমনে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, চতুর্থ পরিচ্ছেদে সামাজিক আচার আচরণে ইবাদাতের প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ চলমান অনাচার সমূহ; একটি পর্যালোচনা

এ অধ্যায়কে মোট নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীও শিশু পরিস্থিতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মাদক ও মাদকাসক্তি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সামাজিক অনাচার হিসেবে বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সামাজিক নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ চুরি-ডাকাতি
ষষ্ট পরিচ্ছেদ ঃ বাংলাদেশে ছিনতাই এর ভয়াবহ চিত্র
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ সুদ ও সুদপ্রথা
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ঘুষ, উৎকোচ ও উপঢৌকন
নবম পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ চলচ্চিত্র ও অশ্লীল প্রকাশনা

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সামজিক অনাচার সম্পর্কিত ইসলামী দন্ডবিধি ও বিচার ব্যবস্থা

এ অধ্যায়কে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ প্রথম পরিচ্ছেদ অনাচার দমনে ইসলামী দন্ডবিধি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আইন কার্যকর করণ ও বিচার পদ্ধতি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাস্তি-ই অনাচার প্রতিরোধের একমাত্র অবলম্বন নয়, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার এর কারণসমূহ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের লক্ষে সুপারিশমালা। অধ্যায় সমূহের আলোচনা শেষে গবেষণার সার সংক্ষেপের উপর একটি উপসংহার এবং পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী 'সামাজিক অনাচার' একবিংশ শতাব্দীর এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামের সুষ্ঠু, সুন্দর ও সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক নীতি মালা ও দিক-নির্দেশনা তুলে ধরার ক্ষুদ্রপ্রয়াস এই গবেষণাকর্মটি। গোটা জাতির কল্যাণে এই গবেষণাকর্মকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সমাজ ও সামাজিক জীবনে ইসলাম

মানুষ সামাজিক জীব এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ইবনে খালদুন বলেন, "এক সাথে মিলে মিশে থাকা মানুষের জন্য অপরিহার্য"। এ সত্যটিকেই জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এভাবে বিবৃত করে থাকেন যে, জন্মগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব। একই সমাজভূক্ত হিসেবেই মানব জাতির অবির্ভাব। বস্তুতঃ সমাজবদ্ধ হয়ে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে বসবাস করা মানুষের আজন্ম স্বভাব। সমাজ সংগঠনটি গড়ে উঠেছে মানুষের এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই। মানুষ সমাজ কেন্দ্রীক জীবনে বাধ্য। সমাজহীন মানবজীবন অকল্পনীয়, বরং তা নিতান্তই পাশবিক জীবনধারা। সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হচ্ছে পরিবার। মানুষের পরিবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের নৈকট্য ভিত্তিক সম্পর্ক অনিবার্য। নিকটবর্তী জীব-ই মানুষের সামাজিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ঘরের পাশে ঘর-বাড়ির পাশে বাড়ি একটি পরিবারের পাশে আরেকটি পরিবারের অবস্থানের মাধ্যমেই পাড়া ও মহল্লা গড়ে উঠে। আর এভাবে যারা কাছাকছি বাস করে, তারা পরস্পরের প্রতিবেশী। মানুষের সামাজিক জীবনের অনিবার্যতার ফলই হচ্ছে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজ মূলতঃ একটি সংগঠন। এ সংগঠনের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসে ইসলাম নামক শান্তিপূর্ণ জীবন বিধানের উপস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সমন্বয়ে। সমাজের পরিধি ক্ষুদ্র থেকে হয় বিশ্বজনীন। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষকে বসবাস করতে হলে প্রচলতি আচরণবিধি এবং কতিপয় মৌলিক প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে বসবাস করতে হয়। তাই ইটালীর সমাজ বিজ্ঞানী প্যারেটো বলেন, "সমাজ হচ্ছে অসংখ্য মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক সমন্বিত, এমন একটি জনসমষ্টি যেখানে প্রচলিত আচরণবিধির সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান"।[১] শাব্দিক অর্থে সমাজ বলতে কতগুলো অনুভূতি সম্পন্ন একই জাতীয় জীবনের সমষ্টিকে বুঝায়। কেননা এসব অনুভূতি সম্পন্ন জীব পরস্পর মানসিক সুখে আবদ্ধ। এখানে উল্লেখ্য যে সমাজ সমষ্টি দ্বারা শুধুমাত্র মানুষের সমাজকেই বুঝায় না, বরং সমগ্র জীব জগতের যে কোন এক জাতীয় প্রাণীর মানসিক সুখে আবদ্ধ হওয়াকে সমাজ বলা হয়। যেমন মৌচাকে মৌমাছির সংঘবদ্ধ জীবন, বনের গহীন স্থানে বসবাসকারী হরিণদের সংঘবদ্ধ বসবাসকেও সমাজ বলা যেতে পারে। তবে সাধারণ নিয়মে মনুষ্য সমাজকেই সাধারণত সমাজ বলে গণ্য করতে হয়।

"সমাজ একটি পরিবর্তনশীল ধারনা, তাই একে সংজ্ঞায়িত করা সত্যিই দূরূহ ব্যাপার। স্থান, কাল, সময় ভেদে সমাজের রূপ ও প্রকৃতি যেমন ভিন্ন হয় তেমনি এর সংজ্ঞাও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- সমাজ বিজ্ঞানী সামনার ও কেলার তাদের "The science of society" নামক গ্রন্থে সমাজের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা স্থির করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের মতে সমাজ বলতে একটি জনসমষ্টি বুঝায়। জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য মানুষ গোষ্ঠী জীবন-যাপনে প্রয়াসী হয়। আর এহেন গোষ্ঠী জীবনের ভেতর দিয়ে সমাজের সৃষ্টি"[২]।

"সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংসের মতে, সমাজ হল সাধারণ স্বার্থ প্রণোদিত এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যরা অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য পরস্পর সহযোগিতা করে"[৩]।

সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই বুঝেছেন। যেমন ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে সমগ্র মানব জাতিকে বুঝায়। আর সংকীর্ণ অর্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব জন সমষ্টিই এক একটি সমাজ। "সমগ্র মানবজাতি একটি বৃহৎ মানব সমাজ, আর আদিম জুনু, ভারতীয় হিন্দু এবং আমেরিকাবাসী হল বৃহৎ মানব সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টি"[৪]। সমাজের উৎপত্তি কখন কিভাবে হয়েছে তা আজও অস্পষ্ট। কারণ এর সূত্র গুলো সঠিকভাবে আবিস্কার করা আজও সম্ভব হয়নি, এজন্য সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মনীষীর নানা মত ও ভিন্ন ভিন্ন ধারণা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

ক. প্রাচীণ ও আধুনিক দার্শনিকদের ধারণা সমূহ। (Views of Ancient and modern philosophers)

---

১. স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, অনুবাদক ড. রঙ্গলাল সেন, পৃ.২০।
২. স্যামুয়েল কোনিগ, সমাজবিজ্ঞান, অনুবাদক ড. রঙ্গলাল সেন, পৃ.২০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
৪. শরীফ আহমদ, ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রাথমিক যুগের সামাজিক চিন্তাবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারণা (Views of early social Thinkers and sociologists)

গ. কোঁৎ ও স্পেনসারের ধারণা (Views of comte and Spencer)

ঘ. ডারউইন পন্থী সামাজিক বিজ্ঞানীদের ধারণা (Views of the social Darwinists).

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"সকল মানুষ সমান ভাবে পরস্পর ভাই ভাই। জাতি, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারনে মানব সমাজকে ইসলাম বিভক্ত করেনা বরং ধর্মের ভিতিতে মানুষ দুটো শ্রেনীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর একটি হল ইসলামী সমাজ অপরটি অনৈসলামী সমাজ। সাধারণত সমাজ ব্যবস্থা বলতে বুঝায় কোন বিশেষ রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও একটি অবকাঠামো যা দ্বারা সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী রীতি-নীতি, আইন-কাঠামো ও বিধি-বিধান দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। অপর কথায় যে সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার চাহিদা দায়-দায়িত্ব ইসলামের অনুশাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেটাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা "[৫]।

ইসলামী সমাজের প্রতিটি মানুষের ঘোষণা- "বলুন, আমার নামাজ আমার যাবতীয় ইবাদাত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছুই বিশ্ব প্রভূ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত"[৬]।

ইসলামী সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শ ও নেতৃত্বের পূর্ণ বাস্তবায়ন। ইসলামী সমাজ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার ফলে নিম্নবর্ণিত রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে বিন্যাস ও বর্ণনা করা যায়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ"।

১. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
২. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত।
৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সামগ্রিক ও সার্বিক কর্তৃত্ব থাকে ইসলামের।
৪. ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের আলোকে প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালিত।
৫. ইসলামী সমাজের যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা, আইন-কানুন সবকিছু ইসলাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৬. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ইসলামের কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. নৈতিকমান, নৈতিক চরিত্র এবং যাবতীয় আচার-আচরণ ইসলামের বিধান দ্বারা পরিচালিত।
৮. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পারস্পারিক যাবতীয় লেন-দেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আয়-উপার্জন, ভোগ-ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুতে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য বিদ্যমান।

---

৫. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা: পৃ. ১৩৮।

৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী : অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, তাফহীমুল কুরআন, তৃতীয় খন্ড, সুরা আনয়াম, আয়াত নং ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ইসলামী সমাজ তাওহীদ ও রিসালাত ভিত্তিক।
১০. ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও আইন-কানুন মেনে নিয়ে এ সমাজের সদস্য হওয়া যায় [৭]।

"ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে, মানুষ ও গোটা মাখলুকাতের সার্বিক নিরাপত্তা ও গ্যারান্টির সর্বজন স্বীকৃত বৃহত্তর সংগঠন। মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-সম্মানের নিরাপত্তা, মত ও ধর্মের স্বাধীনতা এবং নৈতিক মানবিক শিক্ষা প্রদানের সুবর্ণ সুযোগ অত্র সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত"[৮]। বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সমাজিক অনাচার বা অপরাধমূলক কার্যক্রম, নৈতিক অধঃপতন, অবক্ষয়, পাপ ও অপবিত্রতার পঙ্কিলতা হতে মানব সমাজকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুশ ও পবিত্র করতে চায়। সে জন্য মদপান হারাম করা হয়েছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চুরি-ডাকতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, হত্যা ও নির্যাতনকে অমার্জনীয় অপরাধ ও কঠিন পাপ বলে ঘোষণা করেছে, তেমনিভাবে অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, পর্দাহীনতা, নাচ-গান, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতি অশ্লীলতা ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এসমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজের উৎপত্তি

সমাজ মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট কতিপয় রীতি-নীতি, আইন কানুন, আচারণগত অবকাঠামো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির প্রারম্ভেই সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে অতি ক্ষুদ্র একটি সমাজ কাঠামোর অবতারণা ঘটান। পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের মৌল বা একক। একাধিক পরিবার সৃষ্টির আগে পৃথিবীর আদিম পরিবার নামে পরিচিত হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর পারিবারিক জীবনের আদর্শ, রীতি-নীতি পৃথিবীর প্রথম সমাজ চেতনার জন্ম দেয়। তাই মানব সমাজ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি হল দুনিয়াতে সমস্ত মানুষ এক আদমের সন্তান। ইসলামী সমাজের ভিত্তি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন,

"হে মানব জাতি! তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্টিতে পরিণত করেছি যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পার। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নীতিপরায়ন তথা খোদা ভীরু। আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সবকিছুর ব্যপারে খবর রাখেন"[৯]।

---

৭. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচারঃ (শিরীন পাবলিকেশন্স ১৩৮১বাংলা), পৃ.১৪৮।
৮. ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ.৪৮।
৯. আল কুরআন, সুরা হুজরাত, আয়াত নং ১২

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষের জীবনের গতিধারা মৌলিক চাহিদা ও হৃদয়ের অনুভূতি এক ও অভিন্ন। মানুষ পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের অধিবাসী হোক না কেন তাদের সব কিছুতেই যেন একটা মিল ঐকতান রয়েছে"[১০]। পৃথিবীর সকল মানুষ ছিল একটি সমাজ ভূক্ত। একই চেতনায় অভিন্ন বন্ধন ও অবিচ্ছিন্ন মমতায় ঘেরা একটি মাত্র সমাজের চিত্র পবিত্র আল কুরআনে লক্ষণীয়, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত পৃথিবীর প্রথম সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বীকৃত। আদেশ-নিষেধ, উপদেশ তথা স্বীকৃত নীতিমালা বা প্রচলিত নিয়ম-কানুন এর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে সমাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক আদেশ নিষেধের বিষয়টি পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব মানবী হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) এর জীবন চক্রে লক্ষণীয়, যেমন– আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেস্তে বসবাস কর এবং এখান থেকে যাহা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দে ভক্ষণ করতে থাক"[১১]।

আবার এখানে আরও বলা হয়েছে, "কিন্তু কখনো ঐ গাছটির নিকটবর্তী হইও না, তাহলে জালিমের অন্তর্ভূক্ত হবে"।[১২]

পাশাপাশি দুটি আয়াত দ্বারা প্রথমে আদেশ, সাথে সাথে আবার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিও লক্ষণীয়। আদেশ-নিষেধ এবং আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মানব মানবীর জীবন চক্রের মধ্য দিয়ে ইসলামী সমাজ চেতনা বা সমাজ ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী রাসূলদের প্রেরণ করে আত্মভোলা দিশেহারা মানুষদেরকে শান্তিময় সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সামাজ কায়েমে আত্মনিয়োগকৃত ৬১০খৃঃ হেরা গুহায় প্রাপ্ত ঐশীবাণীর ধারক ও বাহক রাহমাতুল্লিল আলামীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নাম চির শ্বাশ্বত ও অম্লান। "হযরত আদম হাওয়া এর মাধ্যমে ইসলামী সমাজের উৎপত্তি সংঘটিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার উৎসমূল ইসলামী সমাজের প্রকৃত উৎপত্তি এবং যথার্থ বিকাশ লাভ করে মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ ও সফল নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে"[১৩]।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ইসলামকে শুধুমাত্র 'ধর্ম' শব্দটির পরিচয়ে বর্ণনা করা যাবে না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে– ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি মাত্র দিক বা শাখা। ইসলাম নামক আদর্শটির আগমন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে। ইসলাম এসেছে পাঁচটি ভিত্তির উপর ভয় করে। যথা "(১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) রমজান মাসে রোজা রাখা (৫) বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করা (হজ্ব করা)"[১৪]।

এই পাঁচটি স্তম্ভের প্রথমটির অনুকরণ করেই (আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা রাসূল) ৩৫০ বছর পর আল্লাহর নিকট থেকে তাদের কৃত অপরাধের ক্ষমা লাভ করেছিলেন। সুতরাং মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের সূত্রপাত ঘটান যা ইসলামী সমাজ নামে পরিচিত।

---

১০. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, ঢাকা শীরীন পাবলিকেশন্স ১৩৮১ বাংলা পৃ. ১৯৩।

১১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং

১২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং

১৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, (মিশর) কেরামত আলী নিজামি কর্তৃক অণুমোদিত (ঢাকা শীরিন পাবলিকেন্স) ইসলাম ও সামাজিক বিপ্লব, পৃ. ১৯৩.

১৪. মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ০১।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক অনাচারের সম্পর্ক

"তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বহুমূখী ও পরস্পর নির্ভরশীল জটিল সামাজিক সমস্যা ও অনাচারে জর্জরিত। এ দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিক সমস্যাবলী, সামাজিক অনাচার ও অপরাধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিষয়গুলো পরস্পর নির্ভরশীল ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল এবং বহুমাত্রিক"[১৫]। কোন অনাচার বা সমস্যাই একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করছে না। প্রতিটি সমস্যা এবং অনাচার পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যটির কারণরূপে সমাজের সর্বত্র বিরাজ করছে। সামাজিক সমস্যাসমূহ ক্ষতিকর রূপে অপরাধ প্রবণতা বা অপরাধজনিত আচরনে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। তেমনি সামাজিক অনাচারগুলো ক্ষতিকর সংক্রমিত জীবানুর ন্যায় সমাজদেহে অনুপ্রবেশের ফলে কঠিন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই এদেশের সামাজিক অনাচার ও সমস্যাবলী ব্যাপক বিশ্লেষণে মৌলিক সমস্যা ও অনাচার হিসেবে নিম্নবর্ণিত সমস্যাবলী চিহ্নিত করা যায়। যা সংক্ষিপ্তাকারে দেখানো হল।

দারিদ্র্য

দারিদ্র্য একটি মারাত্মক ও ব্যাপক সমস্যা। দারিদ্র্যভুক্ত বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে যার দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ। সমাজতত্ত্ববিদ বুথ দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন"[১৬]।

অর্থনীতিবিদ ওঝা, ডান্ডেকার দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি বা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন।[১৭]

প্রতিদিন জীবন ধারনের জন্য ২১২২ ক্যালোরি খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণে অক্ষম জনগোষ্টিকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার নিচে। আর ১৮০৫ ক্যালোরি খাদ্য ও কোনভাবে জোটাতে পারে না যে জনগোষ্ঠী, দারিদ্র্যসীমার চরম নিচে তাদের অবস্থান। বিশ্ব ব্যাংকের মতে বার্ষিক মাথাপিচু ২৭৫ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়ের লোকেরা চরম দারিদ্র্য আর ৩৭৫ মার্কিন ডলারের নিম্নের আয়ের লোকেরা সাধারণ পর্যায়ের দরিদ্র। ৫৫ হাজার ৫ শত বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট দরিদ্র জনবহুল বাংলাদেশের ৮০% মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য আর সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে এ সকল দরিদ্র মানুষেরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা, পতিতাবৃত্তি, মদপান, জুয়াসহ ঘৃণ্য সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়ে থাকে।

বেকারত্বঃ-

বেকারত্ব ও দারিদ্র একই সূত্রে গাঁথা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য দোষর। এরা কঠিন সামাজিক অনাচার উৎপাদনের অনন্য শক্তি। বেকারত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক এ, সি, পিগুর বলেন,

---

১৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান , বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা : পৃ. ২১।

১৬. Charles Booth, Labour and Life of the People in London (London :1902)

১৭. P.D Ojha, Configuration of India society, (Delhi: Adams publishers and Distributors.1995).

Dhaka University Institutional Repository

"যখন কোনদেশে কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতানুসারে কাজ পায় না, তখন এই অবস্থাকে বেকারত্ব বলে"[১৮] ।

এই কর্মক্ষম, সুঠাম, যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষগুলো কাজ না পেয়ে অলস মস্তিস্কে সময় কাটানোর উপকরণ হিসেবে তাস, জুয়ার আড্ডায় প্রথমত মাদকাসক্ত, নারী নির্যাতনসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরে। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া, ভিন্ন ধর্মের অর্থনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে বেকারত্ব সৃষ্টি ও বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষণীয়। হিন্দু ধর্মের বর্ণ বৈষম্য যোগ্য ব্যক্তির যথাযথ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট অন্তরায়। এ ধর্মের লোক তাদের পেশা অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত যেমন– ১. ব্রাহ্মণ ২. ক্ষত্রিয় ৩. বৈশ্য ৪. সূদ্র। হিন্দু সমাজে উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর মর্যাদা বা পেশা তাদের জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। কিছুতেই এক জাতি অন্য জাতির পেশা গ্রহণ করার অধিকারী নয়। "ব্রাহ্মণ ধর্মের দৃষ্টিতে নিচু জাতের লোকেরা লোভের বশবর্তী হয়ে যদি উচু জাতের পেশা গ্রহণ করে, তাহলে রাজা যেন তাকে কপর্দক শূন্য করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন"[১৯]। এ সকল মতবাদ বেকারত্ব সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক।

মহাত্মা বুদ্ধের বৈরাগ্যবাদী মতবাদ ব্রাহ্মণ্য মতবাদের মতই বেকারত্ব সৃষ্টিতে সহায়ক, তার মতে কোন ব্যক্তিই নির্বাণ বা মুক্তি লাভের উপযুক্ত হবে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে স্বাভাবিক লোভ-লালসা থেকে মুক্ত করতে না পারবে।

সেন্টপলের ঈসায়ী মতবাদ এমন একটি ব্যবস্থা পেশ করে যার সাথে পার্থিব জগতের কোন সম্পর্ক নেই। সেন্টপল ঐশী রাজ্যের অনুসন্ধানে ক্ষুধা, পিপাসা, অভাব, দারিদ্র্য, কষ্ট-পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ এবং শীত- গ্রীষ্ম সহ্য করতেন। ঈসায়ী মতে, "দেহের কামনা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার কামনা দেহের বিরোধী এবং এগুলোর একটি অন্যটির বিপরীত"[২০]। এছাড়া ইঞ্জীলের ঘোষণা "বিত্তশালী ঐশীরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন, বরং আমি তোমাদের বলি যে বিত্তশালী ব্যক্তির ঐশীরাজ্যে প্রবেশ করার চাইতে বরং সূঁচের ছিদ্র একটি উটের নিমন্ত্রণ সহজ"[২১]।

ইহুদীদের ধর্মীয় আইন কানুন অ-ইহুদীর সাথে জিনিসপত্রের লেন-দেন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। জোসেফ বলেন, ইহুদীরা কোনদিনই আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি"[২২]। এভাবে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, ঈসায়ী ও ইহুদীমত এবং তাদের বাণীসমূহ মানবসমাজে বৈরাগ্যবাদ সৃষ্টি করে বেকারত্বের পথ উন্মুক্ত করেছে। এ বেকারত্ব নামক সামাজিক সমস্যাটি অনেকগুলো সামাজিক অনাচারের জনক।

---

১৮. প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী, খান আসম সালাউদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা হাসান বুক হাউস, ২০০১ইং) পৃ. ৮০।

১৯. মনু স্মৃতি; দশম অধ্যায়, শ্লোক-৯৬

২০. ইঞ্জিল, ৫ম অধ্যায়, নং ১৭।

২১. ইঞ্জিল, মতিঃ উনবিংশ অধ্যায়, নং ২৩-২৪।

২২. খৃসচানিটি এন্ড ইকোনমিক্স : পৃ.১১।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা সমস্যা:

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর মোট স্থল ভাগের তিন হাজার এক ভাগ আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম স্থান অধিকারী হিসেবে পরিচিত। ১৯০১ সালের ১লা মার্চের গণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ) জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯৪১ সালের আদমশুমারীর থেকে দেখা যায় যে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার ২ শত ৯৭ জন হয়েছে।

নিম্নে ১৯৫১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার হিসেব দেয়া হল।

ক্রমিক নং	সাল	জনসংখ্যা
১	১৯৫১	৪ কোটি ২১ লক্ষ
২	১৯৬১	৫ কোটি ৮ লক্ষ
৩	১৯৭৪	৭ কোটি ৬৩ লক্ষ
৪	১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
৫	১৯৮৬	১০ কোটি ২৯ লক্ষ
৬	১৯৯০	১১ কোটি ১৫ লক্ষ
৭	১৯৯৫	১২ কোটি ৪ লক্ষ
৮	২০০০	১২ কোটি ৮ লক্ষ
৯	২০০৫	

তথ্যসূত্রঃ প্রফেসর মুহম্মদ মনজুর আলী খান, আ.স.ম সালাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা হাসান বুক হাউস ২০০১ইং) পৃ. ১৫৩-১৫৪।

পপুলেশন ডিলেমা গ্রন্থে প্রসিদ্ধ জনসংখ্যা বিশারদ ফিলিপ হৌজা বলেছেন, "৫০ সালে সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৫ থেকে ৩০ কোটি, ১৬৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৫৪ কোটি ৪০ লক্ষ ১৯০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৫ কোটিতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৬৫০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫০ বছরের ব্যবধানে বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে তিন গুণের বেশী হয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিমিনিটে ১৫০ জন, প্রতিদিনে ২ লাখ ২০ হাজার এবং প্রতি বছরে ৮ কোটি হিসেবে জনসংখ্যা বাড়ছে"[২৩]।

"জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বর্তমান শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা দাড়াবে ৬০০ কোটি, ২০১০ সালে ৭০০ কোটি এবং ২০২২ সালে ৮০০ কোটি। এই বৃদ্ধির অধিকাংশই ঘটবে উন্নয়নশীল বিশ্বে। বর্তমান সময় থেকে ১০০ বছর বা তার কাছাকাছি সময় পরে বিশ্বের জনসংখ্যা ১৪০০ কোটিতে উন্নীত হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা চিত্র নিম্নরুপ"[২৪]।

---

২৩. Population Education in Asia; A Source Books; Reference Tables and Charts" UNESCO, UNO.

২৪. প্রফেসর মুহম্মদ মনজুর আলী খান, আ.স.ম সালাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা হাসান বুক হাউস ২০০১ইং) পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেখা চিত্র
২০২২.....২০৪৫
৮০০কোটি ২০১৫
৭০০কোটি ২০০৬ .....২০১০..... ২০১৮
৬০০ কোটি ১৯৯৭ ..... ১৯৯৯ ..... ২০০১
৫০০ কোটি ১৯৮৭
৪০০ কোটি ১৯৭৪
৩০০ কোটি ১৯৬০
২০০ কোটি ১৯২৭

প্রফেসর মুহম্মদ মনজুর আলী খান, আ.স.ম সালাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা হাসান বুক হাউস ২০০১ইং) পৃ. ১৫২।

বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ দেশের আধুনিক অর্থনীতি বিদদের মতে জনসংখ্যা সমস্যাটি দেশের অন্য সকল সমস্যাকে ম্লান করে দিয়েছে। কাজেই সকল সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যা সমস্যা, তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্লানিং কমিশন কর্তৃক প্রণীত Thought on the third five years plan 1985-90 এবং thoughts about perspective plan 1980-2000. দু'টি পুস্তিকার শুপারিশ ও চ্যালেঞ্জ হল জনস্যংখ্যা বিস্কোরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের অধিকাংশ সমস্যা অনায়াসে সমাধানের কাতারে চলে আসবে। কন্ট্রোল হবে জনসংখ্যা সমস্যার কারণে সৃষ্ট ঘৃণ্য সামাজিক অনাচারসমূহ।

মূলত বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে ধর্মীয় ও আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ বা মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এদেশের প্রতি নাগরিককে যদি দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করা যায় তা হলে এ নাগরিকরাই হবে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জনসংখ্যাকে কোন বোঝা বা সমস্যা মনে না করে এটাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে জনবিষ্ফোরণ খেতাবে ভূষিত বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বারাই সমাজের অনাচার অপরাধসহ সকল ক্ষতিকর কার্যক্রমের মূলোৎপাটন সম্ভব, এমনকি তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে বাংলাদেশের আরও উত্তরোত্তর সার্বিক সমৃদ্ধি আনয়নও সম্ভব। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা ধার নিয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মিল, কল-কারখানা চালিয়ে তাদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ভিত্তি মজবুত করে নিচ্ছে। জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়, এটাই তার বাস্তব প্রমাণ। তবে 'জনসংখ্যা সমস্যা সামাজিক সমস্যা বা অনচারের মূল কারণ নয়' এই শ্লোগান প্রমাণ করতে হলে জনগণকে কুরআন সূন্নাহর আদর্শগত নৈতিক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সংস্পর্শে এনে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে।

শ্রম ও পারিশ্রমিক সমস্যা

শ্রম বিক্রয় এবং পারিশ্রমিক সঠিকভাবে আদান-প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশে একটি কঠিন সমস্যার রূপ নিচ্ছে। শ্রমের যোগ্য ব্যক্তি এবং নারী ও শিশু শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী মালিকগণ

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিক-মালিকদের সম্পর্কের ব্যবধান তৈরি এক পর্যায়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলাসহ বিষয়টি সামাজিক অনাচার হিসেবে বিরাজ করছে সমাজের সর্বত্র। বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলা নিয়োগের প্রকৃতি, পরিধি এবং মজুরি সংক্রান্ত ব্যাপার খুবই আপত্তিকর।

"১৯৯১-৯২ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলাদের অংশ গ্রহণ ৬৯% হলেও তাদের মজুরির অংশ ছিল ৬১.৪%। ঐ একই সালে CMI জরিপকৃত শিল্পসমুহ মহিলাদের কর্ম সংস্থানের পরিমাণ ছিল ১৫% কিন্তু মোট মজুরিতে তাদের অংশ ছিল মাত্র ৮.৫%। একই উৎস হতে জানা যায় ১৯৯০-৯১ইং সালে অধিকাংশ মহিলাই বিশেষতঃ গ্রামীণ এলাকার মহিলারা সপ্তাহে টাকা ১৫০-এর কম মজুরি পেয়েছে। গ্রামীণ কর্মরত মহিলাদের ৮৪% এবং শহুরে কর্মরত মহিলাদের ৫৭% এই নিচু আয়ের শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। পক্ষান্তরে এই একই নিচু আয়ের শ্রেণীতে পুরুষের সংখ্যা পল্লী এলাকাতে ৬৯% এবং শহুরে এলাকাতে ৩১%"[২৫]।

নাসরিন খন্দকার তার সমীক্ষায় দেখিয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্পে পুরুষ মহিলার মজুরীর পার্থক্য ২২%-৩০%। ভীতিপ্রদ তথ্য হলো– এই মজুরির পার্থক্য সময়ের সাথে বেড়েই চলেছে। মহিলাদের মজুরি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে নিত্য নৈমিত্তিক চাহিদা পূরণে আর্থিক দৈন্যতা নারীদেরকে পাচার, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পতিতাবৃত্তিসহ বহু ঘৃণীত সামাজিক অনাচারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

"বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনের ফলে পূর্বের তুলনায় এদের অবস্থা কিছুটা উন্নতি হলেও এখনো মানবেতর অবস্থায়ই তাদের দিন গুজরান হচ্ছে"[২৬]। আদমজী জুট মিলস্ নারায়ণগঞ্জ, বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিক পরিবারগুলোর অসহায় অবস্থা কালের স্রোতে চাপা পড়লেও খুলনার বন্ধ হয়ে যাওয়া নিউজ প্রিন্ট মিলস্ ক্রিসেন্ট জুট মিলস্, প্লাটিনাম, দৌলতপুর, পিপুলস্ জুট মিলসমূহের শ্রমিক ও তাদের পরিবার পরিজনদের অভূক্ত আর্তনাদ, এমনকি হাসপাতালের বারান্দায় দূরারোগ্য হৃদরোগে আক্রান্ত অনেক শ্রমিক পরিবার। কোন মিল শ্রমিক কৃষি কাজের দিন মজুর হিসেবে স্ব-স্ব গ্রামের বাড়িতে চলে আসলেও যথাযথ কর্ম, চাহিদানুযায়ী পারিশ্রমিকের অভাবে কর্মবিমুখ হয়ে রাস্তা ঘাটে, আনাচে-কানাচে তাস ও জুয়ার আড্ডায় লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রম ও পারিশ্রমিক সমস্যার কারণে বেকারত্বের আগ্রাসন থাকায় পর্যায়ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, হত্যাসহ নানাবিধি সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাময় ঝুঁকির দিকে পথ এগুচ্ছে বাংলাদেশী শ্রমিক সামাজ।

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা:

"নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। সাধারণভাবে স্বাক্ষর জ্ঞানহীন অবস্থাকে নিরক্ষরতা আর জ্ঞানের অভাবকে বলে অজ্ঞতা। বর্তমানে স্বাক্ষরতা ও অজ্ঞতা কথা দু'টিকে আরও গভীরভাবে নির্দিষ্ট করতে দেখা যায়। ফলে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার সংজ্ঞা ও বিভিন্ন রকম হয়ে পড়ে"।[২৭]

---

২৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের ভূমিকা: পৃ. ৩১৩.

২৬. ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, প্রাগুক্ত, ৩১৩।

২৭. BBS, Statistical Poket Book Of Bangladesh 1989 (Dhaka Ministry of Planing Govt.of Bangladesh) P. 282.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের বক্তব্য অনুযায়ী যারা যে কোন ভাষায় চিঠিপত্র লিখতে পারে না তারাই নিরক্ষর। অনুরূপ অজ্ঞতা নির্দিষ্ট করে আমরা বলতে পারি তা হলো– "এমন একটি অবাঞ্ছিত অবস্থা যার ফলে কোন জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদনে সজ্ঞান ও সচেতন আচরণ করতে অক্ষম, উদাসীন এবং অসচেতন জীবন যাপন করেন"।[২৮] উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা উন্নয়ন ও প্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছে। "নিরক্ষর ও অজ্ঞ মানুষের রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতায় উন্নয়ন সহায়ক প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা গ্রহণে অনাগ্রহী, উদাসীন ও বিরোধ থাকে"[২৯]।

'নিরক্ষরতা' ও 'অজ্ঞতা' সমাজ জীবনে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থা ও সমস্যার জন্যও দায়ী। এর জন্য জনগণের বৃহৎ অংশ আজ অদক্ষ জনশক্তি হয়ে আছে। অদক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান হয় না বলে বেকারত্ব ও নির্ভরশীলতা বাড়ে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার জন্যই জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অদৃষ্টবাদিতা, গোড়ামি ও কুসংস্কার দেখা দেয়, যার পরিনতিতে দরিদ্র ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান, পূষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা স্ফীতি, অসাম্য, নারী নির্যাতন সহ বহু সামাজিক অনাচার বেড়ে উঠে"[৩০]।

ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব ও পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ১৯৮৪ সালে চারটি গ্রামের উপর পরিচালিত এক ক্ষুদ্রায়তন অনুসন্ধানে ১৬০ জন উত্তর দাতার মতামতের ভিত্তিতে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলোকে দায়ী করেছেন:

ক্রঃ নং	শিক্ষার সুযোগ গ্রহন না করার কারণ	শতকরা হার	মন্তব্য
১	আর্থিক অসচ্ছলতা	১০০	
২	কর্মসংস্থানের অভাব দেখে অনিচ্ছা	১০০	
৩	বই, খাতা সহ অন্যান্য খরচ অধিক হওয়ায়	৯৮	
৪	অভিভাবকগণ অর্ধ শিক্ষিত হওয়ায়	৯৬	
৫	শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা কম হওয়ায়	৯৩	
৬	চলাচলের রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাব	৯৩	
৭	শিক্ষালাভের পরিবেশের অভাব	৭০	
৮	অল্প পড়ালেখা জানা লোকের চাকরির অভাব	৬২	
৯	শিক্ষিত মহিলা কিষানীরা কাজ করতে নারাজ দেখে	৬২	
১০	শিক্ষিত মহিলারা পর্দায় ধার ধারেণা বলে	৫৫	
১১	নারী শিক্ষার প্রতি গ্রামীন কৃষকদের রক্ষণশীল মনোভাব থাকায়	৫৫	
১২	শিক্ষিত লোকেরা শ্রমবিমুখ হওয়ায়	৬৫	
১৩	কৃষি কাজে সহয়তা করার লোকের অভাব হয় বলে	৬০	

তথ্যসূত্রঃ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব ও পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, সাপ্তাহিক চিত্র বাংলা, ঢাকাঃ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

২৮. স্নাতক সমাজকল্যাণ, আতিকুর রহমান, (ঢাকাঃ কুরআন মহল, ১৯৯০) পৃ. ২৭৪।

২৯. G. Foster Traditional Culture and Impact of Technological Change. (New York : Harperand Brothers Publishers.1962) P.171.

৩০. ড. কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য স্বরূপ ও সমাধান (ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী) প. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করতে হলে, উহার কারণসমূহকে চিহ্নিত করে প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত সুপারিশমালার মাধ্যমে জাতিকে জ্ঞানী ও সু-শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে সামাজিক অনাচার দমনের সু-পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা:

"অর্থনৈতিক, মানসিক, দৈহিক অক্ষমতা প্রদর্শন করে অপরের সহানুভূতি সহযোগিতা লাভে প্রার্থী হওয়া হল ভিক্ষুক এবং এরূপ পর সাহায্য বা পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করাকে বলা হয় ভিক্ষাবৃত্তি। বাংলাদেশে ভিক্ষুক পেশায় নিয়োজিতদেরকে সঠিক দিক বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হল:

১. উত্তরাধিকার সূত্রে ভিক্ষুক ।
২. দৈহিক ও মানসিক পঙ্গুত্বের কারণে ভিক্ষুক ।
৩. ছিন্নমুল ভিক্ষুক।
৪. কর্মক্ষম অলস প্রকৃতির ভিক্ষুক ।
৫. অনাথ বালক-বালিকা।
৬. নির্ভরশীল বালক-বালিকা ও বিধবা"[৩১]।

ভিক্ষুকদের বিভিন্ন শ্রেণী বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা কঠিনভাবে সামাজিক অনাচারের রূপ নেয়। যেমন ভিক্ষাবৃত্তি অনেকগুলো সামাজিক অনাচারের কারণ, আবার ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা একাধিক সামাজিক অনাচার সৃষ্টির মাধ্যম। "বেশ কিছুকাল আগে একটি ক্ষুদ্রায়তন গবেষণা নির্ভর 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার এক রিপোর্টে দেখা যায় ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয় মূলতঃ শারিরীক রোগজনিত অক্ষমতা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে। যদিও এ রিপোর্ট ক্ষুদ্রায়তন অনুসন্ধান ভিত্তিক। তবুও ভিক্ষাবৃত্তির পেছনে এ দেশে কোন কারণ কতটুকু জড়িত সে সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করা যায়"[৩২]।

ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা শুধু বাংলাদেশই নয় গোটা বিশ্বে চলমান একটি অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মহানবী (সঃ) মূলত ২ (দুই) ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যথা-

১. প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ।
২. পুনর্বাসনমূলক পদক্ষেপ।

---

৩১. Govt. of Pakistan, Commission for Education for social Evils (karachi Govt. Printing press 1964).

৩২. দৈনিক আজাদ রিপোর্ট, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও সমাধান, পৃ. ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ভিক্ষা বৃত্তির তথ্য ও চিত্র

ক্রমিক নং	ভিক্ষাবৃত্তির কারণ	ভিক্ষুকের সংখ্যা %
১	দৈহিক পঙ্গুত্ব	৪৮.২৭%
২	দীর্ঘ মেয়াদী রোগব্যাধি	১৫.৫৪%
৩	বেকারত্ব	১৩.৭২%
৪	পারিবারিক ভাঙ্গন	৪.৩৮%
৫	ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব	২.৫৯%
৬	দারিদ্র্য	২.৪৩%
৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১.৭৮%
৮	পরিবার প্রধানের রোগ ও মৃত্যু	১.৭৬%
৯	সামাজিক নিরাপত্তার অভাব	১.৬২%
১০	পৈত্রিক পেশা	০.৮১%
১১	অন্যান্য	৭.০০%

তথ্যসূত্রঃ A Farouk The Vagrants of Dhaka City; A Socio-Economics Survay-1975. Dhaka University; Burean of Economic Research-1978.

ভিক্ষাবৃত্তির কারণগুলোর মধ্যে বেকারত্ব, পারিবারিক ভাঙ্গন (বিবাহ বিচ্ছেদ), দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বিষয়ক সমস্যাগুলো চলে আসছে। এখানে একটি সমস্যা সৃষ্টির পিছনে আরও ৪টি সমস্যা কাজ করছে। আবার ভিক্ষা বৃত্তিজনিত সমস্যার কারণে পতিতাবৃত্তি, ভ্রাম্যমান যৌনাচার, চুরি, মাদক ব্যবসা, পাচার, চোরাচালানীর মত ঘৃণীত সামাজিক অনাচারগুলো ভিক্ষুকদের কাঁধে করে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। কাজেই সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক অনাচার একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

আগ্রাসী যুদ্ধ

আজকাল যুদ্ধ একটি বিরাট সামাজিক সমস্যা বলে পরিগণিত। কারণ এটা মানব সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। যুদ্ধে আনবিক ও জৈব রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করার আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমগ্র মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মানব সমাজের উৎপত্তি থেকে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে আসছে। আদিম সমাজে যে যুদ্ধবিগ্রহ হত তার প্রমাণ জাতিতত্ত্ববিদরা (Ethomologists) উদঘাটন করেছেন। তবে এস্কিমোদের মতে. গুটি কয়েক আদিম জাতির ভেতর সুসংগঠিত যুদ্ধ বিগ্রহের কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ সকল মানব জাতির ভেতর কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য এটা একটি সর্বজনীন সমস্যা। তাই সমাজ বিজ্ঞানীরা একে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেন। অধিকন্তু, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহের আশংকা ক্রমশ বাড়ছে। যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে মানুষ এখন অনেক সতর্ক। "এটা অপ্রিয় হইলেও সত্য যে, মানব সভ্যতা যতই অগ্রসর হইতেছে ততই যুদ্ধবিগ্রহের বিধ্বংসী রূপ অধিকতর' প্রকট হইতেছে। তুলণামূলকভাবে বিচার করলে এটা বোঝা যায় যে, অসভ্য বর্বর জাতির লোকের কাছে আধুনিক সভ্যজাতির যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বংসাত্মক রূপ এখন বিস্ময়ের বস্তু।"

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি, আদিমদের যুদ্ধপদ্ধতি সভ্যলোকদের যুদ্ধপদ্ধতির চেয়ে অধিকতর ভদ্রোচিত বলে মনে হয়"[৩৩]।

মানুষের আক্রমণ প্রবণতা, আদিম ও সভ্য সমাজের ভেতর এ নিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "সতের শতকের পর থেকে ইউরোপের রাজ্যসমূহ অন্যূন ২৩০০টি যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। উপরিউক্ত যুদ্ধ সংখ্যার মধ্যে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, ক্রুসিয়া, ব্রিটেন ও রাশিয়া যথক্রমে শতকরা ৪৯ ভাগ, ৩৫ ভাগ, ২৬ ভাগ এবং ২৩ ভাগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ যুদ্ধে এর চেয়ে অনেক কম শরীক হয়েছে"[৩৪]।

দেশের বৃহৎ শক্তিসমূহ উপরিউক্ত প্রায় সব যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। "ফ্রান্স ৯৫০ বছরে শতকরা ৮০ ভাগ, গ্রেট ব্রিটেন ৮৭৫ বছরে শতকরা ৭২ ভাগ এবং জার্মানি ২৭৫ বছরে শতকরা ২৯ ভাগ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে"[৩৫]।

যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ শুধু একাধিকই নয়, জটিলও বটে। প্রাচীন ধারণা মতে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আজ এটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহের নানাবিধ কারণের ভেতর সমাজ বিজ্ঞানী সাম্নার ও কেলার অর্থনৈতিক কারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের উভয়ের মতে সহজে লোক সংখ্যা বাড়ার ফলে জমিজমা নিয়ে মানুষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়।

আদিম সমাজে ধন-সম্পত্তির লুটপাট করার ইচ্ছা, গৌরব লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং একঘেঁয়ে জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা ইত্যাদি নানা কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হত। "যোদ্ধা স্বভাবতই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে উৎকট আনন্দ, গৌরব এবং প্রতিষ্ঠালাভ করতে প্রয়াসী। আদিম সমাজের যুদ্ধপ্রিয় নেতারা এজন্য পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হত"।[৩৬] সমাজবিজ্ঞানী সাম্নার ও কেলারের মতে মানব সমাজে যুদ্ধ অপরিহার্য নয়, যদিও যুক্তিশীল চিন্তা ও সম্যক জ্ঞান লাভের মধ্যেমে এর আশঙ্কাকে অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

সমাজবিজ্ঞানী রাইট যুদ্ধের পিছনে যে সব উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যে সবের জন্য যুদ্ধবাজ নেতারা স্বয়ং যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং যে সবের জন্য জনতা তাদের নেতাদের সহযোগী হয় সে সব উদ্দেশ্যের ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যুদ্ধবাজ নেতারা প্রধানত ধন-সম্পত্তি অর্জন, প্রতিহিংসা চরিতার্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ এবং অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু জনতা নিছক অভিযানের উদ্দেশ্যে কিংবা লুটপাট করতে এবং রানীমাতার স্বীকৃতির প্রতি সম্মান কিংবা তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য যুদ্ধে শরীক হয়। সমাজ বিজ্ঞানী রাইটের মতে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হল– সমাজের সেকেলে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, যা মানুষের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা মিটাতে অসমর্থ।

---

৩৩. খান সিরাজুল হোসেন, উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিবৃত্তঃ পৃ. ১৬২।

৩৪. Harold Greenberg, "Social Enviroment and Behavior", P. 108

৩৫. Armand Mattelart, "The Information Society" P.82.

৩৬. প্রাগুক্ত পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ স্বভাবতই সেকেলে আইন-কানুনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। সেজন্য তারা যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েও এ অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে চায়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল দুনিয়ার প্রায় সব কয়টি রাষ্ট্র ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মানুষে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে এদের ভেতর বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, আন্তর্জাতিক বিরোধ সমূহকে শান্তি পূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব।

যুদ্ধের অপকারিতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকারিতা থাকা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মানবজাতি কতক বিষয়ে উপকৃতও হয়েছে। যেমন– আদিম সমাজে যুদ্ধের ফলে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা সুদৃঢ় থাকত। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা সামাজিক সংগঠনের কার্যকারিতাও বাড়ত। "যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একাধিক বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সুগম করা হয়েছে। "যুদ্ধের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে, আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ ও প্রশস্ত হয়েছে। এর দ্বারা সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, যুদ্ধের দ্বারা যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা মানুষ গ্রহণ করিয়াছে তার চেয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে অনেক বেশি। একথা বিশেষভাবে আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সত্য। কারণ আধুনিক যুদ্ধের দ্বারা মানব সমাজ ও সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে"।[৩৭]

সমাজের ওপর আধুনিক যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের গভীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন: যুদ্ধের সময় পরিবার, সম্প্রদায়, গীর্জা, স্কুল, সম্পত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রও সামরিক বিভাগের অধীন হয়ে পড়ে। এসব প্রতিষ্ঠানের চিরাচরিত স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। যুদ্ধ মানুষের মন ও আত্মার ওপর বিশেষ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা ও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়। মানুষ বর্বরের মত নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত থাকে। যুদ্ধের সময় বিবাদমান উভয় পক্ষই অপপ্রচারে মত্ত হয়। যার ফলে মানুষের মনে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জন্মে। এভাবে বিবাদমান সমগ্র জাতি যেন একটা উচ্ছৃঙ্খল জনতায় (Mob) পর্যবসিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে যুদ্ধের দ্বারা মানুষের ভেতর মহৎ গুণাবলীর তো বিকাশ হওয়া সম্ভবই নয়, বরং যত প্রকার হীন ও বর্বরোচিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে মানুষের মধ্যে শুধু সে সবের উদ্রেক হয়ে সমাজে অনাচার উৎপত্তি ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। কত মানুষের প্রাণ যে এতে বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কমপক্ষে এক কোটি সামরিক বাহিনীর লোক এবং প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ বেসামরিক লোক হতাহত হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর লোকের চেয়ে বেসামরিক লোকের মৃত্যু বেশি হয়। এর প্রমাণ জার্মানির ওপর অকস্মিক আক্রমণ। এই হামলার ফলে এক রাত্রিতে ঐ অঞ্চলের অসংখ্য লোক হতাহত হয়েছিল। জাপানের হিরোশিমাতে আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। এভাবে হত্যা যজ্ঞের মত ভয়ঙ্কর অনাচার যুদ্ধের মাধ্যমেই সংঘটিত হয় সবচেয়ে বেশী।

---

৩৭. John. J Hader and Eduard C Limdeman, "Dynamic Social Research" P. 28.

Dhaka University Institutional Repository

"ব্যয় বাহুল্যের দিক থেকে আধুনিক যুদ্ধ অকল্পণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৪০০,০০০,০০০,০০০ ডলারেরও বেশী খরচ হয়েছে। এক সরকারি হিসেবে জানা যায় গত বিশ্বযুদ্ধে মোট ১,১১৬,৯৯১,৪৬৩,০৩৪ ডলার ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া, ২৩০,৯০০,০০০,০০০ডলার মূল্যের সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়েছে। ঐ যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই দৈনিক প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। যার ফলে মার্কিন যুদ্ধ খরচের পরিমাণ যেমন মোট ৪০ হাজার বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে লোকক্ষয়ের পরিমাণ যেমন বাড়ছে, তেমনি ব্যয়বাহুল্যের একটি খতিয়ান তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা গেছে যে, রোমান যুদ্ধে অপরপক্ষের একজন সৈন্যকে হত্যার জন্য মাত্র ৭৫ সেন্ট, নেপোলিয়নের যুদ্ধে ৩,০০০ ডলার, আমেরিকার গৃহযুদ্ধে (Civil War) ৫,০০০ ডলার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ২১,০০০ ডলার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫০,০০০ডলার খরচ হয়েছে"[৩৮]।

আধুনিক কালের ব্যয়বহুল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায় না। বরং যুদ্ধের পরে অবসর ভাতা, বীমা ও বোনাস ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবীণ সৈনিকদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয় করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের পর প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও তাদের পরিবারসহ লোকদের সাহায্যের জন্য যে পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল তা মূল যুদ্ধ খরচের চেয়ে অনেক বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহকে ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল। এছাড়া, যুদ্ধের সময় দীর্ঘ দিন শিল্প-উৎপাদন কেন্দ্রে কাজকর্ম বন্ধ থাকে। ফলে অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। এজন্য মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যারা চাকরি হারিয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের আর্থিক সাহায্য দিতে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। কাজেই যুদ্ধকে সর্বগ্রাসী সামাজিক অনাচার নামকরণের সার্থকতা রয়েছে যথার্ত ভাবে।

যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের একটি সু-প্রাচীন সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যার সার্থক সমাধানের জন্য ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজন। যার ফলে এর বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে ওয়কিফহাল হওয়া যাবে। শুধু গভীর আগ্রহ ও শুভবুদ্ধি থাকলেই এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এর কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হতে হবে। যদি সত্যি সত্যিই যুদ্ধ বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয় তাহলে এ সম্বন্ধে গভীরভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করা ছাড়া এ সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠাও এর ওপর নির্ভরশীল"[৩৯]।

সমাজবিজ্ঞানী ল্যান্ডবার্গ তার Can Science Save us' নামক গ্রন্থে বলেছেন"[৪০] কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আজও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমূহের সার্বজনীন সমর্থন পাওয়া যায়নি।

---

৩৮. স্যামুয়েল কোনিগ, ডিগ্রী সমাজ বিজ্ঞান পৃ. ৬৬.

৩৯. Armand Mattelart, "The Information Society" P. 92

৪০. কেবলমাত্র রাষ্ট্র সংঘের মারফতে এ সমস্যার স্থায়ী সামাধান সম্ভব নয়। এজন্য মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রধান সদস্যরা যদি যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবহিত না হন এবং এসবকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না জানেন তাহলে তারা কিভাবে বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হবেন? শুধু যুদ্ধবিগ্রহকে মোকাবেলা করার পদ্ধতি জানলেই চলবেনা, তার বিরুদ্ধে জনসমর্থনেরও প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আগে তার কারণ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই ফলপ্রসূ গবেষণার ভিত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধকরণ ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে।

একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ও জাতির মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত জনতা ও শাসক শ্রেণীর অন্তর থেকে একেবারেই হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর্থিক, শারিরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্দশা, দৈন্যতা, অভাব গ্রস্ততা এমনকি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সিঁড়ি বেয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, দেহ ব্যবসা ও সন্ত্রাসের মত বহু ঘৃণ্য সামাজিক অনাচারের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই আগ্রাসী যুদ্ধ ছোট বড় যে ধরনেরই হোক না কেন যদিও যুদ্ধের পিছনে প্রধান কারণ বা উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, তথাপিও যুদ্ধের প্রভাবে সমাজ কাঠামো অত্যন্ত দূর্বল রূপ নিয়ে সমাজে বসবাসকারী সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনাচারে জড়িয়ে পড়ে। তাই আগ্রাসী যুদ্ধ নামক সামাজিক সমস্যাটি ক্ষতিকর বহু সামাজিক অনাচারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবক।

মানব সমাজে অনাচার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুনির্দিষ্ট বিধান নীতিমালাকে সঙ্গী করেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ও খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সূচনাতেই তার মনুষ্যত্ব বিচারের মানদণ্ড হিসেবে ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার, অপরাধ-অনাচার, মার্জিত-গর্হিত ইত্যাদি বিষয় গুলোরও অবতারনা ঘটিয়েছেন। 'বস্তুতঃ অপরাধ অনাচার অত্যন্ত প্রাচীনতম ব্যাপার। তা ততই প্রাচীন যত প্রাচীন পৃথিবীর বুকে মানুষের পদসঞ্চার। যেদিন থেকে মানুষ সে দিন থেকেই অনাচারের অগ্রযাত্রা"[৪১] আদম সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে তার খেলাফত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ফেরেস্তার পরামর্শ চাইলেন, এরশাদ করেন–"আর তোমাদের পালনকর্তা যখন ফেরেস্তা দেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেস্তাগণ বলল– আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গমার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে"[৪২]। মানব সৃষ্টির উষালগ্নেই আল্লাহ ফেরেস্তাদের মতবিনিময় মুহূর্তে রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গমা, ফেৎনা-ফ্যাসাদ নামক সামাজিক অনাচারমূলক শব্দ ও বাক্য ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আদম (আঃ) কে প্রেরণের পূর্বেও ফেৎনা-ফ্যাসাদ, রক্তপাত, সন্ত্রাস ও অনেক গর্হিত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তা আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলার হুকুম, পছন্দ ও ইচ্ছার বিরূধী আচরণ সামাজিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়াই সামাজিক অনাচারমূলক কর্মকাণ্ড। হযরত আদম (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিনিধিত্ব ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, যখন আমি আদম (আঃ) কে সিজদা করা জন্য ফিরেস্তাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিশ ব্যতিত সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।"[৪৩]

---

৪১. রেবতি বর্মন. সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ : পৃ. ১২৪।

৪২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৩০।

৪৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার সরাসরি নাফারমানির করুণ ইতিহাস অত্র আয়াতে বিদ্যমান। বিতাড়িত শয়তান হিসেবে আখ্যায়িত আল্লাহর নিকট থেকে যে তিনটি মূল্যবান জিনিসকে নাফরমানির দুর্জয় শক্তি হিসেবে চেয়ে নিল, তার একটি দিয়েই আদম সন্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, রক্তে, শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে মানুষকে সামাজিক বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত রাখতে পারবে কেয়ামত পর্যন্ত। নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় সংঘটিত অনাচারগুলো বিতাড়িত ইবলিশের প্রতারণা ও ধোকার ফসল।

আল্লাহ তা'য়ালা বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেও তাদের কর্তৃক সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সমাজের শান্তি বিনষ্ট করার মত অশালীন আচরণ ও গর্হিত কার্যকালাপ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল। বনী ইসরাইল জাতি পদে পদে সামাজিক দুস্কর্ম, আল্লাহর নাফারমানী, তার বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে, আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি চরম উদাসীনতা ও অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

হযরত মুসা (আঃ) এর নেতৃত্বে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে ফেরাউনের দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার পর হযরত মুসা (আঃ) তাওরাত কিতাব অর্জনের নিমিত্তে তূর পাহাড়ে অবস্থান নেওয়ার সুযোগে গোঁ-বৎস পূজার মাধ্যমে সমাজে কঠিন ফেৎনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি করেণ উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন–"আর যখন মুসা (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করেছ, এই গো-বৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও"[৪৪]।

হযরত মুসা (আঃ) তাওরাত লাভের পর লোকালয়ে ফিরে আসলে এবং তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে, বনী ইসরাইলগণ তার নবুয়তী অস্বীকারসহ স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বচক্ষে দেখার দাবি জানায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা কস্মিন কালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ আমরা তোমার আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদের পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমারা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে"[৪৫]।

আকাশ হতে মান্না ও সালওয়া নামক সু-স্বাদু খাবার প্রেরণ করে তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে উক্ত পবিত্র খাদ্য সঞ্চয় ও অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে উক্ত পবিত্র খাবার সঞ্চয় ও অপচয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানি করেছিল বনী ইসরাইলগণ।

"আর যখন আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া। সে সব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে"[৪৬]।

---

৪৪. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৫৪।

৪৫. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৫৫।

৪৬. আল-কুরআন সূরা বাকারা, আয়াত নং ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'য়ালা সরাসরি তাদেরকে আদেশ দেন যে শ্যাম দেশ অমালিক সম্প্রদায়ের হাত হতে উদ্ধার করার জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ কর। অথচ তারা আল্লাহর এ আদেশ অমান্য করেছে। আর এ চরম দুস্কর্মের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে সুদীর্ঘ ৪০ বছর তীহ মরু প্রান্তরে দিকবিদিক জ্ঞান হারা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা বনী ইসরাইলদেরকে তীহ ময়দান হতে নিজেদের মাতৃভূমি জেরুজালেমকে অমালিক সম্প্রদায়ের হাত হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে উক্ত নগরদ্বারে নতশিরে 'হিত্তাতুন' অর্থাৎ ক্ষমা চাই বলে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশিত শব্দকে ইচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন করে মনগড়াভাবে 'হিন্তাতুন' মানে যব চাই, গম চাই, বলতে বলতে নগরদ্বারে প্রবেশ করে। এ হটকারীতামূলক অবাধ্য ও দুস্কর্মের জন্য তাদের মধ্যে আসমানী শাস্তি স্বরূপ ব্যাপক প্লীহা (প্লেগ) রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে দুপুরের মধ্যে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে বনী ইসরাইলদের ৭০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ বলেন, "এবং যখন আমি বলিলাম এই নগরীতে তোমরা প্রবেশ কর এবং যে স্থান হতে ইচ্ছা যত খুশী খাও; এবং নত শিরে নগরদ্বারে প্রবেশ কর এবং বল ক্ষমাচাই"[৪৭]।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মৎস্য শিকার করে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও আল্লাহর সাথে নাফরমানীর দরুন আল্লাহর পক্ষে থেকে গজব অবতরনের ফলে তারা ঘৃণ্য বানরে পরিনত হল। আল্লাহ বলেন, "তোমরা অবশ্যই জান তোমাদের মধ্য হইতে যারা শনিবারে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল, ফলতঃ আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা ঘৃণীত বানর হইয়া যাও"[৪৮]।

আল্লাহর পক্ষ থেকে গাভী জবাই সংক্রান্ত আদেশের বিরোধিতা করে দেবতাতূল্য গাভীর সম্মান রক্ষার্থে বিষয়টি নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও পরবর্তীতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং আল্লাহর আদেশের প্রতি অবমাননার সামাজিক প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করে গাভী জবাই শেষ পর্যন্ত সবাই-ই করতে বাধ্য হয়েছে। যা ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় শৃংঙ্খলা পরিপন্থী কাজ।

সাধারণ মানুষদের হত্যা, নবী রাসুলদের সাথে অপমানজনক আচরণ, নবীদের হত্যা করার মত ভয়ঙ্কর ও জঘন্য অনাচারে তারা ছিল খুবই দুর্বিনীত। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন " বনী ইসরাইলগণ দিনের প্রথম ভাগে তিনশত নবী হত্যা করে দিনের শেষভাগে মহানন্দে শাক-সবজির হাট বসাত"[৪৯]

বনী ইসরাইলগণ মুসা (আঃ) কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) কে হত্যার অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং বিশ্বনবী (সঃ) কে তারা বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়েছে। বনী ইসরাইল সম্প্রদায় আল্লাহর অনেক আদেশের নাফরমানীসহ কুফরীমূলক আচরণ করে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করেছে। যা সামাজিক অনাচারের শামিল। কুরআনে বলা হয়েছে– "বনী ইসরাইলদের প্রতি চির লাঞ্ছনা ও অবমাননা এজন্য যে, তারা আল্লাহর অনেক নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে"[৫০]।

---

৪৭. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৫৮।

৪৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং, ৬৫।

৪৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর, পৃ. ৮৬।

৫০. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে তার অনুসারী বনী ইসরাইল সম্প্রদায় কর্তৃক সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের অবাধ্যতা, আচরণগত দূস্কর্ম বা অপরাধমূলক কার্যাবলী ছিল তাদের মজ্জাগত স্বভাব।

দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হত্যাসহ অনাচার অপরাধের ইতিহাস মানব সৃষ্টির ইতিহাসের মতই প্রাচীন। হযরত নূহ (আঃ) এর সময়কার মহাপ্লাবনের ইতিহাস তার অনুসারীদের বিভিন্ন অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের দুর্নীতি, অনাচারব্যাধী, ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে পর বিধাতা সিদ্ধান্ত নিলেন যে পৃথিবীর মানুষদের এবং সেই সাথে অন্য সব জীবন্ত প্রাণীকেও তিনি নির্মূল করবেন। এদিকে পূর্বাহ্নেই তিনি হযরত নূহ (আঃ) কে এই মহাপ্লাবনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে একটি নৌকা তৈরির আদেশ দিলেন। হযরত নূহকে একথাও বলে দেয়া হল যে, প্লাবনের ফলে তিনি যেন সেই নৌকায় তার স্ত্রী তিন পূত্র ও তাদের স্ত্রীদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের তূলে নেন"[৫১]।

১ বছর স্থায়ী কাল এ মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সকল অন্যায়-অবিচার, পাপ-পঙ্কিলতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে হযরত নূহ (আঃ) এর নেতৃত্বে পুনরায় একটি নিস্কলুশ ও অনাচার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সূত্রপাত শুরু হয়।

"বাইবেলে বলা হয়েছে, ধর্মীয়-সামাজিক দিক থেকে অধঃপতিত গোটা মানবজাতিকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিলো কোরআনের মতে, যখন কোন জাতি বা সম্প্রদায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিদারুণভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে-তখন সে জাতির উপরে আল্লাহর গজব নেমে আসে "[৫২]।

"পবিত্র কুরআনের ৭ নং সূরার ৫৯-৯৩ নং আয়াতে নূহের জাতি এবং আদ, সামুদ, লুত (সডোম) ও মাদিয়ান সম্প্রদায়ের উপর অপরাধ ও নাফরমানির কারণে কিভাবে গজব নেমে এসেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে"[৫৩]।

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, আমরা খুলিয়া দিলাম আসমানের দরজাসমূহ অতিবর্ষণের সহিত এবং মাটিতে তীব্র প্রস্রবন সৃষ্টি করিলাম-যেন পানি একত্রিত হইয়া হুকুম অনুযায়ী তাহা সমাধান করে, যাহা নির্ধারিত"[৫৪]।

"প্রত্যেক জিনিসের এক জোড়া (নৌকায়) তুলিয়া নাও: তোমার পরিবারবর্গকে এই একজন বাদে যাহার বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্দেশ জারি হইয়া গিয়েছে ..... এবং যাহারা বিশ্বাসী। তবে অল্প সংখ্যক লোকজনই তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল"[৫৫]।

---

৫১. ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, রূপান্তর আখতারুল আলম পৃ. ৫৪।
৫২. ড. মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।
৫৪. আল-কুরআন, সূরা নূহ, আয়াত নং ১১ ও ১২।
৫৫. আল কুরআন, সূরা হুদ, আয়াত নং ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"পবিত্র কুরআনে পাকের সূরা হূদ এর ২৫ থেকে ৪৯ নং আয়াতে সূরা নূহ-এ সূরা শু'আরা এর ১০৫ থেকে ১১৫ নং আয়াতসমূহে মহাপ্লাবন নামক খোদায়ী গজব দ্বারা আল্লাহর সাথে নাফরমানী সহ বিবিধ সামাজিক অনাচারজনিত কর্মকাণ্ডের সমাধি রচনার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য জাতি মিসরের ইহুদি সম্প্রদায়, এ জাতি প্রায় ৪০০ অথবা ৪৩০ বছর মিসরে বসবাস করে"[৫৬]।

তৎকালীন মিশর প্রেসিডেন্ট ছিলেন– ইহুদী উৎপীড়ক। সমাজে স্বামী-স্ত্রীদের বৈধমিলন, গর্ভধারণ নিষিদ্ধসহ একসময় সদ্যজাত পূত্র সন্তানদেরকে গর্ভধারিনী মায়ের কোল থেকে ছিনে নিয়ে হত্যা করার মত ঘৃণ্য অনাচার ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ কর্তৃক সংঘটিত হত নির্বিচারে। কুটকৌশলী যালিম ফেরাউনের কড়া নিরাপত্তা, তদারকির মধ্যদিয়ে হযরত মুসা (আঃ) এর জন্ম, লালন-পালন এবং নবুয়ত প্রাপ্তির পর ফেরাউনের অত্যাচার, নির্যাতন, ব্যভিচার সহ বিভিন্নরূপী সামাজিক অনাচার অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাস সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে এক সার্থক সংগ্রামের ইতিহাস। সৈন্য সামন্তসহ নীল দরিয়ায় সলিল সমাধি, পিরামিডে লাশ সংরক্ষণের বিষয়টি বহুরূপী অনাচারের সমুচিত শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। "ফেরাউন তাদের ধাওয়া করিতেছিল নিজের লোক লস্করসহ এবং সমুদ্র তাদের ঢাকিয়া ফেলিলো"[৫৭]।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জাতির প্রতি গজব নাযিল হওয়ার পিছনে কঠিন নাফরমানী, অমার্জনীয় অনাচারসহ বিভিন্ন গর্হিত কার্যকলাপ বিদ্যমান যা সমাজ ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করে তোলে। পবিত্র কুরআনে পাঁচ ধরনের গজব যেমন– বানভাসি, ব্যাঙ, পঙ্গপাল, উকুন ও রক্ত ইত্যাদি নাজিল হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল এতদসংশ্লিষ্ট জাতি বিভিন্নরূপ নাফরমানিতে জড়িত হয়ে সামাজিক আনাচার নামক দূরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়েছিল। নিজেদের কৃতকর্মের মাধ্যমে অনাচারের ঘৃণীত ইতিহাস এর গোড়াপত্তন করে।

এই পৃথিবীর বুকে মানুষ হত্যার প্রথম অনাচার সংঘটিত হয়েছিল প্রথম মানুষ আদমের দুই সন্তানের মধ্যে- এক ভাই তারই আর এক ভাইকে হত্যা করেছিল। কুরআন মজিদে এর বিশাল উল্লেখ হয়েছে। কুরআন মজীদ যে ভঙ্গী ও ভাষায় এই ঘটনার বিবরণ পেশ করেছে তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও করুণ।

"আদমের দুই পুত্র-সন্তানের সত্য কাহিনী লোকদের জানিয়ে দাও। তারা দুইজন কুরবানী দিয়েছিল কিন্তু তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয়েছিল, অপর জনেরটা নয়। অপরজন প্রথম জনকে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, দেখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকী লোকদের (কুরবানীই) কবুল করে থাকেন। তা সত্ত্বেও তুমি যদি তোমার হস্ত আমার দিকে প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, আমি কিন্তু তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার পানে আমার হস্ত প্রসারিত করব না।

---

৫৬. ড. মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৩ ।

৫৭. আল-কুরআন, সূরা ত্বোহা, আয়াত নং ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা আমি তো রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাচ্ছি, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপ বহন করে নাও, ফলে তুমি হবে জাহান্নামী। আর যালিমদের এটাই কর্মফল। অতঃপর তার মানসিকতা উত্তেজিত হয়ে উঠল তার ভাইকে হত্যা করার জন্য। পরে তাকে সে হত্যা করল, এর ফলে সে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ল। পরে আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, কাকটি মাটি খুঁড়তে লাগল, তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তার পন্থা জানিয়ে দেবার জন্য, তখন সে বলে উঠল, হায়! আমি কি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়ে গেছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ লুকোতেও পারছি না। ফলে আমি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লাম"[৫৮]।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন–

"এই কারণেই আমরা বনী ইসরাঈলের উপর এই বিধান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি যে, যে লোক কোন মানুষকে নিহত ব্যক্তির বদলে অথবা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধে বিনা বিচারে হত্যা করবে, সে যেন সমগ্র মানুষকে হত্যা করল। আর যে লোক এই মানুষকে বেঁচে থাকতে দিল সে যেন সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিল"[৫৯]।

মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ডটির সূচনা হয়েছিল হিংসা থেকে এবং পরিণতি লাভ করেছিল পরিপূর্ণ আল্লাদ্রোহীতায়। আল্লাহ্র নাফরমানী করা হল, পিতা-মাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো, ভাইয়ের সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক চূর্ণ করা হল এবং হারামভাবে রক্তপাত করা হল। আর তা-ই হল পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের প্রথম রক্তপাত। অবশ্য তা-ই শেষ রক্তপাত নয়। তারপর ও রক্তপাত বন্ধ হয়নি। তাই ইসলামী শরীয়তে এর দণ্ড অকাট্য, স্থায়ী, অপরিবর্তিত। এ অনাচারের নতুন কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এই অনাচারের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া কি দেখা দিতে পারে, তা অবস্থার প্রেক্ষিতে অবশ্যই বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

পৃথিবীর বুকে প্রথম অনুষ্ঠিত এই নরহত্যার মূল কারণ ছিল হিংসা। দুই ভাই-ই কুরবানী করল; কিন্তু আল্লাহ্ কেন এক জনের কুরবানী কবুল করলেন, অপর জনের কুরবানী কবুল করলেন না। হাবীলের কুরবানী কবুল করা হলো বলে তাকে হত্যা করা হলো, আর কাবীলের কুরবানী কবুল করা হলো না বলে সে হলো হত্যাকারী। কাবীলের মনে তীব্রভাবে জেগে উঠা হিংসাই তার মুখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হলো এই শব্দ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। পরে সে এই হিংসার বশবর্তী হয়েই কার্যতঃ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল, আর তার ফলে সে হলো প্রথম মানুষ হত্যাকারী বিশ্ব মানবতার চিরন্তন শত্রু।

অবশ্য পরিণতিতে তাকে হতে হলো লজ্জিত, লাঞ্ছিত। আর আপন ভাইয়ের নিস্প্রাণ লাশটা সম্মুখে দেখে সে সীমাহীন দুঃসহ মর্মপীড়ায় ছটফট করতে লাগল। অনাচারের তীক্ষ্ম অনুভূতি, ভুলের লাঞ্ছনা ও ক্ষতির ভয়াবহতা তাকে যন্ত্রণা দগ্ধ করে তুলল।

---

৫৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাঃ আয়াত নং ২৭-৩১।

৫৯. আল কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ আয়াত নং ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

সে দিশা পাচ্ছিল না, এই লাশ নিয়ে এখন সে কি করবে! কেমন করে কোথায় এ লাশকে লুকানো যায়, তা-ই ছিল তার শেষ মূহুর্তের একমাত্র চিন্তা।

"শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা একটি কাককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং এই প্রথম হত্যাকারী তার হত্যার শিকার তারই ভাইয়ের নিষ্প্রাণ দেহটিকে কি করে লুকানো যায়, তার পন্থা পদ্ধতির জন্য অনাচারকারীর শিক্ষা গুরু হল সেই কাকটি। এ সময় তার কণ্ঠে যে অনুশোচনার বাণী ধ্বনিত ও উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল– 'হায়, আমি এতই অক্ষম ও অসমর্থ হয়ে গেছি যে, এই কাকটির মত বুদ্ধি আমার হলো না এবং আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করার পন্থাও উদ্ভাবন করতে পারলাম না'। হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকারীর মনে-মগজে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অতি দ্রুত এবং খুবই স্বাভাবিকভাবে, এ তারই প্রকাশ"[৬০]।

কুরআনের ভাষায় আধুনিকতা, প্রকাশ ক্ষমতার অতুলনীয়তা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশের মধ্যদিয়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে সংঘটিত বিষয়াবলী উপস্থাপন করা হয়। বস্তুতঃ কুরআন মজীদ হাবীল কাবীল দুই ভাইয়ের রক্তপাত, হত্যাজনিত কাহিনী অনাগত জাতির জন্য প্রকৃত নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত করেছে"[৬১]।

এই পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই হত্যা যজ্ঞের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মানবজাতিকে এ কলঙ্কের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিবে। হয়তবা চির অব্যাহত থাকবে কু-প্রবৃত্তির খাদ্য ও পানীয় হিসেবে এ সামাজিক অনাচারের বীভৎসতা।

---

৬০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম। অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ) পৃ. ১৮২

৬১. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কোরআন চিরকাল আধুনিক: সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স, পৃ.২২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক অনাচারসমূহের প্রাথমিক ধারণা।

সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে কতগুলো সামাজিক নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন তথা সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে হয়। সামাজিক বিধি-বিধান গুলো মেনে চলাই তার করণীয় বিষয় সমূহের অন্যতম। কিন্তু সমাজে প্রায়শঃই বিধি বিধান বহির্ভূত কার্যক্রম বা অনাকাঙ্খিত আচরণ লক্ষ্যণীয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানপ্রথা ও মূল্যবোধের সংগে পরিচিত হয়। সে থেকেই এ গুলোর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বাস্তব জীবনে তা ধারণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সামাজিক বিধি বিধান গুলো মেনে চলার অনুকূল মানসিকতা গড়ে উঠলেও সবসময় তাদের আচরণে নির্দিষ্ট বিধিমালার ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। সমাজের বিধিবদ্ধ নিয়ম, প্রথা বর্হিভূত যে কোন কাজ বা আচরণই অনাচার হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমাজের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ বহির্ভূত বা মূল্যবোধ বিরোধী আচরণই হচ্ছে সামাজিক অনাচার।

Dhaka University Institutional Repository

অনাচার এর সংজ্ঞা ও পরিচিত

অনাচার শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Disorder, Misdeed, Misconduct, Malpractice, Badconduct, Misbehaviour. ইত্যাদি। যে সকল আচার আচরণ সমাজ জীবনে অপরাধের জন্ম দেয়, সমাজ বিজ্ঞানী ড্রেসলার তাকেই সামাজিক অনাচার হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, অনাচার behaviour is the behaviour that varies significantly is direction or degree from the social norm of that behaviour"[১]।

সামাজিক অনাচার নিয়ে বিশ্লেষণ করলে যে দিকগুলো অতি সহজে লক্ষণীয় তা হচ্ছে:-

- সামাজিক অনাচার একধরণের আচরণ
- আচরণ সমাজের মূল্যবোধ এবং আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থিমূলক আচরণ
- এ আচরণ সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত পরিত্যাজ্য।

ডেভিড ড্রেসলার বলেন, A social problem in a condition growing out of human interaction that is considered undesirable by resolved through preventive or remedial action"[২]।

অপরাধ বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে বিচ্যুতিমূলক আচরণ, এ বিচ্যুতিমুলক আচরণই সামাজিক অনাচারের রূপ নিয়ে সমাজে কঠিন সমস্যার উৎপত্তি ঘটায়। তাই সামাজিক অনাচার বর্তমান সামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে সামাজিক অনাচার সম্পর্কে কোন কার্যকর বা ফলপ্রসূ গবেষণা পরিচালিত হয়নি। যার ফলে মাঠ পর্যায়ে এ অনাচারসমূহ নির্মূল, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণে যথার্থ পদক্ষেপ বাস্তাবায়িত সম্ভব হয়নি। বরং সামাজিক অনাচারগুলো শুধুমাত্র পত্রিকার রিপোর্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাসমূহ, ম্যাগাজিন, বার্তাসংস্থা ও বিভিন্ন মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যসমূহ উদঘাটনের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুকরণ করে সামাজিক অনাচারসমূহ সুন্দরভাবে নথিভূক্ত করে থাকেন বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

নিজস্ব ও বিদেশী অর্থায়নে সামাজিক অনাচারের বাস্তব চিত্র সচেতন মহলে উন্মুক্ত করার টার্গেটে চলমান তথ্য ও লোমহর্ষক ঘটনার সমন্বয়ে মূল্যবান লেখনী পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে যে সকল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সেবা দিচ্ছে তার মধ্যে TIB উল্লেখযোগ্য।

---

১. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান, প্রথম পত্র পৃ. ২৭।

২. David Dressles, sociology; the study of human interaction (New York; Alfred A knopt. Inc.1969) p. 464.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত সামাজিক অনাচার সংক্রান্ত রিপোর্ট বা এতদসংক্রান্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে সামাজিক অনাচার যে বাংলাদেশের সমাজ প্রেক্ষাপটে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশে সংঘটিত সামাজিক অনাচারসমূহ বহুমূখী ও বিচিত্রধর্মী। যেমন- অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বাংলাদেশের সামাজিক অনাচারের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় ৭৬ ভাগ লোক চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। যার ফলে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব না হওয়ায় তাদেরকে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হয়। ফলে সামাজিক অনাচারের সূত্রপাত ঘটে। সাধারণতঃ বন্ধুবান্ধবদের টাকা চুরি, নিজের ঘরের জিনিসপত্র চুরি, না বলে কোন কিছু নিয়ে নেয়া ইত্যাদি দারিদ্র্যের কারনেই ঘটে থাকে। আমাদের সমাজে পতিতাবৃত্তি নিয়মরীতি বিরুদ্ধ একটি কাজ। কিন্তু দারিদ্র্যের কারনে অনেক মেয়ে সামাজিক রীতি-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়।

আমাদের সমাজে ক্রমবর্ধমান হারে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় বেকার জীবনে অনেকে হতাশাগস্ত হয়ে পড়ছে। আশংকাজনক ভাবে এদের একটি বিরাট অংশ থেকে হতাশাগ্রস্থ হয়ে সমাজ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। ফলে তারা নানা রকম বিচ্যুতিমূলক আচরণ বা সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়। যেমন– ছিনতাই, খুন, রাহাজানি, মাদকদ্রব্য সেবন, চাঁদাবাজি ইত্যাদি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী নীতি প্রবল। উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত, সম্পদের অসম বন্টন, অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি আমাদের দেশে অনাচার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

বর্তমানে সামাজের দৃষ্টিতে আয় ও ক্ষমতার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার চেয়ে অর্থকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যেহেতু বর্তমান সমাজের দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো অর্থ, তাই মানুষ যে কোন পন্থায় অর্থ সংগ্রহের কাজে স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ত যা সমাজে অনাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ পদ্ধতির সাথে যৌতুক প্রথা বিদ্যমান যা সমাজ জীবনে মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে পরিগনিত। এই মারাত্মক ব্যাধি অনেক সময় সমাজ রীতি বিরুদ্ধ কাজে পরিনত হয়। যেমন- অযথা স্ত্রীকে মারধর, টাকার জন্য নির্যাতন প্রভৃতি। এরফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অপরাধমূলক আচরনে জড়িয়ে পরে । যেমন– আত্মহত্যা, এসিড নিক্ষেপ, অহেতুক তালাক।

"বাংলাদেশে সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে কারও চরম দারিদ্র্যও বেকারত্বের অভিশাপ, অন্যদিকে আরেক শ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি ও মানমর্যাদার উচ্চ ধাপে উঠার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা। সে আকাঙ্খা চরিতার্থে অনেকের রয়েছে অন্য পথে অগ্রসর হবার নির্লজ্জ বাসনা"[৩]। আবার সচ্ছল ও সম্পদশালীদের অনেকেই পেশাগত ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক রীতি-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। তবে এদের সন্তানেরা অধিক প্রাচুর্যের কারনে উগ্র জীবন যাপন করে, যা সামাজিক অনাচারের নামান্তর, সুতারাং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্য যেমন অপরাধের জন্য দায়ী, অনুরূপভাবে সম্পদের প্রাচুর্য ও উচ্চাবিলাসিতা অনাচার সৃষ্টির জন্য দায়ী। বাংলাদেশের মানুষ মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূলে না থাকার কারনে অপরাধমূলক আচরণ করে এবং কঠিনভাবে সামাজিক অনাচারে জড়িয়ে পড়ে।

---

৩. বি. এম. জাকির হোসেন, (সম্পাদকীয়) ডিগ্রী সমাজ বিজ্ঞান: প্রথম পত্র পৃ. ২৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

"সামাজিক অনাচারের সাধারণ সংজ্ঞায় সমাজের স্বার্থে দূর করা দরকার এমন ক্ষতিকর বা ভীতিজনক কোন অবস্থাকে বুঝায়"[৪]।

সমাজবিজ্ঞানী লরেন্স কে ফ্রাংক বলেন-"Any dificulty or misbehavior of fairly large number of persons which we wish to remove or correct"[৫]

সমাজবিজ্ঞানী ই র‍্যাব ও জে. সি. সেলজনিক-এর ভাষায় সামাজিক অনাচার হলো- "A problem in human relationships which seriously threatens society itself or impedes the important aspiration of many people"[৬]

সামাজিক অনাচারের সংজ্ঞাকে অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন পল.বি.হর্টন ও জোরাল্ড আর. লেসলী। তাদের পুস্তক The sociology and social problem -এ বলেন যে "সামাজিক অনাচার হল অস্বস্থিকর হিসেবে বিবেচিত একটি অবস্থা যা সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং যার সম্পর্কে দলীয় সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়"[৭]।

"মানব সমাজের আচরণ বিধি লিখিত অলিখিত উভয় প্রকার হতে পারে। যে সমাজে লিখিত আইন কানুনের বালাই নেই সে সমাজে ঐতিহ্য ও লোকরীতির মাধ্যমে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। বস্তুতঃ সমাজে যা অনুমোদিত নয়, তা করার নামই অনাচার। সমাজে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা নির্ধারণ করার মাপকাঠী সব সময় এক রকম নয়। কারণ সমাজের পরিবর্তনের সাথে ন্যায় অন্যায়ের ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। কাজেই অপরাধমূলক আচরণ বা অনাচার সবসময়ই আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়। মানুষ অতীতেও অপরাধজনিত আচরণের মোকাবিলা করেছে বর্তমানেও করছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, একমাত্র আধুনিক সভ্য সমাজেই একে একটি বিরাট সামাজিক অনাচার বা অপরাধজনিত আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়"[৮]।

যে সব সমাজে অপরাধজনিত আচরণের হার তূলনামূলকভাবে অনেক কম। সমাজ বিজ্ঞানী রেকলেস Criminal Behaviour নামক গ্রন্থে সে সব সমাজের নিম্নোক্ত ধরণের কতক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

---

৪ ডিগ্রী সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র, সম্পাদকীয় বি.এম. জাকির হোসেন, পৃ. ২৯৪

৫. Samuel Koenig , sociology ; An introduction to the science of society. (New york: Barmes & Noble Inc. 1968) p.303

৬. Samuel Koenig, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩০৩

৭. E-Roab and G.Jselsnick সবলড়ৎ social problem (New york; Row peterson co 1959) p.309.

৮. E-Roab প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

"নিম্নবর্ণিত সমাজে সামাজিক অনাচার তূলনামূলকভাবে কম"[৯]

১। যে সকল সমাজ বাহিরেরজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আলাদা।
২। এ সকল সমাজে জনসংখ্যার গতিশীলতা নিতান্তই অল্প।
৩। এখানকার চলমান সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে অধিক অপরিবর্তনীয়।
৪। সংস্কৃতি ও মনের দিক থেকে এ সব সমাজের জনগোষ্ঠী সমসত্ত্বাবিশিষ্ট।
৫। এ ধরনের সমাজে প্রতিষ্ঠানগত অসংগতি নেই বল্লেই চলে।
৬। এ সব ক্ষেত্রে শ্রেনী বৈষম্য যথাসম্ভব কম।
৭। এখানে মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, ও প্রথার মিল রয়েছে।
৮। এ সব সমাজে সু-কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান।

" যেসব সমাজে সামাজিক আনাচার তুলনামূলক ভাবে বেশী তার চিত্র"[১০]

১। বাইরের জগতের সাথে এসব সমাজের যোগসূত্র বেশী ।
২। এ সব সমাজ অতিশয় গতিশীল ও পরিবর্তনশীল।
৩। এখানকার সংস্কৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল।
৪। বহু ভাষাভাষী, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে এ ধরনের সমাজ গঠিত হয়।
৫। এ সব সমাজের মানুষ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত।
৬। বিচিত্র ও পরস্পর বিরোধী আচরণবিধি এ ক্ষেত্রে সু-স্পষ্ট।
৭। এ সব সমাজে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অধিকতর দুর্বল।

উপরোক্ত দুই ধরনের সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, প্রথমোক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান আচরণগুলো আদিম সমাজ, সবল লোকসমাজ এবং অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। আর আধুনিক কালের অতিশয় উগ্র সমাজের ভিতর দ্বিতীয়োক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয়। তাহলে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত আদর্শ ও অনুন্নত সমাজের চেয়ে আধুনিক কালের সভ্য সমাজে সামাজিক অনাচার অধিকতর প্রকট।

বিশেষ করে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় উপরোক্ত ৭টি বৈশিষ্ট্যের হু-বহু মিল এবং পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি থাকায় বাংলাদেশকে অনাচারে নিমজ্জিত একটি বিদেশী অনুকরণীয় অধুনিক সমাজ হিসেবে আখ্যা দিতে পারি। এদেশের সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে অনাচারের বহিষ্কার ও প্রতিরোধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
১০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অনাচার এর স্বরূপ ও প্রকৃতি

সামাজিক সমস্যা, অনাচার এবং অপরাধ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সমাজে চলমান বিভিন্ন সমস্যাজনিত কারণে মানুষ অনাকাঙ্খিত আচরণে লিপ্ত হয়। সমাজ স্বীকৃত নয় এমন আচরণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে অপরাধ জগতকে উর্বর করে তোলে। সৃষ্টি হয় সমাজে বড় বড় অপরাধী চক্র। সামাজিক অনাচার ও সমস্যাবলী চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত প্রকৃতি ও স্বরূপগুলো সুস্পষ্ট লক্ষণীয়।

১। সমাজ জীবনেই সামাজিক অনাচারের উদ্ভব

অনাচার মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের মাধ্যমেই এর বহিঃপ্রকাশ, আর মানুষ সামাজিক জীব। অনাচার লালন করেই মানুষ সমাজে বসবাস করে। সে হিসেবে সামাজিক অনাচার সমাজ দেহেই সৃষ্টি এবং লালিত পালিত হয়। সমাজ ব্যবস্থায় যখন বিশৃংখলা ও অসঙ্গতি আসে তখনই সামাজিক অনাচারের উদ্ভব হয়। সামাজিক সম্পর্ক, বন্ধনের মধ্যে আচরণগত বিচ্যুতি আসলেই সামাজিক অনাচার জন্ম দেয়। তাছাড়া সাংস্কৃতিক শূন্যতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক অনাচারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

২। সামাজিক অনাচার সমাজের মূল্যবোধ পরিপন্থী

সামাজিক অনাচার সমাজের মূল্যবোধ বিরোধী অবস্থা। প্রত্যেক সমাজেই সমাজসেবী নিজের কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করে ও নিজেরা কতগুলো ধ্যান-ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এসব মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাল ও মন্দ কাজের পার্থক্য নির্দেশ করে। তাতে যে কাজ বা ঘটনা মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও মন্দ হিসেবে বিবেচিত হয়, সমাজবাসী তা মূল্যবোধ পরিপন্থী বা অকল্যানকর হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজের এই মূল্যবোধ পরিপন্থী অবস্থাই সামাজিক অনাচার হিসেবে খ্যাত।

৩। সামাজিক অনাচার সমাজের জন্য অস্বস্তিকর

সমাজ বিজ্ঞানীগণ সামাজিক অনাচারকে সমাজের জন্য একটি অস্বস্তিকর অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্য কথায় সমাজে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং অস্থিরতা ডেকে আনে। তাতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয় ও নৈরাশ্য কিংবা উত্তেজনা দেখা দেয়। সমাজবাসীর এরূপ নৈরাশ্য ও উত্তেজনা তাদের মানসিকতার উপর একটি চাপ সৃষ্টি করে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণ চায়।

৪। সামাজিক অনাচার সমাজের অধিকাংশ লোককে ক্ষতিগ্রস্ত কওে

ব্যক্তিগত বা দলগত পর্যায়ে কোন অনাচার সামাজিক অনাচার নয়। সমাজে বসবাসরত জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকের উপর যখন কোন পরিস্থিতি ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে, তখন তা সামাজিক অনাচার হিসেবে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। পরিবর্তশীল সমাজে সামাজিক অনাচার ও পরিবর্তনশীল

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন অন্যায়গুলোরও রূপ বদলায়। কেননা পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সামাজিক সমস্যা নির্দিষ্টকরণকে প্রভাবিত করে। সে জন্য অতীতে যা অনাচার ছিল আজকের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তা অনাচার হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে। যেমন– উনিশ শকতের আগে বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ ছিল তৎকালীন সমাজের অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। বিধবা বিবাহ বা বহুবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৬ শতকের ফাল্গুন মাসে ১৩৯ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে।

বিধবাবিবাহের প্রচলন না হলে ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তিতে সমাজ কাঠামো কলুষিত হওয়ার আশংকা করেই বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কঠিন ভূমিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রাঞ্জল গদ্যে এতদসংক্রান্ত বচন উচ্চারণ করেছিলেন।

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ করা শাস্ত্রবিহীত। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মাচার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গ লাভ করে। মনুষ্য শরীরে যে স্বাদ ত্রিকটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে ততসমকাল স্বর্গে বাস করে"[১১]

৬। সামাজিক অনাচার ক্রমশঃ জটিল ও বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে

সমাজ যত পরিবর্তিত হচ্ছে ততই তা জটিল ও বিচিত্র ধর্মীয় রূপ ধারণ করছে। "১৫৬০ সালে পর্তুগালে তৎকালীন ফরাসি রাষ্ট্রদুত জিন নিকট-ই সর্বপ্রথম তামাক গাছের অনেক গুণের বিষয় আবিষ্কার করেন তখন অনেকে তামাক গাছকে একটি আগাছা বলে গণ্য করতেন। প্রথমতঃ এ তামাক নেশা জাতীয় বস্তু হিসেবে মুখে চিবিয়ে খাওয়া হত"[১২]

পরবর্তীতে চিলুম ও হুঁকোর সাহায্যে খুব অভিজাত পদ্ধতিতে তামাক সেবন করা হত। হুকো বা হুক্কার এই মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কোন কাব্য রসিক এর উপর সুন্দর ধাঁ ধাঁ তৈরী করেন, তা হল:

"যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন,
ছেলে নয়, পেলে নয়, ডাকে ঘনঘন।
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা লয়ে মারে বুকে
কন্যা নয় পুত্র নয় চুমু খায় মুখে"[১৩]

ফেনসিডিল ছিল ঠাণ্ডাও কাঁশি নিবারণকারী ঔষধ সিরাপ বিশেষ। অথচ সময়ের বিবর্তনে ফেনসিডিল এক উল্লেখযোগ্য মাদক হিসেবে যুব সমাজে বিস্তার লাভ করায় বর্তমানে ফেনসিডিল আমদানী, বিক্রি এবং সেবন সম্পূর্ণরূপে মাদক আইনে নিষিদ্ধ ও সামাজিক অনাচার হিসেবে পরিগণিত। এভাবে সামাজিক অনাচার সময়ের বিবর্তনে এবং সামাজিক বৈবিত্র্যতায় ক্রমশঃ জটিল ও বৈচিত্র্যধর্মী রূপ ধারণ করেছে।

---

১১. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, পৃ. ১৪০
১২. মওলানা এ.কে.এম সিরাজুল ইসলাম, ইসলামে নেশা, পৃ. ৭১,৭২
১৩. মওলানা এ.কে.এম সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

৭। সমাজভেদে সামাজিক অনাচারের তারতম্য

সমাজ ভেদে সামাজিক অনাচারের ধরণ ও প্রকৃতিতে তারতম্য দেখা যায়। তাতে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সামাজিক অনাচার হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্য কথায় সমাজের কোন কোন পরিস্থিতি অস্বস্তিকর বা মঙ্গল পরিপন্থী সেটি নির্ণীত হয় সমাজবাসীর নিজস্ব মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে। সমাজ ভেদে মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য সামাজিক অনাচারের তাৎপার্যও তারতম্য আনে। উদাহরণ স্বরূপঃ আমেরিকার সমাজে দারিদ্র্যকে যেভাবে বিবেচনা করা হয়, আমাদের সমাজে দারিদ্র্য সে অর্থ বহন করে না। আমেরিকার সমাজে নারী নির্যাতন বলতে যেটা বুঝে থাকেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটা ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। এ দুই সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এক না হওয়ার কারণে সামাজিক অনাচারসমূহের তাৎপর্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

৮। সামাজিক সমস্যা ও অনাচার পারস্পরিকভাবে সম্পর্ক যুক্ত

সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন উপাদান বা অংশের সম্পর্কযুক্ত শৃঙ্খলে গড়ে উঠে ও টিকে থাকে বলে এর মাঝে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাও একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে সমাজে উদ্ভুত একটি সমস্যা সৃষ্টির পিছনে যেমন– বিভিন্ন শর্তের ক্রিয়া বা অন্যান্য সমস্যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি নতুন অনাচারটি অন্যান্য বিভিন্ন অনাচার উদ্ভবও বিস্তারে সম্পর্কযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ মাদকাসক্তি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনাচার। মাদকাসক্তির ফলে, সিঁধেল চুরি, ছিনতাই, নারী নির্যাতনসহ অনেক গর্হিত আচরণ ও কু-কর্ম ঘটে থাকে। আবার নারী নির্যাতনের ফলে, পতিতাবৃত্তি বিদেশে নারী পাচারের মত ঘৃণ্য অনাচার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নিরক্ষরতার মত সামাজিক সমস্যা উদ্ভবের পিছনে অনেক সামাজিক কারণ দায়ী, আবার নিরক্ষরতা অন্যান্য সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অজ্ঞতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদির উদ্ভব ও বিস্তারে কাজ করে।

৯। সামাজিক অনাচারের অন্তর্মুখী ও বহুমুখী দিক রয়েছে

প্রত্যেক সামাজিক অনাচার এর বহুমুখী শর্ত ও অন্তর্মুখী সংজ্ঞার্থ রয়েছে। বহুমুখী শর্ত হল এমন অবস্থা যা নিরপেক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরীক্ষীত হয়। যেমন উৎপত্তি প্রমাণে নির্দিষ্ট করা হল যে বাংলাদেশে ৪০ লক্ষ লোক বেকার। অন্যদিকে অন্তর্মুখী সংজ্ঞার্থ হলো মূল্যবোধ পরিপন্থী বিবেচনায় কিছু সংখ্যক লোকের সচেতনতা। যেমন- আমাদের দেশের অনেক লোক অনুভব করে যে, দারিদ্র্য কবলিত অবস্থায় কার্যক্ষেপণ উচিৎ নয়।

১০। অনাচার মোকাবিলায় দলগত উদ্যোগের অনুভব উপলব্ধি থাকে

সামাজিক অনাচার সুচনায় সমস্যাগ্রস্তরা দলগত উদ্যোগ গ্রহণে গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং এক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়। যেহেতু সমস্যা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির নয়, সে জন্য দলগতভাবেই সমাজবাসী তা মুকাবিলা করতে এগিয়ে আসে, এক্ষেত্রে দলীয় কার্যক্রম, দলীয় আন্দোলন, দলীয় পরিকল্পনা ইত্যাদি সমাজবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে, উদাহরণ স্বরূপঃ ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ছিল বিশ্ব নারী আন্দোলনের এ যাবৎ কালের সর্ববৃহত্তর সমাবেশ, এ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯ টি রাষ্ট্রের দ্বারা বেইজিং ঘোষণা এবং বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (পি এফ এ) গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পি.এফ.এ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীতে জাতীয় নারী নীতি ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান (ন্যাপ) প্রস্তুত করে সাথে যাকে কেন্দ্র করে সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে (ন্যাপ) ও পি এফ এ বাস্তবায়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়।

সামাজিক অনাচার সমূহের মধ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে দলগত উদ্যোগের মধ্যে ২০০৫ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক পর্যায়ে পি.এপ.এ কার্যক্রম মূল্যোয়ন সভা আয়োজন করা হয়। বিশ্বের নারী উন্নয়ন সমস্যাও সম্ভাবনা নিয়ে উক্ত আলোচনা সভায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৮০ জন মন্ত্রী , ১৬৫ টি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে ১,০০০ জন সরকারী প্রতিনিধি ও ২৬,০০ জন বেসরকারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এভাবে সামাজিক অনাচার মোকাবিলায় আঞ্চলিকভাবে দলগত উদ্যোগ বিভিন্ন সময়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছে।

* বাংলাদেশে সামাজিক অনাচারের স্বরূপ ও প্রকৃতি

বাংলাদেশ বিশ্বের দারিদ্র ও অনুন্নত দেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম, বাংলাদেশ বহুমুখী ও পরস্পর জটিল সামাজিক সমস্যা ও অনাচারে জর্জরিত। দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত বিদেশী শাসন ও শোষণের প্রভাবে বাংলাদেশের সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে সামাজিক অনাচার সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার সমূহ বহুমাত্রিক। এদেশের বেশীরভাগ অনাচার মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে সৃষ্ট। সেজন্য বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার সমূহ প্রকৃতিগতভাবে অর্থকেন্দ্রিক। মাথাপিছু নিম্ন আয় এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রতিকুল অবস্থার শিকার হচ্ছে।

ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার সৃষ্টিতে প্রাকৃতিকও ভৌগোলিক উপাদানের দূর্যোগ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্থায়ী কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। আর এ সকল সমস্যাই ঘৃণ্য সামাজিক অনাচার হিসেবে সমাজদেহে প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট দরিদ্রতা বাংলাদেশের বিরাট সামাজিক সমস্যা। এই দরিদ্রতার কড়াল গ্রাসে নিপতিত হয়েই মানুষ চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই সহ বিভিন্ন সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয়।

বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার প্রকৃতিগতভাবে অর্থকেন্দ্রিক হলেও শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রকটতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ন এবং শিল্পায়নজনিত সামাজিক পরিবর্তন ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, ভূমিকার দন্দ্ব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যার প্রকটতা বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

বাংলাদেশে বিরাজমান অনাচারগুলোর লক্ষ্যনীয় স্বরূপ হল, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া এবং বহুমুখিতা। বাংলাদেশের কোন অনাচারই বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে সমাজে বিরাজ

Dhaka University Institutional Repository

করছেনা। প্রতিটি অনাচার পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যটির কারণ রূপে সমাজে বিরাজ করছে।

বাংলাদেশের সামাজিক শ্রেণী এবং স্তর বিন্যাসের প্রেক্ষিতে সামাজিক অনাচার গুলোর প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। যেমন- উচ্চ শ্রেণীতে সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্বিক সমস্যার প্রকটতা বেশী। কিন্তু নিম্ন এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাগুলো প্রধানত: মৌল চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা জনিত কারণে সৃষ্ট। উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা মৌল চাহিদা পূর্ণাঙ্গ রূপে মেটাতে সক্ষম হওয়ার পরও ঘুষ কেলেংকারী, কালোবাজারী সহ বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ ছাড়াও বিদেশী ব্যাংক গুলোতে অলসভাবে ফেলে রাখে। যা এদেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে কঠিনভাবে বাধার সৃষ্টি করে। ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্যই ভিক্ষাবৃত্তির রূপ ধরে চুরি, ডাকাতি, মাদক ব্যবসাসহ নেশাগ্রস্ত জীবনে প্রবেশ করে দরিদ্র শ্রেণী।

জাবরিয়াদের মতে আল্লাহ পরীক্ষামূলকভাবে কাউকে ধনী আর কাউকে দরিদ্র বানিয়েছেন। দরিদ্রদের প্রতি তাদের নছিহত হল "এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর বন্টন ব্যবস্থা, এতে সন্তুষ্ট থাক, অধিক পাওয়ার ও একে পরিবর্তন করার চেষ্টা করিওনা"[১৪]।

"সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যাস্ফীতিকে বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও জনসংখ্যা এদেশের অপরাধ, অনাচার বৃদ্ধির কোন প্রকৃত কারণ নয়"[১৫]।

বাস্তবে দারিদ্র্য হল এদেশের প্রধান সমস্যা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের প্রভাব থেকে বাংলাদেশ বেড়িয়ে আসতে পারছে না। রক্ষনশীল উচ্চশ্রেনীর কর্মকর্তাদের সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্বিক বিষয়গুলো প্রধান্য দিতে গিয়ে রক্ষকেরা ভক্ষকের ভূমিকায় অবস্থান নেওয়ায় নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেনীরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সামাজিক অনাচারে জড়িয়ে পরে।

এজন্যই বাংলাদেশের অনাচার গুলোর প্রকৃতি সামাজিক স্তর এবং শ্রেনী বিন্যাসের প্রেক্ষিতে এক নয় বরং বিভিন্ন ধরণের। উচ্চ শ্রেনী কর্তৃক সামাজিক অনাচারের স্বরুপ ও প্রকৃতি একধরণের আবার নিম্ন শ্রেনীর মাধ্যমে সংঘটিত সামাজিক অনাচারের প্রকৃতি আরেক ধরণের।

---

১৪. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা "আল-জাহাল ইসলাম, কায়রো মাকতাবায়ে ওহাবা, ১৯৮৬ইং) পৃ. ৭.

১৫. অধ্যক্ষ হাওলাদার আব্দুর রাজ্জাক, মহানবী (দঃ) এর অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব অগ্রপথিক (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫ইং) পৃ.২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অনাচার এর শ্রেণীবিন্যাস

আজ সমগ্র বিশ্ব অপরাধ জনিত আচার আচরণে এবং সমাজ স্বীকৃত নয় এমন কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। উন্নতবিশ্ব থেকে শুরু করে অনুন্নত বিশ্বে গর্হিত কার্যকলাপ তার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। তাই সমগ্র বিশ্বের জন্য অনাচার বর্তমান মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। সামাজিক সংঘাত ও নিয়ন্ত্রন শিথিল হয়ে পরার কারণে অনাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। বিজ্ঞানের জয়োযাত্রা ও প্রযুক্তিগত উন্নতি বর্তমানে পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলছে। যার ফলে অনাচার ভিন্নরুপ ধারণ করছে। ১১/০৯/২০০১ইং তারিখে 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংসের অজুহাতকে সামনে রেখে আমেরিকা ও ব্রিটেন কর্তৃক সন্ত্রাস দমণে ধূয়া তুলে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে ২০০১ সালে আফগানিস্থান দখল এবং ব্যাপক বিধ্বংসী মরণাস্ত্রের সূত্র ধরে ২০০৩ সালে ইরাক দখলের বিষয়টি সন্ত্রাস নামক আন্তর্জাতিক অনাচারটি বিশ্বের দরবারে সুস্পষ্ট। অনাচার দমন ও প্রতিরোধে বিশ্ববাসী বসে নেই। নানা রকম আদল, আইন-কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। আর এই সকল অনাচার বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে বলে এর শ্রেণীবিভাগেও জটিলতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনাচারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল।

(১) ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী অনাচারের শ্রেনীবিভাগ নিম্নরূপ

ব্যবসা বাণিজ্য ও পরোক্ষভাবে ভিক্ষাবৃত্তির বেশে আগমন করে প্রায় ২শত বছর ব্রিটিশরা এদেশ শাসন করেছে। তাদের শাসন ও শোষণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের সাধারণ জনতাকে অনাচারের সাথে মিতালী করেছে। তারা নিজস্ব আইনের চোখে অনাচারকে নিম্ন বর্ণিতরূপে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন।

ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী অনাচার চিত্র [১৬]

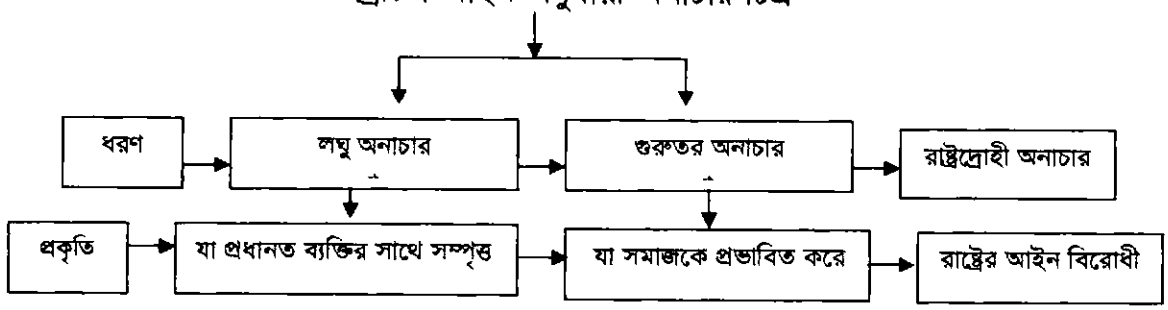

(২) ধরণভেদে অনাচারের শ্রেনী বিভাগ

এদেশের অনাচারের প্রকৃতি ও ধরণ বহুমাত্রিক। অনাচারের শ্রেনী বিন্যাস করণে সামাজ বিজ্ঞানীদের চিন্তা চেতনার সমন্বয়ে সামাজিক অনাচারের ধরণ, প্রকৃতি বিবেচনা করে উহাকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

---

১৬. P. Sorokin : Contemporary Sociology theories, New york, Harper and Row, 1984, P. 132.

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সংঘটিত অনাচার

সমাজে কারণে অকারণে রাজপথে ক্যাম্পাসে বসবাস গৃহে বিভিন্ন সময়ে আত্মহত্যা, এসিড নিক্ষেপ, গুলি করে হত্যা, প্রভৃতি অহরহ লক্ষ্যণীয়, এগুলোকে সংঘটিত অনাচার বলা হয়ে থাকে।

(খ) গতানুগতিক অনাচার

মানুষ সৃষ্টির ঊষালগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অনাচার মানুষের সৃষ্টি, আবার মানুষই অনাচার জনিত ক্ষতি বা সমস্যার শিকার হয়। চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, প্রভৃতি অনাচার গুলো চলমান সমাজে গতানুগতিক হিসেবে স্বীকৃত।

(গ) রাজনৈতিক অনাচার

রাজনৈতিক দল, সম্প্রদায় ও নেতা নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় কিছু অনাচার সমাজে বিরাজ করছে সর্বদা। দুর্নীতি নামক ঘৃণ্য অনাচারটি সমাজদেহে দুরারোগ্য ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, কালোবাজারী, মাদক ব্যবসা, জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে কালটাকার পাহাড় গড়া রাজনৈতিক মদদ ও সহযোগিতার মধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনৈতিক অনাচার হিসেবে যে বিষয়টি কঠিন ভাবে বিরাজমান তা হচ্ছে নিজস্ব ক্ষমতা স্থায়ী করণের জন্য রাজনৈতিক গোলযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনে সংকোচহীন হত্যা। পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে পারলে আর কোন প্রতিদন্দ্বি রইল না। এই প্রবনতা ও চিন্তাধারা রাজনৈতিক অনাচারের রূপ ধারণ করছে।

(ঘ) ভদ্রবেশী অনাচার

অনাচার এর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ও জনতার মনোযোগ আকর্ষণ এবং সাধারণ জনগনের সরল বিশ্বাসের আড়ালে চলছে এক ধরণের অনাচার যাকে ভদ্রবেশী অনাচার বলা যায়। উদাহরণ স্বরুপ: আমেরিকা সন্ত্রাস দমনের শ্লোগান দিয়ে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতায় নিজেই সন্ত্রাসী কার্মকান্ড চালাচ্ছে। বাংলাদেশের অভিজাত, কুলীন এবং ডিক্টেটর শ্রেণীর ভদ্রচিত আচরণের আড়ালে রয়েছে অনাচার মূলক কর্মকান্ড এবং সমাজের অপছন্দনীয় আচার আচরণ।

(৩) কারণভেদে অনাচার এর প্রকারভেদ

অনাচার বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হতে পারে। কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করে সামাজিক অনাচারকে নিম্ন বর্নিত পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) অর্থনৈতিক অনাচারঃ-

অর্থনৈতিক কারণে বহুরূপী অনাচার সংঘঠিত হয়। অর্থের উপার্জন, ভোগ বন্টনের মধ্যে চাহিদার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার কারণে বিভিন্ন পেশাজিবী, ভোক্তাশ্রেণী ডিক্টেটর শ্রেণী অনাচারে জড়িয়ে পরে। ২৭শে জুন ২০০৭তাং এর অনেক গুলো দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতার বড় অক্ষরে ছাপা বাংলাদেশের বনখেকোদের আটক সংক্রান্ত ঘটনা, বিভিন্ন ব্যাংকে অবৈধ কালো টাকার পরীক্ষিত তথ্য বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে দুর্নীতির ভয়ঙ্কর চিত্র উপহার দিয়েছে। আর্থিক দৈন্যতাও দারিদ্র্যের কসাঘাতে পিষ্ট হয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজের ইতিহাস বাংলাদেশে নিত্য নুতন।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় এক শ্রেণীর মানুষ সুখের উপরে সুখ পেতে চায় আরেক শ্রেণী দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করায় জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার ক্ষুদ্র চিন্তায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনাচারে জড়িয়ে পরে। এ সকল অনাচার গুলো অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় একে অর্থনৈতিক অনাচার বলা হয়ে থাকে।

(খ) সামাজিক অনাচার

সামাজিক কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন অনাচার সংঘটিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির চেয়ে অর্থশালী, ধূর্ত, প্রতারক ব্যক্তিকে সমাজ বেশী মূল্যায়ন করে ও অতিরিক্ত মর্যাদা দেয়। তাই মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য কোন পথ বেছে নিচ্ছে তা দেখেনা। অর্থই হল মর্যাদার মাপকাঠি। সমাজিক অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে অনাচারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সমাজিক পরিবেশ যদি অনাচারের অনুকুলে হয়, তাহলে মানুষ সহজ ভাবে অনাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ে। উচ্চাভিলাষী স্বপ্নে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় জমায়। কিন্তু শহরে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষ বিভিন্ন অনাচারে জড়িয়ে পড়ে। শিল্পায়ন, শহরায়ন, সমাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি দেশের সামাজিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাকে দূর্বল করে দিয়েছে। সঙ্গী বন্ধু বান্ধবদের লাগামহীন চলাফেরার প্রতি সমাজিক নিয়ন্ত্রন না থাকায় সামাজিক অনাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পতে থাকে।

(গ) যৌন অনাচার

বেইজিং+১০ সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত যৌন কর্মীর সংখ্যা ২,০০,০০০/= এ ছাড়া পুলিশ হিসাব মতে শিশু যৌনকর্মীর সংখ্যা ১৩,০০০/= জন। ঢাকার শহরে অবস্থানরত যৌন কর্মীর সংখ্যা ২০,০০০/= জন। এসব যৌন কর্মীদের ৯৫% genital herps এবং ৬০% Syphilis এ আক্রান্ত। শিশু যৌন কর্মীদের ৮৫% এর সচেতন যৌনমিলন সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। যৌন অনাচার শুধু সমাজ কাঠামোকে দূর্বল করেনা, বরং AIDS এর মত মরনব্যাধির ৭৫% থেকে ৮০% যৌন অনাচার জনিত কারণে বিস্তার লাভ করে। এছাড়া আরেক পরিসংখ্যানে লক্ষ্যণীয় যে, HIV ভাইরাস বাংলাদেশে বিস্তারের আন্তর্জাতিক সিড়ি হচ্ছে অবাধ যৌন অনাচার। কাজেই বিভিন্ন ধরণের অনাচারের মধ্যে যৌন কর্ম বা যৌন অনাচার সবচেয়ে মারাত্মক এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর একধরনের অনাচার। যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের প্রধান দাবী হওয়া উচিত।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় অনাচারঃ

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার ঘন ঘন পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে এ দেশের আইন শৃঙ্খলা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। ২৮শে অক্টোবর ২০০৬ তারিখে ঢাকার পল্টন এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে দুটি Spote death এবং গোটা বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে বিভিন্ন অনাচার সংঘটিত হয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দূর্বলতার কারনে আইন নিজস্ব গতিতে চলায় বিঘ্ন ঘটে, বিচার ও শাস্তি বিধানের সীমাবদ্ধতায় অনেক রাঘব বোয়াল আইনের ফাঁক ফোকরে বেড়িয়ে যায়, এতে রাষ্ট্রীয় অনাচার বৃদ্ধি পায়। সুবিধাভোগী কর্মদক্ষতার অধিকারী ও দুশ্চরিত্রের মানুষ নেতৃত্বের আসনে

Dhaka University Institutional Repository

অধিষ্ঠিত, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের অনাচার সৃষ্টি হয়। স্থিতিশীল রাজনৈতি কাঠামোর অনুপস্থিতি, দূর্বল রাজনৈতিক দল ও দলীয় নেতৃত্বের পরিপক্কতার অভাবে সন্ত্রাস, চোরাচালানী, পাচার, শুল্ক ও করফাকি, ঋণখেলাপী, ক্ষমতার দাপটে সরকারী সম্পদ কুক্ষিগত করণসহ অগণিত সামাজিক অনাচার রাষ্ট্রীয় অনাচার হিসেবে বিরাজ করছে।

(ঙ) মনস্তাত্ত্বিক অনাচারঃ

মানুষের মনন, চিন্তা চেতনা ও বহুরূপী মানসিকতার কারণে সমাজে কিছু অনাচার সংঘটিত হয়। মানসিক সংকীর্ণতা দানশীল ও উদার মনোভাবের অভাবে দরিদ্রতার শিরি বেয়ে সামাজিক সাম্য, সখ্যতা বিনষ্টসহ চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই ও বিভিন্নভাবে রক্তপাত ঘটতে পারে। রুক্ষ, উচ্ছৃঙ্খল ও অহংকারী যৌবনের দাপটে ধর্ষণ, ব্যভিচার, বিবাহ বিচ্ছেদ, লাগামহীন বহুবিবাহ সমাজে অহরহ ঘটছে। উদ্বেগ, উত্তেজনা, মানসিক বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে খুন-খারাবি, লুণ্ঠন ও পতিতাবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হতাশা, ব্যর্থতা ও নেশাগ্রস্থতায় মত্ত হয়ে যুবক যুবতী ও তরুণ-তরুণীরা এসিড নিক্ষেপ, হত্যা ও মাদকাসক্তের শিকার হয়ে ধীরে ধীরে সঞ্জীবনী শক্তি হারাচ্ছে। ব্যর্থতার গ্লাণী ও কষ্ট লাঘবের আশায় প্রতি নিয়ত গাজাঁর আসরে ভির জমাচ্ছে একদল উদীয়মান যুবক। এভাবে মনস্তাত্ত্বিক কারণে সমাজে যে সকল অনাচার সংঘঠিত হয় সেগুলো মনস্তাত্ত্বিক অনাচার হিসেবে পরিচিত।

(৪) সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে অনাচার

চলমান অনাচারগুলোর অধিকাংশই একটির সাথে অপরটির সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে ঘটে থাকে। ব্যক্তির সাথে, ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে কোন কোন অনাচার সম্পৃক্ত। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তির সাথে কিছু অনাচার সংশ্লিষ্ট। আবার কিছু অনাচার সংঘটিত হওয়ার কারণ হিসেবে জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই অনাচারের বিভিন্ন প্রকরণ থাকলেও সামগ্রিক বিচারে অনাচারকে নিম্ন বর্ণিত তিনটি ভাগে ভাগকরা যেতে পারে।

(ক) ব্যক্তিসংক্রান্ত অনাচারঃ

ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তি সমষ্টির বিরুদ্ধে সাধারণত এই ধরনের অনাচার সংঘটিত হয়ে থাকে। জনগণের জন্য এই অনাচার সব চেয়ে ক্ষতিকর। সাধারণতঃ অন্ধকারে এই ধরনের অনাচার সংঘটিত হয়। FBI এর রিপোর্ট মতে Persons এর বিরুদ্ধে যত অনাচার সংগটিত হয় তার ১০% murder, Robbery, Rape ইত্যাদি।

(খ) সম্পত্তি সংক্রান্ত অনাচার

সম্পদ ও সম্পত্তির সাথে এ ধরনের অনাচার সম্পৃক্ত ও অর্ন্তভূক্ত। আধুনিক সময়ে কম্পিউটারের বিকাশের ফলে এই ধরনের অনাচারের মাত্রা মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারনত ব্যাংকের হিসাব, ক্রেডিট কার্ড জনকল্যাণমূলক চেক, ফান্ট পেমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ধরনের অনাচার সংঘটিত হয়ে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) জনস্বার্থ বিরোধী অনাচার

এই ধরনের অনাচার ব্যক্তির বা সমষ্টির নৈতিকতা নিয়ে আবর্তিত হয়ে থাকে। যা প্রচলিত অপরাধ আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। উদাহরণ স্বরুপ: জুয়াখেলা, অশ্লীলতা, পতিতাবৃত্তি ও মাদকাসক্তি ইত্যাদি জনস্বার্থ বিরোধী অনাচারের আওতায় পরে।

সামাজিক গঠন ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সামাজিক অনাচারের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শাখাগুলো সু-স্পষ্ট রূপে উদ্ভাসিত[১৭]

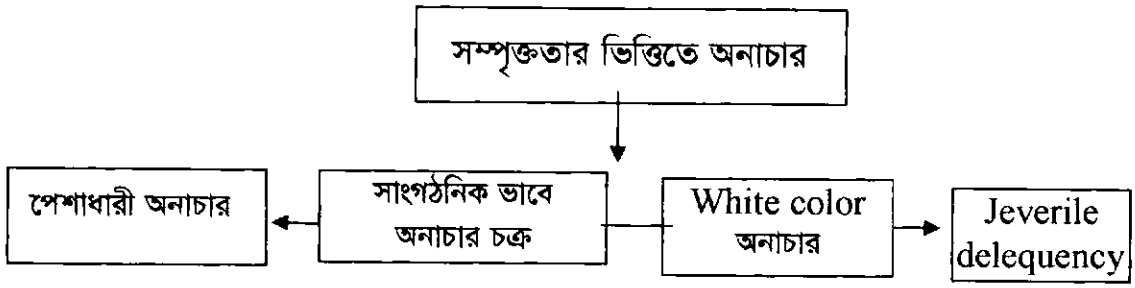

১। পেশাধারী অনাচারঃ-

মানুষ যখন কোন আনাচারকে তার জীবনের একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়, তখন তাকে পেশাধারী অনাচার বলা চলে। বাংলাদেশে রেজিস্ট্রার্ড পতিতাদেরকে এ ধরনের অনাচারের শ্রেণীতে আবদ্ধ করা যায়। এছাড়া সংঘবদ্ধ মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবী, পাচারকারী প্রভৃতি।

২। সাংগঠনিক ভাবে অনাচার চক্রঃ

প্রতিষ্ঠিত শক্তি বা সংগঠনের উদ্যোগও পরিচালনায় গ্রুপ বা গ্যাং ভিত্তিক যে অনাচার হয়ে থাকে তাদেরকে সাংগঠনিক ভাবে অনাচার চক্র বলা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরুপ Mafia, Mob, Lacoisa, Nastra, এবং বাংলাদেশে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর সন্ত্রাসী চক্র JMB উল্লেখযোগ্য। এরা অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা রাখে।

৩। White Color অনাচারঃ

এ ধরনের অনাচারের মধ্যে বিশ্বাসভংঙ্গ, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রচার, অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা, ট্রেডমার্ক জাল করা, জাল টাকা বের করা, কর্পোরেশনের বিবৃতিতে শিক্ষার আশ্রয় নেয়া প্রভৃতি বিষয় বুঝিয়ে থাকে। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল।

(ক) সাধারন আইন বা জন সাধারনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে এ সকল অনাচারকারীরা।
(খ) অনেক সময় জাতির পর্দার আবরণে গা ঢাকা দিয়ে এরা কলকাঠি নাড়ে।
(গ) এদের ভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সাধারণত আইনের আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকে।
(ঘ) দুস্কৃতি থেকে এড়ানোর জন্য নিজেদের পক্ষে প্রমাণপত্র সর্বদা তৈরী রাখে।
(ঙ) এ ধরনের অনাচারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা যে কোন পরিবেশে সহজভাবে জনসাধারণের সাথে মিশতে জানে।

১৭. S.M Miller and pamela Roby: Poverty Changing Social Stratification. New york, 1965, P.138.

Dhaka University Institutional Repository

(৪) Juvenile delequency

যে কিশোর বা তরুণরা বর্তমানে অনাচার এর সাথে কঠিনভাবে জড়িয়ে পড়েছে তাদেরকেই সাধারণত Juvenile delequency হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীগুলো শিশু ও যুবক শ্রেণীকে পিকেটার হিসাবে ব্যবহার করে তাদেরকে অপরাধ জনিত আচারণে বাধ্য করাচ্ছে। হরতাল, ভাংচুর, হত্যা এবং পরবর্তীতে রিলাক্স গ্রহণের সুযোগ আস্তে আস্তে এরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। প্রযুক্তির উন্নতির কারণে সমাজ ব্যবস্থা জটিল রূপ ধরণ করছে, ফলে অনাচার গুলো নতুন নতুন রূপে জটিলতায় পর্যবসতি হওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনাচার সমাজদেহে বাসা বেধেছে।

সময়ের পরিবর্তন ও বিবর্তনে অনাচার এর বিভিন্নতা

সৃষ্টির সূচনা লগ্নেই মানুষ সমাজ বদ্ধতার সহজাত প্রবণতায় ব্যাকুল ছিল। কিছু রীতি-নীতি, আইন-কানুন, অনুকরণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রয়োজনে মানুষ সমাজ বদ্ধ হয়ে জীবন যাপনে প্রয়াসী হন। সামাজিক বিধান ও বন্ধন যেমন অত্যন্ত প্রাচীন তেমনি এ প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ মানুষের আচার আচরণ সংস্কৃতি অভ্যাসও অত্যন্ত প্রাচীন। ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সামজিক আইন শৃংখলার ভিত্তিতে সমাজ সম্মত বা সমাজ স্বীকৃত আচরণ পূর্ব থেকেই বলবৎ ছিল। আবার সামাজিকভাবে অস্বীকৃত, দন্ডনীয় বা অপরাধ জনিত আচার আচরণেও মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই যুগে যুগে ভিন্ন রূপে চলমান ছিল। সময়ের বিবর্তন সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবর্তন, মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর মধ্যদিয়েই সামাজিক অনাচার এর বিভিন্নতা সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয়। কালের স্রোতে অনেক সামাজিক অনাচার হারিয়ে গেছে যে গুলো কোন কোন যুগে সমাজ স্বীকৃত ছিল আবার কোন যুগের স্বীকৃত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সামাজিক রাজনৈতিক পেশাধারী আন্দোলন শুরু হয়ে পরবর্তীতে সামাজিক অনাচার হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে সে সকল অনাচারকে আমরা বিবেক ও চিন্তার দ্বারপ্রান্তে স্থান দিতে পারছিনা এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেমনঃ

সতীদাহ প্রথা:

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের ক্যালকাটা ডিভিশনে স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় সহ মরণে গমন করতে হয়েছিলো হাজার হাজার স্ত্রীকে। সতীত্ব রক্ষা করা ছিল তৎকালীন সমাজে অলংঘনীয় বিধান আর এ বিধান পালন করতে যেয়ে সহমরণে বাধ্য করা হত অনেক হতভাগা বিবাহিতা নারীদেরকে। সতীদাহ প্রথা তখনকার সমাজে ছিল অত্যন্ত পূণ্যের বিষয়। সতীদাহ প্রথা ছিল তৎকালীন সমাজ স্বীকৃত আর এর বিরুদ্ধাচারণ করা ছিল কঠিন অনাচার।

"১৭৭২ সালে সতী প্রথার বিরুদ্ধে বিদেশী হস্তক্ষেপ ঘটেছিলো। ঐ বছরেই দক্ষিণ ভারতের ত্রীপল্লিতে ক্যাপ্টেন টমিন মৃত স্বামীর চিতারোহণে উদ্যত জনৈকা বিধবাকে উদ্ধার করে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান একেই তিনি বিদেশী হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলেন আর ঐ বিদেশী হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে এক ক্রুদ্ধ জনতা সতী প্রথার পক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছিলেন বলেও জানা যায়"[১৮]।

১৮. AM Shah, Bs Baviskar, EA Ramas Wamy, Social Structure and Change, P. 162.

Dhaka University Institutional Repository

সতীপ্রথা শাস্ত্রসম্মত নয় তা প্রমাণ করার জন্য ১৮২৮ সালে রাম মোহন একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। সামাজিক আচার আচরণ ও প্রথার প্রভাবে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় বহু নারীই তখন সতী হত। রাম মোহনকে সে সব বিষয় নিশ্চয়ই ব্যথাতুর করে তুলেছিল।

"১৮১৫ সালে ক্যালকাটা ডিভিশনের বর্ধমান বাটক বালাসোরে, হুগলী, যশোর, জঙ্গলা মহল, মেদেনীপুর, ২৪ পরগনা এবং কলকাতার আশে পাশে ২৫৩ জন নারীর সহমরণ ঘটেছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোথায় কত নারী সহমৃত হয়েছিল। তার তালিকা দিয়ে ছিলেন। S.D Collet"[১৯]

শাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করা, আর্থিক দৈন্যতা, লজ্জাস্কর ব্যভিচার প্রথা বৃদ্ধির আশংকায় তৎকালীন সমাজে সহমরণ প্রথা শক্তিশালী ছিলো। বহুবিবাহ বিস্তারের প্রতিফলন হল বাল্য বিবাহ ও বাল্য বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। কলিণের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই সে অর্থনৈতিক বোঝা, তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রণা তার জীবনকে আরও দূর্বিসহ করে তুললো। তখন সহমরনের সৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায়মুক্তির অপকৌশলে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পদের মধ্যে সহমরনের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোন শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যাবে না।"[২০]

১৮১৭ সালে তৎকালীন সরকার নিয়ম করেছিলেন, কোন নারী যদি মৃত স্বামীর সহমরনে ইচ্ছুক হয়, তবে জেলা ম্যজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন রাজ কর্মচারীর কাছ থেকে তাকে অনুমতি নিতে হবে এই নিয়ম সমাজের রক্ষণশীল মহলের কঠিন ও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। শিবনার্থ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন, "এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দু সমাজের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইলো।"[২১]

তৎকালীন সমাজে মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে গমনই ছিলো সমাজের স্বীকৃত আচরণ। আর সতী প্রথার বিরোধিতা করাটা ছিলো সামাজিক অনাচার হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্কে লেডী আর্মহার্ষ্টের ডায়েরীতে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কলেরায় এক যুবকের মৃত্যু হবার পর তার স্ত্রী সহমরণে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সহমরণে যাবার জন্য যা করণীয় বা আচরণীয় সবই সে পালন করেছিল, কিন্তু চিতায় যখন আগুন ধরানো হল তখন বিধবা নারীটি ভীত হয়ে নিকটের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সে পালিয়েছে বুঝতে পারার পর লেডী আমহার্ষ্টের উক্তি "The Mob become Furious and rain in to the Jungle to look for the Unfortunate young creature, dragged her down to the River, put her into a dingy, and shoud off to the middle of the stream when they forced her violently over board and she sank to rise no more"[২২].

---

১৯. Dilip Kumar Bissas, Parvat Chandra Ganguly; The Life and Letters of Raja Rammohun Roy: 1962 P.41.

২০. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম) ১ম সংখ্যা পৃ. ১০০।

২১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (নিউ এজ সং) শিলনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৬৫,

২২. তদেব; পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

"মূলত জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সিপাহী বিদ্রোহের সম্ভাবনা ও আশংকা মুক্ত হওয়ার পর সতীপ্রথা বিরোধী আইন পাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া নিজামত আদালত থেকেও সতীপ্রথা রদের সুপারিশ করা হয়েছিল। বেন্টিক ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রামমোহনের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত সতী বিরোধী আন্দোলনের মর্ম উপলব্ধি করে সতীপ্রথা রদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তারই ফলে ঐপ্রথা নিষেধ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে"[২৩]।

বিধবা বিবাহ

স্বামীর মৃত্যুর একই শ্মশানে সহমরনে গমনের বাধ্যবাধকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে কোন নারী বৈধব্যের অপরাধে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না এটাই ছিল আঠার শতকের পূর্বেকার সামাজিকভাবে স্বীকৃত সংস্কৃতি বা আচরণ। বিধবা মহিলাগণকে কেহ বিবাহ করবে না বা বিবাহ করতে পারবে না এটা হচ্ছে বর্তমান সভ্যতায় একটি বিরাট ও বিশেষ অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার বা সামাজিক অনাচার। সময়ের পরিবর্তনে সামাজিক আচার আচরণের বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িত।

বর্তমান সমাজে বিধবা নারীদের বিবাহ করা না করার ব্যপারে কোন সামাজিক বিধি নিষেধ বিবেচ্য নহে। তবে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশের আগে কোন যুবকের মধ্যেই বিধবা বিবাহ করার সাহস দেখা যায়নি।

বাংলাদেশে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনেও রামমোহনের অবদান কম নয়। বিধবা বিবাহ প্রথা তৎকালীন সময়ে প্রচলিত না থাকার কারণে আত্মীয় সভায় তা নিয়েও আলোচনা করা হত"[২৪]।

বিধবা রমণীর প্রতি রামমোহনের সহানুভূতি ও সমবেদনা পরবর্তীতে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রামকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছিল। "তার রচনায় বিধবা বিবাহ সম্পর্কে এমন বক্তব্য রয়েছে যার আলোকে মনে হয় বিধবা বিবাহ তিনি আন্তরিক ভাবেই সমর্থন করতেন"[২৫]।

"১৮৩৩-৩৪ সালে বিধবার পুনঃবিবাহের বিষয়ে একটি সভা করার কথা ভাবা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন দেশের কতিপয় ধনী লোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিষয়ে কিছুই করা হয়নি"[২৫]।

বিধবা বিবাহ বিষয়ে ঐ সভা করবার জন্যে যে ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগ নেবার কথাছিল তাদের মধ্যে মতিলাল শীল এবং হলধর মল্লিকের নাম সর্বাগ্রে। এদের উদ্দেশ্য সমর্থন করে জ্ঞানান্বেষণ ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে শেষ পর্যন্ত এরা ঐ বিষয়ে আর এগুতে সাহস পায়নি।

---

২৩. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, পৃ.৪৫।

২৪. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১০০।

২৫. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়ীক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ) ১৯৬৬, পৃ.১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আজকের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা রমনীদের বিবাহের বিপক্ষে যে কোন বক্তব্য সবার কাছে অবাক লাগবে। অথচ ১৮৫৫ সালের আগে বাংলাদেশের বাইরে থেকে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের আবেদন এসেছিল। সে আবেদনসমূহের আরজি বিবেচনা সাপেক্ষেই পরবর্তীতে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করা হয়।

বিধবা বিবাহের পক্ষে[২৬]

ক. ১৮৫৫ সালের ৭ই নভেম্বরে প্রেরিত অধিবাসীদের আবেদন পত্র।
খ. ১৮৫৬ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রেরিত ভিঞ্চুর অধিবাসীদের আবেদন পত্র।
গ. এর অল্পকাল পরে পাঠানো বোম্বের ধুলিয়া নিবাসীদের আবেদন পত্র।
ঘ. সেকেন্দ্রাবাদ থেকে প্রেরিত আবেদন পত্র।

বিধবা বিবাহের বিপক্ষে[২৭]

ক. দাক্ষিণাত্য থেকে পাঠানো হিন্দু ব্রাহ্মণ স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ।
খ. ১২৬২ বঙ্গাব্দে প্রেরিত ত্রিপুরাবাসীদের আবেদনপত্র।
গ. বোম্বের সাতারা অঞ্চলের আবেদন পত্র (১৮৫২.২৫শে মার্চ)।
ঘ. ১৮৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিলের প্রেরিত পুনাবাসীদের আবেদনপত্র।
ঙ. ঐ বছরের এপ্রিল মাসেই পাঠানো বোম্বেবাসীদের আবেদনপত্র।

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের সময়ে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে আরও অনেক আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ বিরোধী আবেদনপত্রের সংখ্যাই ছিল অনেক। বিহারীলাল সরকার তার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে জানিয়ে ছিলেন, ঐ বিবাহের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল ৪০টির বেশী, তাতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যাছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার। অপরদিকে পক্ষে পড়েছিল ২৫টি আবেদন পত্র তাতে স্বাক্ষর কারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ হাজার। কিন্তু সম্বাদ ভাস্বর পরিবেশিত এই তথ্য সত্য নয় বলেই মনে হয়।

"চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় জানিয়ে ছিলেন, মিঃ গ্র্যান্ট বিধবা বিবাহের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন। "বিরোধীগণের ত্রিশ সহস্র স্বাক্ষরের তূলনায় বিধবা বিবাহ পক্ষীয় লোকদের অল্প সংখক স্বাক্ষরেরও মূল্য অনেক অধিক। কারণ এরূপ সংস্কারের পক্ষে সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া, কিরূপ কঠিন কার্য তাহা ভাবিলে প্রত্যেকেই আমার কথায় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন"[২৮]। স্বাক্ষরকারীর সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে বিহারীলাল ও চণ্ডিচরন পরিবেশিত তথ্যে অমিল থাকলেও বোঝা যায় বিধবা বিবাহ বিরোধীরাই সংখ্যায় অধিক ছিলো।

---

২৬. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ,১২৯।
২৭. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ,১৩০।
২৮. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৬ সালের ৩১শে মে সিলেক্ট কমিটি বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেছিল। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন স্যার জেমস কলভিন, মিস্টার ইলিয়ট, মিষ্টার সি জেইট, এবং মিষ্টার গ্র্যান্ট। এদের দ্বারা গঠিত কমিটির রিপোর্ট পেশ হবার পর ১৮৫৬ সালের ১৯শে জুলাই আইনের খসড়াটি তৃতীয়বার পঠিত হয়। তারপর ২৬শে জুলাই সেটি লাভ করে আইনের মর্যাদা"[২৯]। বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পরই সমাপ্ত হয়ে যায়নি। ঐ আইন পাশের পর বিধবা বিবাহকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর সে কাজও করেছিলেন এবং সমাজে তার প্রতিক্রিয়াও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। সময় পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আজ বিধবা রমনীদের বিবাহের বিষয়টি সামাজিক অঙ্গনে সামান্যতম অনাচারের বিষয় নহে।

কৌলিন্য ও বহু বিবাহ প্রথা

স্বামী-স্ত্রী যে কেহ মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ অথবা একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও একাধিক বিবাহ বা বহুবিবাহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য সমাজ স্বীকৃত ছিল না। কৌলিন্যের নাম ভাঙ্গিয়ে বহুবিবাহ করার ফলে কুলীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্ষে তখন বিবাহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। ঐ সব বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে সে সময়য়ের মানুষ রীতিমত চিন্তিত হয়েই উঠেছিল এবং তার আশু-সমাধানের পথ সন্ধান করেছিল। আর এভাবেই ধীরে ধীরে সংগঠিত আন্দোলনের পথ প্রস্তুত হয়ে বহুবিবাহ প্রথা সর্বস্তরের মানুষের জন্য সামাজিক অধিকারে রূপ নেয়। বহুবিবাহ প্রথা পরবর্তীতে সামাজিক ক্ষেত্রে কোন অনাচার বা অপরাধমূলক কার্যক্রম হিসেবে স্থান পায়নি।

সরকারের কাছে সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র গিয়েছিল ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে। কিন্তু দেখা যায় তার বহু বছর আগেই "সমাচার দর্পনে" এক পত্র প্রেরক ঐ আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও দেশের মধ্যে ঐ মনোভাব স্বোচ্চার হয়ে উঠেছিল আরও বেশী। "সম্প্রতি আমরা কোন কোন পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ের প্রস্তাব কারিয়াছিলাম তাহাতে পণ্ডিত এবং ইতর লোক পর্যন্ত অধিবেদনের নিবারণ কল্পে অভিলাষ ও আহ্লাদ প্রকাশ করিলেক এবং তন্নিমিত্তে গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিতে প্রস্তুত হইলেক"[৩০]।

বহুবিবাহ শুধু অভিজাত কুলীন শ্রেণীর জন্যই নয় বরং সর্বস্তরের জনতার সামাজিক পরিবারিক ও নৈতিক অধিকার শিরোনামে তীব্র আন্দোলনের ভূমিকায় ছিলেন কিশোরীচাদ মিত্র। সামাজিক নানা বিষয়ের উন্নতি বিধানের জন্য ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তার উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এবং দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সামাজ উন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি। এই সমিতিরই পক্ষ থেকে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। পরে ১৮৫৫ খৃঃ থেকে ১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত বহু বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আবেদন পত্রই জমা পড়েছিল।

---

২৯. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ,১৪৮।

৩০. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ,১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৬ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল একটি আবেদেনপত্র মহারাজ সতীশ চন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তি স্বাক্ষরিত আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য আবেদনপত্র লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকে হাতে হাতে দেওয়া হয়েছিল একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে। ডেপুটেশনের তারিখ ছিল ১৯শে মার্চ ১৮৬৬ খৃস্টাব্দ তখন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন বীডন সাহেব। ডেপুটেশনে দ্বারা উপস্থিত ছিলেন তাদের প্রার্থনা পূরণের আশা দিয়ে তিনি বলেছিলেন- I shall gladly use my best endeavours to procure the enact ment of law to restrain the abuses attending the practice of polugamy among Hindus, and to impose upon a custom, which I cannot but regard as altogether demorolizing. The utmost degree of restriction of consistant with the reasonable opinions and wishes of the intelligent Hindu public"[৩১].

কৌলিন্য ও বহু বিবাহপ্রথা ঊনবিংশ শতকের আগে তৎকালীন সমাজের স্বীকৃত আচরণ বা সংস্কৃতি হিসেবেই পরিগণিত ছিল। সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় সমাজ সংস্কারক, সমাজ হিতৈষী, সুধী সচেতন মহল তৎকালীন রাজন্যবর্গ বহু আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এটাকে সামাজিক অনাচার হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যাসাগর তৎকালে প্রচলিত কৌলিন্য ও বহু বিবাহকে সামাজিক অসঙ্গতি বা অনাচার হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে বহু বিবাহ সংক্রান্ত একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ঐ পুস্তকটির সমালেচনা করা হয়েছিল 'সোমপ্রকাশে'। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছিলো। বিদ্যাসাগর ও বহুবিবাহকে শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপত্র করিবার নিমিত্ত বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইস্ট লাভ কি? বহুবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ এই শুনিলেই কি এদেশের লোকে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন"[৩২]

বহুবিবাহ বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থায় একটি সমাজ স্বীকৃত বিধান বা সংস্কৃতি। প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক রীতি-নীতি প্রথানুযায়ী সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। কোন বিশেষ মহল, প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী, বিত্তশালী বা ডিক্টেটর শ্রেণীই প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ দ্বারা হীন স্বার্থ চরিতার্থ করবে এমনটি সুযোগ বর্তমান বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের কোথাও স্বীকৃত নেই। অথচ উনিশ শতকের আগেই একমাত্র কুলীন শ্রেণীর জন্য একাধিক বিবাহ বৈধ আর সাধারণ শ্রেণীর জন্য বহুবিবাহ দুরের কথা স্বামী-স্ত্রী যে কারোর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল না। কৌলিন্য ও বহুবিবাহ তৎকালীন সমাজে কোন সামাজিক অনাচার বা অপরাধ এর বিষয় ছিল না। অথচ সময়ের পরিবর্তনে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বহুবিবাহ কোন সামাজিক অনাচার নহে।

নারী শিক্ষার প্রবর্তন

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নারীশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি ছিল সমাজে লাঞ্ছনা ও অসম্মানের বস্তু। কারণ স্ত্রীদের বিদ্যা শিখালে তাদের স্বামীভক্তি বা পতিভক্তি লোপ পাবে, গৃহকর্মে আন্তরিকতার ঘাটতি হবে, পর-পুরুষ দর্শনের ও সান্নিধ্যের পথ সুগম হয়ে পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পাবে।

---

৩১. Isvar Chandra Vidyasagar (1970) S.C Milra; P. 229.

৩২. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (৪র্থ) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৬, পৃ. ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

তাই স্ত্রীদের বিদ্যা শেখানোর বিষয়টি সামাজিক কুসংস্কার হিসেবেই পরিচিত ছিল"[৩৩]। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী প্রথমে বেঁচে ছিল চিতার আগুন থেকে, পরে রক্ষা পেয়েছিল সে অসহনীয় বৈধব্যের কবল থেকে। প্রগতিশীল সমাজ নেতারা তাকে কৌলীন্যের অভিশাপ থেকেও চেয়েছিলেন বাঁচাতে। শুধু তাই নয় সেই চেষ্টাই সফল হয়ে উঠেছিলো স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের কর্মসূচীতে। "স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রামমোহনের আত্মীয় সভাতে অন্যান্য বিষয়ের সংগে স্ত্রী শিক্ষা নিয়েও আলাপ আলোচনা হইতো। ব্যক্তিগতভাবে রামমোহন নারীর শিক্ষা গ্রহণ ও ক্ষমতায়নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন"[৩৪]।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের কার্যে স্কুল বুক সোসাইটির অবদান অনেক। এই সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ গ্রহণ করত। পরে "The famel juvenile society for the Establishment and support of Bangolee schools ও এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছিল। প্রসঙ্গক্রমে, নারী শিক্ষার জন্যে শ্রীরামপুর মিশনের ওয়ার্ড যা করেছিলেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। শ্রী রামপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলেই তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজ করেছিলেন"[৩৫]।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জে.সি. মার্শম্যান তার বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছিলেন।

"He and his solleagues had Alaways acted on the principle that a Native Christian mother must, at the least, be qualified to teach her children to read the Bible, and that female ignorance and Christianity could not exist together. But they were anxious to extend the blessing of knowledge also to heathen families, and, after Mr. Ward's return, he took the department of female education into his own hands, and established numerous schools in and arround Serampore, which were vigorously maintained after his death. In the course of the present year more than three hundred female children were assembled in the college hall, and passed a very satisfactory examination"[৩৬].

"১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 'বেথুন সোসাইটির' অধিবেশনে নারী শিক্ষা বিষয়ে নানা ধরনের আলোচনা করা হত। বহুবছর আগে সোসাইটির এক অধিবেশনে কৈলাস চন্দ্র বসু 'Hindoo famale education, how best achived under the present circumstances of Hindoo society' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এছাড়া সোসাইটির সভাপতি ফিয়ার পাঠ করেছিলেন, 'Women Teachers for Women' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধের ছিল যুগান্তকারী ঐতিহাহিক মূল্যায়ন যা পরবর্তীতে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে তাদেরকে আশার আলো দেখিয়েছিল"[৩৭]।

---

৩৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, বাঙলা মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন। (১৮৭৬-১৯৩৯) পৃ. ১২

৩৪. হরফ প্রকাশনী, রামমোহন রচনাবলী, (১৩৮০) পৃ. ২০২।

৩৫. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ,৮১।

৩৬. J.C Marshman; The life and times of carey, Marshman, and word (voll-II); 1859; p. 303.

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বেসরকারী প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার প্রচার ও উন্নতি লাভ করেছিল। মিশনারী ও বিদেশী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি এবং উদারপন্থী প্রগতিশীল বাঙ্গালীর প্রচেষ্টাতেই উনিশ শতকে দেশের অনেক মানুষ মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করে পরবর্তীতে নিজেরাই সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রত হতে থাকে। মাত্র (১০০-১৫০) বছরের ব্যবধানে সময়ের নিঃশব্দ দাবিতে নারী শিক্ষা আজ আর কোন সামাজিক অনাচার বা সমস্যা নয়। বরং কবি, সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের মানুষের চিন্তা-চেতনায় নারী জাতিকে দেশ, জাতি ও সমাজের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বাল্যবিবাহ প্রথা

বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো সামাজিক প্রথা। এই প্রথা বিগত শতকের সমাজ জীবনকে পর্যুদস্ত করেছিল। প্রগতিশীল সমাজ নেতারা এই কারণে বাল্য বিবাহেরও বিরোধিতা করেছিলেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে দেওয়ান কার্তিক চন্দ্র রায়ের বক্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। "বাল্য বিবাহের ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না; তদ্বিষয়ে কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না এবং সকল কেই বালক বালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম"[৩৮]। বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কার ও সামাজিক বিষয়ে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করে তাতে অনেকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন, ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রের ২ ও ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল।

- একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।
- অষ্টাদশ বছর পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না"[৩৯]।

এভাবে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারকগন তীব্র আন্দোলন-সংগ্রাম, সভা সেমিনার, প্রজ্ঞাপন, ক্রোড়পত্র ও প্রতিজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধের প্রচেষ্টায় স্বার্থক হয়েছেন। তৎকালে বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ছিল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গর্হিত আচরণ। আর বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হওয়া সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধজনিত আচরণ। সময়ের বিবর্তনে বিগত দিনের সামাজিক অনাচারগুলোই আজকের প্রগতিশীল সমাজে সামাজিক কালচার বা ন্যায়সঙ্গত আচরণ হিসেবেই বিবেচিত।

পণপ্রথা ও কন্যা বিক্রয়

উনবিংশ শতকের আর একটি সামাজিক ব্যাধির নাম ছিল কন্যাপণ। এই কন্যাপণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রথাও সামাজিক অধঃপতনকে অবাধ করে তুলেছিল সেটি হল কন্যা বিক্রয়। অর্থের বিনিময়ে কন্যা বিবাহ দেয়া হত। অর্থ লোভে অন্ধ পিতা বেশী অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিকেও কন্যা সম্প্রদান করতে কুণ্ঠিত হত না। তার ফলে ঐ কন্যার দাম্পত্য জীবন হতো নিতান্তই দুঃখের।

---

৩৮. দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত কার্তিকেয় চন্দ্র রায় (আই. এ. পি সং) ১৩৬৩ ; পৃ. ৩২।
৩৯. বিদ্যাসাগর (১৮৯৫) চন্ডী চরন বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

"তাই সে সময়ে নানা পত্রপত্রিকাতেও ঐ প্রথার বিরোধিতা করা হয়েছিল। সে যুগের প্রগতিশীল পত্রিকা 'হিত সাধক' এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কন্যা বিক্রয়ের বিরোধিতা করা হয়েছিল"[৪০]। বর্তমান সমাজে পণপ্রথা ও কন্যা বিক্রয়ের স্বরূপ ভিন্নধর্মী। পণ দেয়া হয় এখন পুরুষদেরকে বাস্তব সমাজে যা যৌতুক হিসেবে পরিচিত। উনিশ শতকের সামাজিক অনাচার উন্নত রূপ নিয়ে প্রগতিশীল সমাজে যৌতুক হিসেবে সামাজিক কালচারে পরিগনিত হয়েছে।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ঘুর্ণায়মান চাকায় সামাজিক রীতি, কৃষ্টি-কালচারও পরিবর্তনশীল। এরই ধারাবাহিকতায় সামাজিক আচার আচরণসহ অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডও বিভিন্ন রূপ নিয়ে সমাজ দেহে বিরাজ করে। সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহ, কৌলিন্য ও বহুবিবাহ, নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ, পণ প্রথা ও কন্যা বিক্রয় প্রথাসমুহ গতিশীল সমাজে কোন ধরনের অপরাধজনিত কাজ নয় বরং বর্তমান সমাজের স্বীকৃত আচরণ। তাই সময়ের পরিবর্তন ও বির্তনের সাথে সামাজিক অনাচারের বিভিন্নতা দিবালোকের ন্যায় সু-স্পষ্ট ও উদ্ভাসিত।

---

৪০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

"সামাজিক অনাচার ও ইসলাম"

গোটা জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত শান্তির ধর্ম 'ইসলাম' তার বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে সভ্যতা বর্জিত, কলহপ্রিয়, মূর্খ, অরাজক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নৈতিকতা বিবর্জিত, পৌত্তলিক আরব জাতিকে একটি সু-শৃংখল নীতিবান সু-সভ্য ও ধর্মাশ্রিত জাতিতে পরিণত করে গঠন করলেন একটি চিরসুন্দর চিরকল্যাণমুখী সমাজ ব্যবস্থা। বেদুঈন আরবের শিরে তুলে দিলেন শাহীতাজ, আর নিরক্ষর উটের রাখালদের বানালেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইসলামের সু-শীতল ছোঁয়ায় পৌত্তলিকতার সীমাহীন প্রসারতা, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ, অজ্ঞতা, বর্বরতা, সুদ, দাসত্ব প্রথা ইত্যাদি 'সামাজিক অনাচার' চিরতরে হল বন্ধ। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার সার্টিফিকেট প্রদান করে ১০ জিলহজ্ব ৬৩২ খৃঃ বিশাল আরাফাতের ময়দানে সীমাহীন জনসমুদ্রের সম্মুখে অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যমন্ডিত বিশ্ববরেণ্য নবীকুল শীরমনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি নাযিল হলো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষে থেকে আল-কুরআনের সর্বশেষ বাণী। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার মানদণ্ডেই গঠিত হয়েছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ অনাচারমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অনাচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি-

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন ধারার সাথে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা উপহার প্রদান ইসলামী জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সমাজে চলমান বিবিধ আচার-আচরণ, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্মউদ্দীপনা সকল কিছুতেই ইসলামের কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। যা আধুনিক নামধারী অনৈসলামী সমাজ চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা করেছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে। বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সমাজে চলমান সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, উপঢৌকন, মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অহেতুক বিবাহ বিচ্ছেদ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জুয়া-লটারী, হত্যা, লুণ্ঠনসহ আরো বহু 'সামাজিক অনাচার' সমূহ সমাজ কাঠামোর ভিত্তি দুর্বল করেছে। এ সকল সামাজিক অনাচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞান সম্মত ও সর্বজন স্বীকৃত।

* সুদ সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

অর্থ ছাড়া জীবন ধারণ আসলে সু-কঠিন। তাই বলে ইসলাম মানুষকে অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয় না। উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ-অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে সম্পদ উপার্জন করা এবং সমাজ তথা জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশি কঠোর। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সুদ। সুদের ক্ষতিকর প্রভাব আজ সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ তাদেরই স্বার্থে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করে চলছে।[১]

ইসলামী চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরাম, ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সুদ হারাম হবার কারণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও গভীর অধ্যায়ন করেছেন। তাঁরা সুদকে মানবতার জন্য একটি অভিশাপ রূপে চিহ্নিত করেছেন।[২]

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও সুদের ভয়াবহ বিপর্যয়কর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছেন।[৩] এসব অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের আলোচনায় সামাজিক উন্নয়নে সুদের মারাত্মক কুফল উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

* পবিত্র কুরআনে 'রিবা' বা সুদ শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার-

পবিত্র কুরআনে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, বেশি হওয়া, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।[৪]

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ সমাজ অর্থনীতি (ঢাকাঃ ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২ইং), পৃ.৮।

২। ড. ওমর চাপরা, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাবী, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, শামসুল আলম, আবু ইউসুফ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম প্রমুখ চিন্তাবিদ তাঁদের গবেষণা-কর্মে ব্যাপক পর্যালোচনায় পর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদকে একটি অভিশাপ রূপে দেখিয়েছেন।

৩। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে এরিস্টোটল, ক্যাটোস, কায়সিরো, সেনেকা, পোটাস, রোম বাওয়ার্ক, কীনস প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য।

৪। সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ইং), খন্ড ২, পৃ. ৩৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে 'রিবা' শব্দটি উচ্চতা ও বিকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-[৫]

"যখন আমি তার ওপর বর্ষণ করলাম তখন তা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠলো এবং শস্য ও ফল দান করতে লাগলো।"

'আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদাকাতকে বৃদ্ধি করেন।'

'যে ফেনপুঞ্জ উপরে উঠে এসেছিল, বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।'

'যাতে এক জাতি থেকে অগ্রসর হয়ে যায়।'

'আমি মরিয়ম ও ঈসাকে একটি উচ্চস্থানে আশ্রয় দান করলাম।'

'যে সুদ তোমরা দিয়েছো এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর নিকট তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি হয় না।'

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আসল অর্থের উপর যা কিছু বাড়তি পাওয়া যাবে তাকেই 'রিবা' বলা যাবে। কিন্তু ইসলামে সকল বৃদ্ধিকেই 'রিবা' বলা হয়নি। ব্যবসায়েও মূলধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ বৃদ্ধি 'রিবার' অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা হারাম নয়, বরং সম্পূর্ণ হালাল।

"ইসলামে ঐ বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলা হয়েছে, যা প্রদত্ত ঋণের ওপর পূর্ব নির্ধারিত হারে আদায় করা হয়। জাহিলী যুগে আরব দেশে অর্থ ধার দেয়া হলে ঋণ দাতা আসলের ওপর পূর্ব-নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। অনেকে দ্রব্য-সামগ্রী ও শস্য ধার দিত এবং শর্ত অনুসারে অতিরিক্ত পণ্য ও শস্য ফেরত নিত। তদানীন্তন আরবে আসলের ওপর অতিরিক্ত অর্থ এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হতো 'রিবা'। আল কুরআনে 'রিবা' শব্দকে সাধারণভাবে প্রচলিত এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।"[৬]

বস্তুতঃ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং সামগ্রিক ক্ষেত্রে একই জাতীয় সামগ্রী কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় 'রিবা' বা সুদ।[৭]

৫। আল-কুরআন, সূরা হাজ্জ আয়াত নং ৫।
আল-কুরআন, সূরা বাকারা আয়াত নং ২৭৬।
আল-কুরআন, সূরা রা'আদ আয়াত নং ১৭।
আল-কুরআন, সূরা নাহল আয়াত নং ৯২।
আল-কুরআন, সূরা মু'মিনুন আয়াত নং ৫০।
আল-কুরআন, সূরা রূম আয়াত নং ৩৯।

৬। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত,পৃ. ।

৭। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত,পৃ. ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

* সুদের শ্রেণী বিভাগ-

সুদ সংক্রান্ত আল-কুরআন ও আল-হাদীসে যে সকল বাণী রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে সুদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।[৮] যথা-

১। মেয়াদী সুদ/মহাজনী সুদ (রিবা আন-নাসিয়া)

আরবী নাসিয়া শব্দের মূল হলো 'নাসায়া'। এর আভিধানিক অর্থ বিলম্বিত বা প্রতিক্ষা। পারিভাষিক অর্থে যখন ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণের ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থসহ (যার বিনিময় নাই) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেয় তখন ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা আন-নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ।[৯] যেমন কোন ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ শর্তে ১,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করল যে, ছ'মাস কিংবা এক বছর পর ১০% হারে মোট ১১০০.০০ (১০০০ + ১০০) টাকা ফেরত দিতে হবে। এখানে অতিরিক্ত একশত টাকা হলো রিবা আন নাসিয়া।[১০]

২। বাণিজ্যিক বা নগদ বিনিময়ী সুদ (রিবা আল-ফাদাল)

আরবী ফাদাল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। অর্থাৎ শর্ত করে সমজাতীয় নগদ পণ্য পারস্পারিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি গ্রহণ করাকে 'রিবা আল-ফাদাল' বলে।

আল্লামা আব্দুর রহমান আল জাযীরী বলেন–[১১] স্বত্ত্বাধিকার লাভে কোনরূপ বিলম্ব না করে একই জাতীয় পণ্যের পারস্পারিক বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাই রিবা আল-ফাদাল"। যেমন পাঁচ কেজি উন্নতমানের গমের বিনিময়ে সাত কেজি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের গম গ্রহণ করা।"[১২] সুদ হলো মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণের প্রধানতম হাতিয়ার। ইসলামে সকল প্রকার সুদ হারাম বা অবৈধ।

* সুদ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী-

মানুষ নির্যাতনের এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী যত প্রকার কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে সুদ তাদের অন্যতম। তাই সুদকে পরিহার করার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের ৭টি আয়াতের মাধ্যমে সুদের পরিণতি, কুফল এবং স্বেচ্ছায় যারা সুদ পরিহারে অনিচ্ছুক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেন।

৮। ড. আহমাদ শালাবী রিবাকে তিনভাগে বিভক্ত করেন যথা– ক. রিবা আল-ফাদাল সমজাতীয় (ভোজ্য কিংবা ব্যবহার্য) দ্রব্য পারস্পরিক বিনিময় করে অতিরিক্ত গ্রহন করা। খ. রিবা আল কারদ, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের বিনিময়ে পুঁজির অতিরিক্ত গ্রহন করা। গ. রিবা-আন নাসিয়া ঋণগ্রহীতা মেয়াদান্তে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে নতুন শর্তে মেয়াদ বৃদ্ধি করে শর্তানুযায়ী মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা। আবার ইবনুল ক্বায়ুম রিবা-আল ফাদালকে রিবা আল-খাফী এবং রিবা আন-নাছিয়াকে রিবা আল-জালী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৯। এ ধরণের সুদ ঋণের উপর ধার্য হয়ে থাকে। আর ঋণের সম্পর্ক থাকে কোন সময় বা মেয়াদের সাথে তাই একে মেয়াদী সুদ এবং মহাজনী সুদও বলা হয়।

১০। আদিকালের/ইসলাম-পূর্বকালের ঋণদান পদ্ধতিগুলি ছিল–ক. অভাবীদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থে ঋণ দেয়া হত এবং প্রতি টাকার জন্যে কিছু সুদ ধার্য করা হত। খ. আরেক ধরণের ঋণ ছিল যে, ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ ও আসল মূলধনে পরিণত হত এবং পরবর্তী মেয়াদে সুদাসলের ওপর সুদ প্রদান করতে হতো। যাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। গ. বিভিন্ন মূলধন ধাতু নির্মিত অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি মহাজনের নিকট বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহন করা হতো। ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঋণের টাকার ওপর সুদ ধার্য হতো।

১১। প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ২৪৭।

১২। যদি বিনিময়ী দ্রব্য একই জাতীয় না হয় তবে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ রিবা হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পূর্ব কাল থেকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক সম্পদ বৃদ্ধি লাভের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যে ভুল প্রথা (যুদ্ধ প্রথা) জন্মে ছিল, তা পরিবর্তন করে সম্পদ বৃদ্ধি লাভের প্রকৃত পক্ষে তাদের কি ধারণা থাকা উচিত তারই শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ বলেন– "মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট সৃষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে (যাকাত)। অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"[১৩]

এ বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্ সুদী কারবারে মগ্ন সমাজে একটা নতুন চিন্তার তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যাতে শোষণমূলক অর্থনীতির মোহ ত্যাগ করে মানুষ সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার দৃষ্টিতে গোটা ব্যাপারটি চিন্তা ও বিবেচনা করতে পারে।

সুদের মাধ্যমে আয় করা হারাম, এ বিধান জারির মাধ্যমে প্রশ্ন হতে পারে, সুদী আয় এবং বাণিজ্যিক আয়ের মধ্যে তফাৎ কি? (যা তৎকালে কাফিররা করেছিল)"[১৪] উভয় আয়ের পার্থক্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন– "আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে বৈধ করেছেন। আর সুদকে হারাম করেছেন।"[১৫]

যাকাত প্রদানে অর্থ কমে যায় আর সুদ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি পায় কথাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্য হলেও বাস্তবে তা বিপরীত। (অর্থাৎ সুদে অর্থ হ্রাস পায় এবং যাকাতে অর্থ বৃদ্ধি পায়) সুতরাং এরূপ ধারণা পরিহার করার জন্যে আল্লাহ বলেন– "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না।"[১৬]

সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণদাতা নিশ্চিন্তে নির্ধারিত হারে অর্থাহরণ করে। এটা শুধু ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়। যা সম্পূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী। এ জন্যই আল্লাহ মুমিনদেরকে এ পদ্ধতিসহ পূর্বেকার সকল সুদ পরিহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[১৭]

ইসলামপূর্ব সমাজে সুদ পদ্ধতির একটি প্রথা ছিল যে, ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ ও আসলকে পুনরায় পুঁজি নির্ধারণ করে দ্বিতীয় মেয়াদে (নতুন শর্তে) পরিশোধের অবকাশ থাকত, এমনিভাবে যতক্ষণ না ঋণ গ্রহীতা সুদাসল সম্পূর্ণ পরিশোধ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চক্রাকারে তার ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ্ এরূপ প্রথাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন– "হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।"[১৮]

১৩। আল-কুরআন, সুরা আর-রুম, আয়াত নং ৩৯।

১৪। আল-কুরআন, সুরা বাকরা, আয়াত নং ২৭৫।

১৫। আল-কুরআন, সুরা বাকরা, আয়াত নং ২৭৫।

১৬। আল-কুরআন, সুরা বাকরা, আয়াত নং ২৭৬।

১৭। আল-কুরআন, সুরা বাকরা, আয়াত নং ২৭৮।
আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেন যে, একই পাত্রে ঈমান ও সুদের অবস্থান হতে পারে না। মু'মিন হতে হলে সুদ পরিহার করতে হবে।

১৮। আল-কুরআন সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সুদ ত্যাগ করে সাধারণ মানুষকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি দানের আহবান করার পরও যারা এরূপ নাশকতামূলক কাজ পরিহার করতে নারাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেন– "অতঃপর যদি তোমরা (সুদ পরিত্যাগ) না কর তবে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"[১৯] আল্লাহ তাঁর বিধি-বিধান মান্য করার জন্যে মানব জাতিকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ প্রদানসহ নানা রকম ভয়-ভীতিও প্রদান করেছেন। কিন্তু সুদ পরিহার করার জন্যে যতটা কঠোরতা (যুদ্ধ ঘোষণা) দেখিয়েছেন অন্যান্য ব্যাপারে ততটা পরিলক্ষিত হয় না।

অতঃপর সুদের কুফল ও পরিণতির ভয়ে যারা স্বেচ্ছায় ফিরে আসার সংকল্প করে, তাদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ বলেন– "কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করোনা এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।"[২০] মক্কা বিজয়ের ফলে যখন গোটা আরব মুসলমানদের অনুকূলে চলে যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করার অনুকূলে চলে আসে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করে ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণতা প্রদান করেন।

* সুদ সম্পর্কে হাদীসের ভূমিকা

মেয়াদী সুদের (রিবা আন-নাসিয়া) অবৈধতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আর নগদ বিনিময়ী বা মহাজনী সুদের (রিবা আল-ফাদাল) অবৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী (সাঃ) ইসলাম পূর্ব সমাজের মহাসংক্রামক এ ব্যাধির অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে সুদের বিপক্ষে বিভিন্ন বাণী প্রদান করেন। যার সংখ্যা চল্লিশোর্ধ। এখানে কয়েকটির উদ্ধৃতি দেয়া হল–

মহানবী (সঃ) প্রথমত সাধারণভাবে রিবা আল-ফাদাল এর সংজ্ঞা এবং এর অবৈধতা বর্ণনা করে বলেন– "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবন (বিনিয়ম করা হলে সে ক্ষেত্রে) পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দিবে কিংবা গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। এতে সুদ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।"[২১] ধারণা করা স্বাভাবিক যে, যিনি সুদ গ্রহণ করবেন তিনিই শুধুমাত্র সুদ অনাচারে জড়িত। সুদ দাতা কিংবা এতদসংক্রান্ত সহযোগীরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মুহানবী (সাঃ) সুদদাতা গ্রহীতা এবং এতদসংক্রান্ত সকলকে অভিসম্পাত করেন। এ মর্মে হযরত জাবির ইবন আব্দিল্লাহ মহানবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন– "আল্লাহ্র রাসুল (সঃ) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা সুদের লেখক এবং সুদের লেন-দেনে সাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন– তারা সকলেই সমান অধিকারী।" [২২]

সুদ গ্রহণ করা হারাম কিন্তু তা কোন পর্যায়ের? পৃথিবীর যত প্রকার হারাম কাজ আছে তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য হারাম হলো আপন মাকে বিবাহ করা এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যা বে-নজির। আর সুদ খাওয়া তারই সাদৃশ্য। মহানবী (সাঃ) এর ভাষায় সুদের মধ্যে তিহাত্তরটি (৭৩) গুনাহ রয়েছে । তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় (পাপ)"[২৩]

১৯। আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত নং ২৭৯।

২০। আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত নং ২৭৯।

২১। সহীহু লি মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ২৯৬৯।

২২। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নং ১১২৭।

২৩। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং-২২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করে বলেনঃ মহানবী (সাঃ) বলেছেন– "সুদে সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য" (পাপ)"[২৪]।

প্রত্যেক পাপীকে তার কৃত পাপের জন্যে মৃত্যুর পর শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহানবী (সাঃ) সুদখোরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করে বলেন– "মিরাজের রাত্রে সপ্তাকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সাপে ভরপুর, যা বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রাইল (আঃ)! তারা কারা ? তিনি বললেন, তারা সুদ খোর।"[২৫]

*** দুর্নীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি–**

স্মরণাতীত কাল থেকেই সমাজে দুর্নীতি ছিল। আর এ প্রসংঙ্গে উপেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেছেন– "আমরা পছন্দ করি বা না করি দুর্নীতি ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে কালের পরিক্রমায় দুর্নীতির ধরণ প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে"[২৬]। সময়ের পরিবর্তনে দুর্নীতির প্রতিরোধ ও দমনের পদক্ষেপে ইসলামও সময় উপযোগী কৌশল অবলম্বনে সমাজ থেকে দুর্নীতি মুলোৎপাটনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া মানুষকে যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে প্রদর্শন করেছে। "মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি হিসেবে অনেক মহৎ গুনের অধিকারী।"[২৭]

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্মগত অধিকার শুধু নয়, বরং মূলত তার বিবেক-বুদ্ধি, ভাল-মন্দ পৃথকীকরণের যোগ্যতা, ন্যায়পরায়নতা, মানবতা, পরোপকার প্রভৃতি মানসিক গুণের কারণে। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন "আমরা অবশ্য অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদর্শ বংশকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল পথে এবং জল পথে, আর তাদের রিয্ক দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুরই উপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি"[২৮] কিন্তু মানুষ তা সত্ত্বেও নিজের অন্তর্নিহিত কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় নানা রকম অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে তার শুধু মানবিক মর্যাদাই ভূলুণ্ঠিত হয় না, সামাজিক জীবনের অস্তিত্বও কঠিনভাবে বিপন্ন হয়ে পরে।

*** দুর্নীতি সংক্রান্ত মহানবী (দঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ:**

ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া একমাত্র কল্যাণময় জীবন-বিধান হিসেবে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণের মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ দুর্নীতি সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতা, সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই বন্ধ করে দেয়।

২৪। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং ২২৬৫।

২৫। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৮২৮৬।

২৬। Upendranath Tagor, Corruption in Ancient India, মোঃ আতিকুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকা: আল কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০) পৃঃ ৩৩৫

২৭। আল-কুরআন, সূরা বনী ইসলাইল ১৭ : ৭০।

২৮। আল-কুরআন, সূরা বনী ইসলাইল ১৭ : ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

এ উদ্দেশ্যে সে লোকদের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এরপরে কেউ দুর্নীতি করলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। নিম্নে দুর্নীতি প্রতিরোধে মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. হালাল-হারামের দিক-নির্দেশনা

আল্লাহ্ তা'য়ালা যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষদেরকে হেদায়েতের জন্য তাদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।[২৯] নবী ও রাসূলগণের আগমনের এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)[৩০]। এই ধরাধামে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে আল্লাহর পথ দেখানো, হালাল-হারামের শিক্ষা প্রদান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা। দুর্নীতি অনেকগুলো বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। যেমন- ঘুষ, খেয়ানত, কাল-বাজারী, বে-ইনসাফী ইত্যাদি। মহানবী (সঃ) মানব জাতির সম্মুখে এ সকল বিষয় থেকে দুরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩১] দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে হারাম ঘোষণা করা দুর্নীতি দমনে মহনবী (সঃ) এর প্রথম পদক্ষেপ।

২. হারামের অপকারিতা এবং হালালের উপকারিতা ঘোষণা:-

ইসলাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, কর্ম, উপার্জন তথা সকল বিষয়ে শুধু হালাল ও হারামের পথই নির্দেশ করেনি বরং বৈজ্ঞানিক পন্থায় যুক্তির মাধ্যমে হারামের অপকারিতা এবং হালাল বস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষ যে সম্পদ উপার্জন করে তার অপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'হে মানব মন্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য হতে ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩২]

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেছেন, "বান্দা হারাম মাল উপকরণ করে যা দান-সাদ্কা করে, তা কবুল করা হবে না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র।"[৩৩]

মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো-খুস্কো, পদ যুগল ধুলা-মলিন। সে তার দু'টি হাত উপরের দিকে তুলে বারবার দু'আ করে-আল্লাহ্! আল্লাহ্! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম, হারাম খাদ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে। এহেন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহর কাছে কি করে কবুল হতে পারে ?"[৩৪]

এরপর মহানবী (সঃ) হালাল সম্পদের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে-উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে।"[৩৫] এভাবে রাসুল (সঃ) দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদের অপকারিতা এবং স্বীয় কষ্টে উপার্জিত হালাল সম্পদের উপকারিতার বর্ণনা করে সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দুরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

২৯। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা আয়াত নং ৪, আল কুরআন, সূরা আ'রাফ আয়াত নং ৪৩।
৩০। আল-কুরআন, সূরা আল আহযাব আয়াত নং ৪০।
৩১। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৫০।
৩২। আল-কুরআন, সূরা বাকারা আয়াত নং ১৬৮।
৩৩। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং- ৩৪৯০।
৩৪। সহীহ লি মুসলিম, কিতাবুয যাকাত হাদীস নং-১৬৮৬।
৩৫। সুহীহুল বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং- ১৯৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বান্দার হক আদায়ের প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান:-

হক (অধিকার) দুই প্রকার। এক আল্লাহর হক, দুই বান্দার হক। দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত পাপ করা হয় তা অধিকাংশ বান্দার হকের সহিত সংশ্লিষ্ট।

যেমন- কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি প্রদান, প্রমোশন প্রদান, অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান, স্বজনপ্রীতি, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ -এর সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। বান্দার সহিত সংশ্লিষ্ট হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পন কর।[৩৬]

এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেন,[৩৭] "যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না" "তোমরা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।" "নিশ্চয়ই তোমরা দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হকসমূহ কোন বান্দা যদি আদায় না করে (যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি) আর এরপর যদি সে আল্লাহর কাছে বিনয়ীভাবে তাওবা করে তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু (দুর্নীতির মাধ্যমে) বান্দার যে হক নষ্ট করা হয়, তা যদি সেই মজলুম বান্দা মাফ না করে তবে সেই (দুর্নীতিবাজ) হক নষ্টকারী মাফ করা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে।

৪। ধন লিপ্সা থেকে দুরে থাকা:

দুনিয়ার লোভ, ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহই দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে পৃথিবীকে বসবাসের স্থায়ী জায়গা মনে করে দুর্নীতির মাধ্যমে অগাধ সম্পদ উপার্জন করে ভোগ বিলাসের সাগরে গা ভাসিয়ে দেয়। অথচ ইসলাম এই ধনলিপ্সাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার মৃত্যুর কথা, আখেরাতের কথা। যেমন- আল-কুরআনে বলা হয়েছে,[৩৮] "প্রত্যেকটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" বল পার্থিব ভোগ সামান্য আর যে সাবধানী, তার জন্য পরকালই উত্তম।" নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদী তোমাদের জন্য ফেৎনা। আর আল্লাহ্ পাকের নিকটে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।" এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেছেন, "তুমি পৃথিবীতে এমন অবস্থায় থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।"[৩৯] তিনি আরো বলেন, "পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর তাহলে লোক তোমাকে ভালবাসবে।"[৪০]

৩৬। আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা ৪ : ৫৮।
৩৭। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং ১১৮৫।
* সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৮৩২।
* সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-৪৭৮৯।
৩৮। আল-কুরআন সুরা আল-ইমরান ৩:১৮০।
* আল-কুআন, সুরা আল-আন-নিসা ৪ : ৭৭।
* আল-কুরআন, সুরা তাগাবুন ৬৪ : ১৫।
৩৯। সহীহুল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং- ৫৯৩৭।
৪০। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ হাদীস নং- ৪০৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. দারিদ্র্যের মর্যাদা ঘোষণা

মানুষ সাধারণত দরিদ্র অবস্থা থেকে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু মহানবী (সঃ) এই বড়লোককে ঘৃণা করেছেন এবং ঐ দরিদ্র ব্যক্তির মর্যাদা ঘোষণা করেছেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে। দরিদ্রের জীবন দান কর। দরিদ্রের মতোই মৃত্যুবরণ করতে দাও"[৪১]।

এবং কিয়ামতে দরিদ্রের সাথেই পুনরুজ্জীবিত করো।" হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেন এরকম কথা বললেন? উত্তরে তিনি বলেন, "কারণ তারা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

এছাড়া রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যখন কেউ তার চেয়ে সম্পদ ও আকৃতিতে বড় কারো দিকে তাকায় তখন উচিত যে তার চেয়ে ছোট তার দিকে তাকান।"[৪২] রাসূল (সাঃ) আরও বলেন "যে ব্যক্তি কোন জালিমের সঙ্গে তার সাহায্য ও সহযোগিতা এবং তাকে শক্তিশালী করার জন্যে চলল- এ অবস্থায় যে, সে জানে সেই ব্যক্তি জালিম, তবে সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল"[৪৩] এভাবে রাসূল (সাঃ) দরিদ্রের মর্যাদা ঘোষণা করে মানুষকে দুর্নীতির মাধ্যমে বড়লোক হওয়ার প্রতি ভর্ৎসনা করেছেন।

৬. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দান:-

দুর্নীতির অন্যমত প্রধান কারণ হলো– দেশের প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত যাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের সততা, নৈতিকতা, খোদাভীতি, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, ন্যায়পরায়নতা, সত্যের পথে দৃঢ়তা, দেশাত্ববোধ, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থলোভ বিমুখতা, সৎ চরিত্রতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না বা গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। শুধুমাত্র কিছু সার্টিফিকেট পুঁথিগত বিদ্যা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিরা নিয়োগ লাভ করছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশ বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, অনিয়ম আর অযোগ্যতার পীড়ায় কঠিনভাবে পীড়িত।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে লোক নিয়োগের ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করেছে যার মাধ্যমে তার সততা ও যোগ্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত আরোপ করা হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো– ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে লোকের দিল আল্লাহর স্মরণ শূন্য- আল্লাহর আনুগত্যমুলক ভাবধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন নিয়ন্ত্রনহীন, কামনা-বাসনার অনুসারী, আর এ কারণে যার কাজ-কর্ম বাড়াবাড়ি পূর্ণ তুমি তার অনুসরণ কখনই করেবে না।[৪৪] এ ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হবে সু-বিচারক নেতা ও শাসক এবং সেদিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে অধিক দূরবর্তী হবে অন্যায়কারী অত্যাচারী নেতা বা শাসক।"[৪৫]

৪১। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, হাদীস, নং ৪১১৪।
৪২। সহীহুল বুখারী, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং- ৫৯৪৭।
৪৩। বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান।
৪৪। আল-কুরআন, সূরা আল-কাহফ ১৮: ২৮।
৪৫। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং- ১২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে ইসলামে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্তির ব্যাপারে তিনটি জরুরী গুণের শর্ত আরোপ করেছে। যেমন– (১) দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা (২) বিশ্বস্ততা ও নির্ভর যোগ্যতা (৩) সততা, সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়া-বিমুখতা। তাই এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কোন কাজের প্রধানত্ব কেবল মাত্র সেই ব্যক্তির জন্য শোভনীয় যে তার যোগ্যতা রাখে।"[৪৬] তিনি আরও বলেছেন, "যে লোক না জেনেশুনে কাজ করে সে সে-কাজটিকেই অনেক বেশি বিনষ্ট করে দিবে তার তুলনায় যে সে-কাজের যোগ্যতা রাখে।"[৪৭]

রাসূলের এই হাদিস গুলোর উপর ভিত্তি করেই আরবীতে নিম্নলিখিত বচনটির স্বীকৃতি লাভ করেছে, "যোগ্য স্থানে যোগ্য লোক নিয়োগই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আর যোগ্য স্থানে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়"।[৪৮] এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমার জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই ব্যক্তি যে দক্ষ শক্তিমান, বিশ্বস্ত"।[৪৯]

৭. সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করা হারাম:-

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যখন ক্ষমতায় আসীন হন তখন তারা অনেক সময় সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেন। ইসলাম এই অর্থ আত্মসাৎকে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন। "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[৫০] এ প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিনা অধিকারে অন্যের জমির কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তাকে সপ্ত জমির নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।"[৫১] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথের আশ্রয় গ্রহন করবে, সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।"[৫২]

উল্লেখ্য যে, এই আত্মসাৎ চুরির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ যদি সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার হাত কাটা হবে। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "পুরুষ অথবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত ছেদন কর। তা তাদের কৃত কর্মের ফল এবং নির্ধারিত আদর্শ দন্ড।"[৫৩]

৮. দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি কঠিন দুর্নীতি:-

দলাদলী ও স্বজনপ্রীতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আরেকটি চারিত্রিক মাধুর্য্য। সততা, মেধা ও যোগ্যতা নয়, বরং দলের কর্মী হওয়া, নেতার আত্মীয় হওয়াই চাকরি, টেন্ডার বা অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার জন্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম এই দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি হারাম ঘোষণা করেছে। চাকরি ও টেন্ডার বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুবিধা প্রশাসনিক ব্যক্তিদের আমানত।

৪৬। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কোরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশণী, ২০০০ইং)পৃ. ২০৩।
৪৭। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।
৪৮। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।
৪৯। আল-কুরআন সূরাতুল কাসাস,আয়াত নং- ২৬।
৫০। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা আয়াত নং- ৯০।
৫১। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাজালিম ওয়াল গসব, হাদীস নং- ২২৭৪।
৫২। সহীহুল বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাহ, হাদীস নং- ২৪৭৭।
৫৩। আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত নং- ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এই আমানত তার যোগ্য প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পন কর।"[৫৪] রাসূল (সঃ) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।[৫৫]

৯. সরকারী অর্থ অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ

সরকারী দলের মন্ত্রী, এমপি, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ও সরকারী অর্থের সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ বিভিন্ন ভাবে সরকারী অর্থের অপচয়-অপব্যয় করে থাকেন। কিন্তু ইসলাম এই ধরনের অপচয় বা অপব্যয়কে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ"।[৫৬]

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বস্তু অপছন্দ করেন। ১. অনর্থক এবং বাজে কথা বলা ২. নিষ্প্রয়োজনে মাল নষ্ট করা। ৩. অত্যধিক প্রশ্ন করা"।[৫৭]

১০. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও জুলুম করা হারাম

অনেক সময় ডাক্তাররা আসামী বা বাদীর মেডিকেল রিপোর্ট লিখতে মিথ্যার আশ্রয় নেন, পুলিশ অফিসাররা কেসের চার্জসীট লিখতে মিথ্যার আশ্রয় নেন, বিচারকরা রায় ঘোষণার সময় সত্য উপস্থাপিত হওয়ার পরও অনেক দুর্নীতির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেন, এভাবে অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মূলত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয় যা ইসলাম কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "মহাপাপ সমূহের মধ্যে অতি জঘন্যতম হলো আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করা, পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"[৫৮] রাসূল (সঃ) আরও বলেছেন, "মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ্র সাথে শরীক করার সমতুল্য"[৫৯] (এই কথাটি তিনি তিনবার বলেন)।

এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, জনগণের থেকে অবৈধ অর্থ বা সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে, নিজের কর্তব্য পালন না করার বা কর্মে ফাঁকি দেওয়ার মাধ্যমে, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত পারিবারিক, বা আঞ্চলিক বিদ্বেষের কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে কারো উপর জুলুম করা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা জালিমকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, শেষ পর্যন্ত যখন তাকে ধরবেন তখন তাকে আর অবকাশ দেওয়া হবে না"।[৬০] তিনি আরো বলেন, "অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়াকে ভয় কর, কেননা ঐ দোয়া এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।"[৬১]

৫৪। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত নং- ৫৮।
৫৫। সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নং ৪৭৮৯।
৫৬। আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং- ২৬-২৭।
৫৭। সহীহুল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৮৩।
৫৮। সহীহুল বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাহ, হাদীস নং-২৪৫৯।
৫৯। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আকদিয়াত, হাদীস নং- ৩১২৪।
৬০। সহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাফসিরিল কুরআন, হাদীস নং ৪৩১৮।
৬১। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস নং ৪০০০।

Dhaka University Institutional Repository

১১. কর্মে ফাঁকি দেয়া

ইসলামী নীতি অনুযায়ী শ্রমিক তার সাথে চুক্তিকৃত কাজে কোন প্রকার ফাঁকি না দিয়ে পূর্ণ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। পূর্ণ মজুরী নিয়ে কম কাজ করলে এই মজুরী হারাম হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "তাদেরকে বেদনায়ক শাস্তি দেওয়া হবে যারা মাপে কম-বেশি করে। নিজের হক নেওয়ার সময় পুরোপুরিভাবে আদায় করে নেয় কিন্তু অন্যকে মেপে দিতে গেলেই কম দেয়।[৬২]

এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৬৩]

পণ্য মজুদদারী অভিশপ্ত

ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা (Natural Competition)-এর পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও লোকেরা স্বার্থপরতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে পরের উপর টেক্কা দিয়ে নিজের ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করতে থাকবে, তা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়। খাদ্যপণ্য, জনগণের সাধারণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি সব ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোরতা। এ জন্যেই নবী করীম (সঃ) পণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিন ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, "যে লোক চল্লিশ রাত্রিকাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ্ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহ্‌ও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে।"[৬৪]

নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, "অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ পণ্য মজুদ করে রাখার কাজ করে না।"[৬৫]

এ অপরাধী কথাটি খুব সহজ অর্থে নয়। "যে-ই পণ্য মজুদ রাখার কাজ করে সে-ই অপরাধী" কথাটি যথার্থ। কুরআন মজিদে ফিরাউন, হামান প্রভৃতি বড় বড় কাফির ও আল্লাহ দ্রোহীদের সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই ফিরাউন ও হামান ও সে দু'জনার সৈন্য সামন্ত বড় বড় অপরাধী ছিল।"[৬৬]

পণ্য মজুদকারীর মনস্তত্ত্ব ও বীভৎস মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়ে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "পণ্য মজুদকারী অত্যন্ত খারাপ লোক হয়ে থাকে। সে যদি শুনতে পায় যে, পণ্য মূল্য কমে গেছে, তা হলে তার কাছে খুব খারাপ লাগে। আর যদি শুনতে পায় যে, মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা হলে খুবই উল্লাসিত হয়ে উঠে।"[৬৭] তিনি আরও বলেছেন, "বাজারে পণ্য আমদানিকারক রিজিক প্রাপ্ত হয়। আর পণ্য মজুদকারী হয় অভিশপ্ত।"[৬৮]

৬২। আল-কুরআন, সূরাতুল মুতাফ্‌ফিফিন আয়াত নং- ১-৩।
৬৩। সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ৪৭৮৯।
৬৪। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৪৬৪৮।
৬৫। সহীহু লি মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং-৩০১৩।
৬৬। আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, আয়াত নং- ৮।
৬৭। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, কর্তৃক উদ্ধৃতঃ ইসলামে হালাল হারামের বিধান, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং) পৃ. ৩৩৪।
৬৮। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তেজারাত, হাদীস নং- ২১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তার কারণ হচ্ছে ব্যবসায়ীর মুনাফা লাভ দু'টির কোন একটি কারণে সম্ভবপর হয়। একটি হচ্ছে, সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করার আশায় অর্থাৎ পণ্য আটক করে রাখলে বাজারে তার অভাব তীব্র হয়ে দেখা দেবে এবং লোকেরা খুবই ঠেকায় পড়ে যাবে। তখন তার যে মূল্যই দাবি করা হবে তা যত বেশি ও সীমালংঘনকারী হোক না কেন তাই দিয়েই লোকেরা তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প-স্বপ্ন মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দেবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরও অন্যান্য পণ্য নিয়ে আসবে। তাতেও সে মুনাফা পাবে। এভাবে তার ব্যবসা চলতে থাকবে ও পণ্যদ্রব্য বেশি কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা করতে থাকবে।

মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজ সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে আর নবী করীম (সাঃ) যেমন বলেছেন, এই ব্যবসায়ীই রিযিক প্রাপ্ত হয়।

পণ্য মজুদকরণ ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে খেলা করা যে কতবড় অনাচার তা রাসুলে করীমের অপর একটি বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়ামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন উমাইয়া প্রশাসক উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জিয়াদ তাকে দেখতে এলেন। তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে মা'কাল, আপনি কি জানেন, আমি কোন হারাম রক্তপাত করেছি? বললেন, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি মুসলমানদের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন হস্ত ক্ষেপ করেছি? বললেন, তাও আমি জানি না পরে মা'কাল লোকদের বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন হে উবায়দুল্লাহ্, শুনুন আমি একটি হাদীস আপনাকে শোনাচ্ছি, যা রাসুলে করীমের কাছে থেকে আমি মাত্র এক-দুইবার শুনিনি। তিনি বলেছেন, "মুসলিম জনগণের জন্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার অধিকার রয়েছে তিনি কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের উপর বসাবেন।"[৬৯] একথা শুনে উমাইয়া শাসক বললেন, আপনি কি নিজেই এই হাদীস রাসুলে করীম (সঃ) এর মুখে শুনেছেন? বললেন, হ্যাঁ, এক দুইবার নয়।

এসব হাদীস ও তার ইঙ্গিত-ইশারার ভিত্তিতে আলিমগণ এ মাসালা বের করেছেন যে, পণ্য মজুদকরণ দু'টি শর্তে হারাম। একটি এই, এমন একস্থানে ও এমনসময় পণ্য মজুদ করা হবে যখন তার কারণে জনগণকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ হবে অধিক মুল্য হরণ, যার ফলে মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

* ঘুষ উপঢৌকন ও ইসলাম

বাতিল উপায়ে ও অন্যায়ভাবে লোকদের ধনমাল ভক্ষণ করার একটি পন্থা হচ্ছে ঘুষ। কেননা প্রভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন বা সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে ধনমাল দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে-প্রভৃতি উদ্দেশ্যে তা-ই ঘুষ।

৬৯। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৯৪২৬।

Dhaka University Institutional Repository

শাসক-প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্যে ঘুষের পথ অবলম্বন করাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। তাদের জন্যে তা দেয়া হলে তা কবুল করা বা দাতা গ্রহীতার মধ্যে মাধ্যম হওয়া-এ সবই হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা তোমাদের ধনমাল পরস্পর বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না, না প্রশাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যে, লোকদের ধন-মালের একাংশ তোমরা নিজেরা ভক্ষন করবে পরের হক নষ্ট করে এবং জেনে শুনে।"[৭০]

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "সরকারী ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ খায়-এ উভয় ব্যক্তির উপরই আল্লাহর অভিশাপ।"[৭১] হযরত সাওবান (রাঃ) বলেছেন, "ঘুষ দাতা ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী এ সকলেরই উপর রাসুলে করীম (সঃ) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[৭২]

ঘুষ গ্রহণকারী যদি কারও উপর জুলুম করার উদ্দেশ্যে ঘুষ নেয়, তাহলে তার অনাচারের মাত্রা আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

আর যদি সুবিচার করার মানসে এ ঘুষ গ্রহণ করে, তাহলে সুবিচার করা তো তার দায়িত্ব সে জন্যে কোনরূপ ধন-মাল গ্রহণের কোন অধিকার থাকতে পারে না।

ইসলাম ঘুষ হারাম করেছে, এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এতে যে লোক শরীক হয়, তাদের ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বন করেছে, তাও বিচিত্র নয়। কেননা যে সমাজে এর ব্যাপকতা হয়, সে সমাজ জুলুমে জর্জরিত হতে বাধ্য এবং তার ধ্বংস অনিবার্য। যে লোক অন্যায়ভাবে প্রশাসন চালানো বা বিচারের রায় দিল কিংবা সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক বিচার করতে প্রশাসন অস্বীকার করল, যে পিছনে তাকে অগ্রে এনে দিল এবং যে অগ্রবর্তী তাকে পশ্চাদবর্তী করে দিল, সে সমাজে কর্তব্যপরায়ণতার ভাবধারার পরিবর্তে স্বার্থপরতার ভাবধারা প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

শাসক প্রশাসকদের উপঢৌকন:

ঘুষ-তা যে কোনরূপে যে কোন নামেই হোক, ইসলাম তা হারাম ঘোষণা করেছে। তাকে যদি হাদিয়া তোহফা বা উপহার-উপঢৌকন বলা হয় তবু তা হারামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে হালালের আওতার মধ্যে পড়বে না ।

হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসুলে করীম (সঃ) বলেছেন, "যে লোককে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করেছি ও তার বেতন নির্দিষ্ট করে ধার্য করে দিয়েছি, সে যদি তার পরও কিছু গ্রহণ করে, তবে তা হবে খিয়ানত।"[৭৩]

খলীফা উমর ইবনু আবদিল আযীযের সম্মুখে কিছু হাদিয়া পেশ করা হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে বলা হয়– স্বয়ং রাসুলে করীম (সঃ) হাদিয়া তোহ্ফা গ্রহণ করতেন আর আপনি করছেন না? জবাবে তিনি বললেন– হ্যাঁ, তা তো তাঁর জন্যে হাদিয়াই ছিল কিন্তু তা আমাদের ঘুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

৭০। আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং- ১৮৮।
৭১। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং- ২৩০৪।
৭২। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আকদিয়াত, হাদীস নং-৩১০৯।
৭৩। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল খারাজ, হাদীস নং- ২৫৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলে করীম (সঃ) সাদ্‌কা যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে আজদ গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। সে যখন তাঁর কাছে ফিরে এল, তখন কিছু ধন-মাল নিজেরা হাতে রেখে দিয়ে বলল– এ মাল আপনার। আর এসব আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম (সঃ) খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "তোমার এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকতে তখন দেখা যেত, কে তোমাকে হাদিয়া দিচ্ছে?" [৭৪]

পরে বলেছেন, "ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত করি। পরে সে বলে, প্রাপ্ত ধন-মালের এ অংশ আপনার আর এ অংশ আমার জন্যে হাদিয়া বাবদ দেয়া? সে কেন তার মায়ের ঘরে বসে থাকেনি, তারপর যদি হাদিয়া দেয়া হত তাহলে না হয় তার এ কথায় যথার্থতা বোঝা যেত। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমাদের কেউ যদি অন্যায়ভাবে কোন ধনমাল গ্রহণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে তা আল্লাহর কাছে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। তাই তোমরা কিয়ামতের দিন যেন নিজেদের কাঁধে করে উষ্ট্র, গরু-গাভী বা ছাগল নিয়ে আসতে বাধ্য হও এরূপ অবস্থায় যে, সে জন্তুটি চিৎকার করছে। পরে তিনি তার দুই হস্ত উর্ধ্বে উত্তোলিত করলেন এতটা যে তার দু'হাতের বগলের সাদা অংশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠল। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি কথা পৌছে দিয়েছি?"[৭৫]

*** ইসলামের দৃষ্টিতে মাদক ও মাদকাসক্তি**

অনাচারমুক্ত ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে নিকৃষ্ট জঘন্য পানীয় থেকে সমাজকে মুক্ত করা এবং ভাল উপদেশ ও উত্তম-উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে মানুষকে আগ্রহী করা একান্তই কর্তব্য। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানও এ তত্ত্বকে অকাট্য বলে প্রমাণ করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা খাও আমার দেয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র খাদ্যসমূহ এবং তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই বন্দেগীতে রত হয়েই থাক। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, শুধুমাত্র মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে বলি দেয়া জন্তুর মাংস।"[৭৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বলি দেয়া জন্তু গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, উপর থেকে পরে গিয়ে মরা, সংঘর্ষে এসে মরা জন্তুর মাংস এবং হিংস্র জন্তুর ছিন্ন ভিন্ন করে খাওয়া জীবের অবশিষ্টাংশ, তবে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবাই করা হলে এবং যা কোন বলিদান ক্ষেত্রে যবেহ্ করা হয়েছে তাও এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ এ সব নিষিদ্ধ কার্যাবলী।"[৭৭]

এ আয়াতে যে সব জীবের মাংস খাওয়া ও যেসব কাজ করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে তা সবই মানব চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অথচ ইসলামের লক্ষ্য হল চরিত্রবান লোক ও সমাজ তৈরি করা। এ কারণেই এসব জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! মাদকদ্রব্য জুয়া মুর্তি পুঁজার দেবী এবং ভাগ্য জানার পন্থাসমূহ শয়তানি চক্রান্ত। একে বর্জন করলে ইহজগতে ও পরজগতে তোমরা সাফল্য লাভ করবে।"[৭৮]

৭৪। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হিয়াল, হাদীস নং- ৬৪৬৪।
৭৫। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হিবাহ, হাদীস নং- ২৪০৭।
৭৬। আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত নং- ১৭২-১৭৩।
৭৭। আল-কুরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত নং- ৩।
৭৮। আল-কুরআন, সুরা মায়িদা, আয়াত নং- ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ও মদ্যপান হারাম। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামের এ দু'টি উৎসই এ বিষয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে একথা ঘোষণা করেছে। আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতি এ ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ ও মতদ্বৈততা নেই বা কোন মতভেদের ও সৃষ্টি হয়নি।

অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগে আভিজাত্য, বংশ মর্যাদা ও গোত্রের সম্মান রক্ষার নামে এমন কোন কাজ ছিল না, যা আরবের লোকেরা করত না। অবিচার-অত্যাচার, রক্তপাত, মদপান, জুয়া খেলা, লুণ্ঠন ও ব্যভিচার তখন খুব সহজ ভাবে চলত। নেশাই এসব অপকর্মের ইন্দণ যোগাত। প্রায় সকল অপকর্মের মূল বলে খ্যাত মদ ও জুয়ার আসক্তি তখন তুঙ্গে ছিল।

তৎকালীন আরবদের প্রধান খাদ্য খেজুর ভিজিয়ে রেখে সেই পানি পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। অতিথি আপ্যায়নের পর তা পরিবেশন করা হত। এ প্রথানুসারে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আগমনের পরও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এই পানীয় গ্রহণ করত। ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মদপান হারাম হয়নি। অজ্ঞতার যুগেও ইসলামের গোড়ার দিকে খেজুর দিয়েই সাধারণত মদ তৈরি হত। তারপর মদ তৈরি হত গম, বার্লি মধু ও আঙ্গুর দিয়ে।

মদ তৈরির পর্যায়ক্রমটা হাদীস পাঠ করলে অনুমান করা যায়। এ সম্পর্কিত কয়েকখানা হাদীস "দুইটি বৃক্ষ হতে মদ তৈরি হয় খেজুর এবং আঙ্গুর বৃক্ষ।"[৭৯]

হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, মদ নিষিদ্ধ বলে ওহী এসেছে এবং তা পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরী হয়, আঙ্গুর, খেজুর, জব, আটা এবং মধু। মদ সেই জিনিস যা জ্ঞানকে আবৃত করে।"[৮০]

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যখন মদ হারাম হল তখন তা নিষিদ্ধ হল। আমরা আঙ্গুরের মদ অল্পই দেখতে পেতাম। আমাদের অধিকাংশ মদই পুরাতন এবং নতুন খেজুর দ্বারা তৈরি হত।"[৮১]

ইসলামে মদ্যপান সংক্রান্ত নিষেধবানী একদিনে অবতীর্ণ হয়নি। এটা পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিক যুগে মদের ব্যবহার এত বেশি ছিল, তা তখন আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ ও তাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এ মারাত্মক জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করতে বিজ্ঞানসম্মত ক্রমিক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা, জিনিসটিকে তখন হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "কুরআনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা ও সূরা সমূহে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমানের উল্লেখ হয়েছে। তা গ্রহণ করে লোকেরা যখন ইসলামের দিকে ফিরে এল, তারপর হালাল হারামের বিধান অবতীর্ণ হল। এ না হয়ে প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হত, তোমরা মদ পান কর না, তাহলে তারা অবশ্যই বলত, আমরা কখনই মদপান ত্যাগ করব না।"[৮২]

৭৯। সহীহ লি মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং- ৩৬৭১।

৮০। সহীহুলি মুসলিম, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৫৩৬০।

৮১। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং- ৫১৫২।

৮২। সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন হাদীস নং-৪৬০৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারনেই দেখা যায়, শুধু মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য ইসলামকে চার পর্যায়ের আয়াত নাযিল করতে হয়েছে। মক্কাতে প্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা হল, "এমনিভাবে তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুরের ছড়া থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"[৮৩]

এখানে ইঙ্গিত করেছেন, ফলের এই রসে মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্য হওয়ার যোগ্যতা যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে পাবে এ্যালকোহলে পরিণত হয়ে মাদক হওয়ার যোগ্যতা। মূলতঃ হালাল এ বস্তু থেকে মানুষ হালাল ও উত্তম কল্যাণকর খাদ্য গ্রহণ করবে, না বিবেক-বুদ্ধি-স্বাস্থ্য বিনষ্টকারী মদে পরিণত করবে, তা লোকদের রুচি ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এতে আরও ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে মদ পবিত্র রিযিক রূপে গণ্য হতে পারে না। তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। "মদের প্রতি ঘৃণার বীজ মানুষের মনে বপন করাই ছিল এই প্রথম বারের অবতীর্ণ আয়াত-এর মুল উদ্দেশ্য"[৮৪]

অতঃপর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়, "লোকেরা তোমার নিকট মদ ও জুয়ার কথা জানতে চায়। তুমি বল, এ দু'টি কাজে খুব গুনাহ রয়েছে এবং লোকদের উপকারও আছে বটে। তবে উপকারের তুলনায় গুনাহ অধিক।"[৮৫]

অন্য কথায়, মদ্যপানে ও জুয়াখেলায় কিছুটা ফায়দা ও উপকার যে আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কেননা, মদ ব্যবসায় প্রচুর লাভ, জুয়া খেলায় জয়ী হলে বিপুল অর্থ হঠাৎ করে আসে। কিন্তু তাতে ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দিক রয়েছে। তা উপকারের তুলনায় বেশি মারাত্মক ও পরিহারযোগ্য। এ কথাটুকু বলে মূলত মদ যে হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, যে জিনিষ অত্যন্ত ক্ষতিকর তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য, যদিও এ মুহূর্তে তা সম্পূর্ণ হারাম করা হচ্ছে না।

এরপর সালাত আদায়ের সময়কালে মদ্যপান করাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! নেশা করে তোমরা নামাযে দাড়াবে না। যতক্ষন না তোমরা নামাযে দাড়িয়ে কি বলছ, তা বুঝতে পার।"[৮৬]

এ আয়াতে সালাতকালীন সময়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কিন্তু সালাতকালীন সময়ের বাইরে লোকেরা মদ্য পানে রত থাকত। কেননা, অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করা নিষিদ্ধ হয়নি। এভাবেই চলতে থাকল। এ সময়েই হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) নিজের ঘরে এক ভোজন সভার আয়োজন করেন। তাতে কয়েকজন আনসারী সাহাবী যোগদান করেন। ভোজ শেষে প্রথানুযায়ী সকলে মদ পানে রত হলেন। মদের মাদকতায় মত্ত হয়ে কেউ কেউ হযরত সাদ (রাঃ)-কেই আঘাত করেন। ফলে তার নাকে জখম হয়ে যায়।

৮৩। আল-কুরআন, সুরা আন নাহল আয়াত নং ৬৭।

৮৪। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত ২৪৩।

৮৫। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং- ২১৯।

৮৬। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা , আয়াত নং- ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে মদপান চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণাকরে নাযিলহল নিম্নোক্ত আয়াত, "হে বিশ্বাসীগণ! মদ, মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা সকলে তা সম্পূর্ণ পরিহার কর, তাহলে তোমরা কল্যাণ পাবে। মনে রেখ শয়তান এ মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পর চরম শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট এবং সে তোমাদের বিরত রাখতে ইচ্ছুক সালাত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে। তবে কি তোমরা এ কাজ থেকে বিরত থাকবে?"[৮৭]

উপর্যুক্ত আয়াতের দ্বারা মদ যে হারাম করা হয়েছে 'তায়সির' নামক গ্রন্থে তার নয়টি প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

- ❖ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা তথা মূর্তি পূজা করা হারাম। এই মুর্তি পুজার সঙ্গে মিলিয়ে মদের কথা যখন বলা হয়েছে, তখন মদও হারাম।
- ❖ মদ খাওয়া শয়তানি কাজ। যা শয়তানি কাজ তা অবশ্যই নিষিদ্ধ কাজ। আর যা নিষিদ্ধ কাজ, তা যে হারাম, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর যা হারাম, তা অবশ্যই বর্জনীয় ।
- ❖ মহান আল্লাহ মদ বর্জন করতে এবং এর থেকে সরে থাকতে বলেছেন। যে জিনিস বর্জনের উপর মুক্তি নির্ভর করে তা অবশ্যই হারাম।
- ❖ বলা হয়েছে, মদ জুয়া মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-ফ্যাসাদের ইন্দণ যোগায়। যে জিনিস মানুষের মধ্যে কলহের ইন্দণ যোগায়, তা অবশ্যই হারাম।
- ❖ মদ মানুষকে আল্লাহর স্মরণে রাখা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যে জিনিস আল্লাহকে স্মরণ করতে দেয় না, তা অবশ্যই হারাম।
- ❖ মদ মানুষকে একাগ্র চিত্তে নামায পড়তে দেয় না। যা নামাযের বাধার কারণ হয়, তা অবশ্যই হারাম।
- ❖ মদ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলাটা মদ ছেড়ে দিতে বলারই নামান্তর। সুতরাং তা হারাম।

এ ছাড়া হাদীসে মদপানের জন্য নানা ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও মদ্য পানকে মুর্তিপূজকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার কোথাও মদ্য পানকে মুর্তিপুজার সমতুল্য বলা হয়েছে। এ সবই হল মদপান করার ক্ষতিরদিক যা উপকারের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। যেমন–

- ❖ মহানবী (সঃ) বলেছেন, "অভ্যাসরত মদ্যপায়ী যদি মারা যায়, সে আল্লাহ্‌র সাথে সেই ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাৎ করবে যে ব্যক্তি মুর্তি পুজা করে।"[৮৮]
- ❖ হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মদই পান করি, আর মুর্তি পুজাই করি, এর ভেতর আমি পার্থক্য দেখি না।"[৮৯]
- ❖ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী পানীয় এবং তেজ উৎপাদনকারী খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করা হয়েছে"[৯০]
- ❖ যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা উৎপাদন করে, তার অল্প পরিমাণ ও হারাম"[৯১]

৮৭। এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামে নেসা (ঢাকা ঃ মা প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং) পৃ.৮৬।

৮৮। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-২৩২৫।

৮৯। সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৫৫৬৯।

৯০। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং ৫১৫৭।

৯১। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং ১৭৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

*** হত্যা ও নৈরাজ্য সম্পর্কে ইসলামের পদক্ষেপঃ-**

অনাচারের মধ্যে মানুষ হত্যা সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক 'সামাজিক অনাচার'। মানুষ যখন এ অনাচারে লিপ্ত হয় তারই এক মানুষ ভাইয়ের বিরুদ্ধে, তখন সে গোটা মানবতার সাথেই শত্রুতা করে। সে মানুষ হত্যা করে, আল্লাহ্‌র গঠিত মানব বংশ প্রাসাদের ভিত্তিকে উৎপাটন করে এবং আল্লাহর আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। তা ভয়াবহ নাফরমানি ও আল্লাহদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। এ কারণে ইসলামে এ অনাচারের বীভৎসতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মানব মনে তীব্র ঘৃণা জাগাতে চেষ্টা করা হয়েছে, আর সে সাথে ইসলামী সমাজে সে জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ন্যায় বিচার ভিত্তিক কঠিন শাস্তি। কুরআনে বলা হয়েছে,"হে বিশ্বসীগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরজ (বাধ্যতামূলক) করা হয়েছে।"[৯২]

তিনি আরো বলেন, "তোমরা এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না, যাকে আইনগত সিদ্ধান্ত ব্যতীত হত্যা করা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন।"[৯৩]

কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি (এ বিধান) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, যে ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যে হত্যার অপরাধে অপরাধী নয় বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল। আর যে কোন ব্যক্তি কে বাঁচিয়ে রাখে, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে।"[৯৪]

কুরআনের এ আয়াতে একজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করলে সকল মানুষকে হত্যা করা হয়- এ কথার মাধ্যমে হত্যা কর্মের জঘন্য তাকে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, একজন মানুষকে জীবিত রাখা সকল মানুষকেই জীবিত রাখার মতো কর্ম হিসেবে উল্লেখ করে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটি নিরাপরাধ মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ জীবন ও বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, জীবন বেঁচে থাকবে এবং এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা বিকাশ ও উন্নয়ন ধারায় এ বিশ্বশান্তি, সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভরে উঠবে। সুতরাং ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করার মাধ্যমে মূলত সমগ্র মানবজাতির জন্য সম্ভাব্য কল্যাণ ও সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয়।[৯৫]

মহানবী (সঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে জঘন্য অনাচার হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষ হত্যা করা"।[৯৬] তিনি আরো বলেছেন, "হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত পবিত্র।"[৯৭] দু'টি কারণ ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনের এ প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন কোন পরিস্থিতিতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। (এক) কেউ কোন নির্ভরযোগ্য আদালতে দন্ডার্হ নরহত্যা অনুষ্ঠিত করেছে বলে প্রমাণিত হলে, (দুই) কোন ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য আদালতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে দন্ডার্হ হলে। এ দু'টি পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য কোন পরিস্থিতিতে মানুষের বেঁচে থাকার সার্বজনীন অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে।

৯২। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং- ১৭৮।

৯৩। আল-কুরআন, সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত নং- ৩৩।

৯৪। আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত নং- ৫২।

৯৫। মুহাম্মদ শফিক আহমেদ,মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ইসলামে মানবাধিকারঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা ঃ অক্টোবর ৯৩-জুন ৯৪ সংখ্যা), পৃ.১৫৭

৯৬। মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭।

৯৭। গোলাম মোস্তফা, বিশ্ব নবী (ঢাকা ঃ আহমদ পাবিলিশিং হাউজ, ১৯৯৩ইং) পৃ. ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে আত্মহত্যার প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কৃপাপ্রবণ।"[৯৮] সুতরাং আত্মহত্যা না করে বরং নিজের অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রত্যাশী হতে কুরআনে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগান হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যাকারী, স্রষ্টার সকল পার্থিব ও অপার্থিব দান থেকে বঞ্চিত হয়। এ কাজে সহায়তাকারীও তাযীরের"[৯৯] দন্ডে দন্ডার্হ হয়ে থাকে।[১০০]

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে আরবে নবজাতক মেয়ে শিশুকে জন্ম লাভের পরপরই দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম শিশু হত্যার এ জঘণ্য প্রবণতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক জঘন্য অপরাধ।"[১০১]

* চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ:-

ধন-সম্পদ মানব জীবনের চালিকা শক্তি। মানব জীবনে অর্থ ও সম্পদ একান্ত অপরিহার্য। ইসলাম এ ধন-সম্পদ অর্জন, ব্যয় ভোগের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেছে আর হারাম পথে অন্যায় ও জুলুমের মাধ্যমে আহরিত ধন-সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং পরকালে কঠিন ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় দেখিয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের ধন-মাল পরস্পর বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টি সম্মতিক্রমে ব্যবসা হলে তা নিষিদ্ধ নয়।"[১০২]

ধন-সম্পদ চুরি করে করায়ত্ত করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, "পুরুষ চোর, নারী চোর-উভয়ের হাত কেটে দাও। তারা যা উপার্জন করেছে, এটা তারই শাস্তি ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত....। আর আল্লাহ্ দুর্জয় সুবিজ্ঞানী।"[১০৩]

"সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানুষ চুরি করে দারিদ্র্যের কারণে, ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা নেই বলে। ইসলাম এ ব্যাপারে পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ফলে ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই তার জীবিকা পাবে, তার মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হবে, কোন লোকই না খেয়ে থাকবে না, অভাব-অনটনে থাকবে না। এ কারণে ইসলামী সমাজে কারোরই চুরি করার আবশ্যকতা থাকতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চুরির কাজে অগ্রসর হতে পারে কেবলমাত্র সে সব লোক যারা ধন-সম্পদের লোভী, যারা অধিক সম্পদ করায়ত্ত করার অভিলাষী বা যারা অন্যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা পাপ পথে বেহিসাবে অর্থ ব্যয় করার সুযোগে লালায়িত"[১০৪]। সুস্থ্য সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাই এর বিষয়টি খুবই ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারণে ইসলামে চুরি সমর্থনীয় নয়। ইসলামী সমাজে চুরির কোন সুযোগ থাকতে পারে না। চুরির পথ ও কারণ সর্বতোভাবে বন্ধ করা একান্তই আবশ্যক।

৯৮। আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, আয়াত নং- ২৯।

৯৯। ইসলামে অপরাধের শাস্তি দু'প্রকার। যথা-হুদুদও তাজির। হুদুদ শাস্তি হচ্ছে যা কুরআনে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। তাজিরের শাস্তি, যা ইসলামী আদালত অবস্থাভেদে নিধারণ করে থাকে।

১০০। গাজী শামছুর রহমান: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেষন বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ইং) পৃ. ৩০৫-৩১০।

১০১। কুরআন সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং- ৩১।

১০২। আল-কুরআন,সুরা নিসা, আয়াত নং ২৯।

১০৩। আল-কুরআন,সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৩৮

১০৪। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

*** পরনিন্দা, মিথ্যাচার, অপবাদ সক্রান্ত ইসালামী মনোভাবঃ-**

সমাজের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থায় মানহানিকর হস্তক্ষেপ বা ব্যক্তির মানসম্মানের উপর মিছামিছি যৌন কলংকের কালিমা লেপনও অনাচার। ব্যক্তির মান-সম্মান, পদমর্যাদা, চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রভৃতির হ্রাস বা হানি করার মাধ্যমে তার জীবনের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক বিকাশধারাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। তাই মানহানিকর আচরণের পন্থা হতে পারে, যেমন– অপপ্রচার, গুজব, নিন্দা, উপহাস, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, গালাগাল, বিকৃত নামকরণ, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "পুরুষরা অন্য পুরুষদের উপহাস করবে না"।

হতে পারে তারা তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অনুরূপভাবে নারীরাও নারীদের ঠাট্টা করবে না। হতে পারে তারা তাদের (বিদ্রূপকারীদের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বা বক্রোক্তি (মানহানিকর উক্তি) করবে না, একে অপরকে আক্রমণাত্মক উপনামে আহবান করবে না বা কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নিন্দা করবে না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো।"[১০৫]

কুরআনে উপরোক্ত আয়াতসমূহে মানহানিকর বিভিন্ন আচরণকে নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্ভ্রম ও মর্যাদার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী জাতির সম্ভ্রমের প্রতি অপবাদ আরোপ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি জঘন্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত। কেননা, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যিভাবে যিনার অভিযোগ তোলা অত্যন্ত মারাত্মক অনাচার। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। তাতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তজন জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে, তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা ও তার খারাপ প্রতিক্রিয়া রোধ করা বা তার কুপ্রভাব মুছে ফেলা তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। তাকে সারাটা জীবন মিথ্যা কলংকের বোঝা বহন করতে হয়। এ অবস্থা সর্বাধিক মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়েলোক হয়। এ কলঙ্ক শুধূ তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তাঁর পিতৃপুরুষ ও তাঁর গর্ভজাতকের মুখকেও কালিমালিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,"আর যেসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকের উপর যিনার অভিযোগ আনে, পরে সেজন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি দোররা মার। তাদের সাক্ষ্য কখনই গ্রহণ করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এ কাজ থেকে বিরত থাকবে অতঃপর তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ্ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান।"[১০৬] অনত্র্য বলা হয়েছে, "যে সকল লোক সুরক্ষিত সচ্চরিত্র, অসতর্ক ঈমানদার মহিলাদের উপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে লানতপ্রাপ্ত এবং তাদের জন্য অতি বড় আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।"[১০৭]

১০৫। আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত নং ১১-১২।

১০৬। আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত নং- ৪-৫।

১০৭। আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত নং- ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

*** সন্ত্রাস ও ইসলাম:-**

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রচার চালানো হচ্ছে, ইসলাম মানেই চরমপন্থী সন্ত্রাসের ধর্ম, আর মুসলমান মানেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সন্ত্রাসী। পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সচিত্র প্রতিবেদন ব্যাপক প্রচার পাচ্ছে মিডিয়াতে এবং তাতে এরূপ ধারণাই দেয়া হচ্ছে যে মুসলমানরাই সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও অশান্তির সৃষ্টি ও লালন করে চলেছে। অতএব, এরা বিশ্বশান্তি ও মানবতার জন্য হুমকি স্বরূপ। কিন্তু মুসলমানরা কেন সন্ত্রাস ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, তার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ প্রচার করা হচ্ছে না। একজন দু'জন লাদেন, সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রামাণ তুলে ধরা হচ্ছে, এরাই হচ্ছে মুসলিম, আর এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই হচ্ছে এদের ধর্মের শিক্ষা। কিন্তু আসলে কি তাই? ইসলাম কি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শিক্ষা দেয়? নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে বলে? অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে উৎসাহ যোগায়? অন্যায় বা জোর-জুলুম করতে বলে? মূলতঃ ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাসমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন বিধান।

নিম্নে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাইয়ো না।....."[১০৮]

"অবশ্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও অংশীবাদীদের তুমি সবচেয়ে বেশি উগ্র দেখবে।"[১০৯]

"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না' তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি বজায় রাখি'। সাবধান! এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না।"[১১০]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্তমান মুসলিম দেশেগুলোর বিরুদ্ধে ইহুদি আগ্রাসন এবং তার পিছনে যারা আছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং টনি ব্লেয়ার যখন বলেন, তারা বিশ্বে শান্তি রক্ষা করেছেন, আর মিস্টার বুশ, যখন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বলেন, 'শ্যারন তো একজন শান্তিবাদী মানুষ', তখন বিশ্বের বিবেকবান মানুষ হাসবে না কাঁদবে, তা বুঝতে পারে না। তাদের কথা, কাজ ও চরিত্রের সাথে কুরআনের বাণীর কি আশ্চর্য মিল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন, "আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, তবে সীমালংঘন করো না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না।"[১১১]

উদ্ধৃত আয়াতে লক্ষণীয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের, আগ্রাসী যুদ্ধের জন্য নয়। কখনোই বলা হয়নি, তোমরা আগে আক্রমণ করো। অন্যত্র আরও বলা হয়েছে, "যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে"।[১১২]

১০৮। আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৫৬

১০৯। আল কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৮২

১১০। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ১১-১২

১১১। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ১১৯

১১২। আল-কুরআন, সূরা হজ্জ, আয়াত নং ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসুলে করীম (সঃ) জওয়াবে বলতেন, সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।

যখন রাসূলে করীম (সঃ) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় প্রথম তিনি বলেন, 'এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য।' এরই পারিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যুদ্ধে যাতে সীমালংঘন করা না হয় সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "বাধা দেয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনোই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।

সৎকর্ম ও তাকাওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লহকে ভয় করবে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১১৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন সম্পদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[১১৪]

আল্লাহপাক বলেন, "মানুষের প্রাণ সত্তাকে আল্লাহ সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেছেন। একে হনন করবে না, সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ ব্যতীত।"[১১৫]

আবার আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[১১৬]

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যুদ্ধে যে সকল সীমা মেনে চলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

১. অতর্কিত আক্রমণ নিষিদ্ধ।
২. আগুনে পোড়ানো নিষিদ্ধ।
৩. নির্যাতনপূর্বক হত্যার নিষেধাজ্ঞা।
৪. লুটতরাজ নিষিদ্ধ।
৫. ফলবান বৃক্ষ, ফসলের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পদ নষ্ট করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

১১৩। আল কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ২
১১৪। আল কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৮
১১৫। আল কুরআন,সূরা আনআম, আয়াত নং ১৫১
১১৬। আল কুরঅন,সূরা আনফাল, আয়াত নং ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬. লাশ বিকৃত করা নিষিদ্ধ।
৭. বন্দী হত্যার নিষেধাজ্ঞা।
৮. দূত হত্যার নিষেধাজ্ঞা।
৯. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অবৈধতা।
১০. উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্য নিষিদ্ধ।
১১. হাঙ্গামা ও গোলযোগ সৃষ্টি অবৈধ।
১২. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেউ যেন হত্যা না করে।
১৩. সন্ন্যাসী ও তপস্বীদের যেন কষ্ট না দেয়া হয় এবং কোনো উপাসনালয় যেন ভাংচুর করা না হয়।
১৪. পশুদের যেন হত্যা করা না হয়।
১৫. সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনবসতিগুলোকে যেন জনশূন্য না করা হয়।
১৬. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জান-মালকে অবিকল মুসলমানদের জান-মালের মত নিরাপত্তা দিতে হবে।
১৭. গণীমতের সম্পত্তি যেন আত্মসাৎ করা না হয়।
১৮. যুদ্ধে যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা না হয়।"[১১৭]

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন কোন সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখনি তিনি তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন অতঃপর বলতেন, "আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে অভিযান শুরু কর। আল্লাহর সাথে যারা কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা খেলাপী করো না। গণিমতের মাল আত্মসাৎ করো না। লাশ বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। এরপর সৈন্যদেরকে বলে দিতেন শত্রুর সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখবে, ১. ইসলাম, ২. জিযিয়া, ৩. যুদ্ধ। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে কিছু বলো না। যদি জিযিয়া দিতে রাজি হয় তাহলে তার জান ও তার মালের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করো না। কিন্তু সে যদি তাও না মানে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ কর" [১১৮]

সমাজের বিশৃঙ্খলাজনিত অনাচার সম্পর্কে হযরত মায়াজ বিন জাবাল হতে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ননা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যুদ্ধ দুই রকমের" যে ব্যক্তি খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং নেতার আনুগত্য করে, নিজের উত্তম সম্পদ ব্যয় করে এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়ায় না, সে জাগ্রত বা ঘুমন্ত যে অবস্থাতেই থাক, পুণ্য লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য এবং খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, নেতার আনুগত্য করে না এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছাড়ায় সে পাল্টা আযাব ভোগ করবে" [১১৯]

১১৭। আবুল আলা-আল যিহাদ পৃঃ ২৩০ উদৃত্ত শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির "রাজনৈতিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদিতা ও ইসলাম" মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর-২০০১, বর্ষ৩৭,সংখ্যা ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২২।

১১৮। আবুল আলা, আল জিহাদ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০

১১৯। আবুল আলা আল যিহাদ পৃঃ ২২৮ উদৃত্ত শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির "রাজনৈতিক আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদিতা ও ইসলাম" মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর-২০০১, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-২২।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে আরো কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলছেন, "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। সৎপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে তাগুত (অসত্য দেবতা) কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনো ভাংবে না।"[১২০]

"ওরা যা বলে তা আমি ভালভাবেই জানি। তোমাকে ওদের উপর জবরদস্তি করার জন্য পাঠানো হয়নি। সুতারং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।"[১২১]

মুসলমানদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও (খ্রীস্টান ও ইহুদি) আহবান জানানো হয়েছে, "হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য বল।"[১২২]

"হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না আর যে সম্প্রদায় ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"[১২৩]

ইসলামকে বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসী ও অসহিষ্ণুতার ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে কি বলা হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা কিতাবীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে যারা ওদের মধ্যে সীমালংঘন করে তাদের সাথে নয়। আর বলো, আমাদের উপর ও তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। আর আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্যতো একই আর তাঁরই কাছে আমরা আত্ম সমপর্ন করি।"[১২৪]

আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গাল দেবে না, তাহলে তারা (সীমালংঘন করে) অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গাল দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির চোখে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি। তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা ফিরে যাবে। তখন তিনি তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন।" [১২৫]

" ..... আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে আর এক দল দিয়ে বাধা না দিতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রীস্টানদের মঠ ও গির্জা, ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদিদের ভজনালয়, আর মুসলমানদের মসজিদ-যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি করে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তার ধর্মকে সাহায্য করে।"[১২৬]

১২০। আল কুরআন,সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৬

১২১। আল কুরআন,সূরা ক্বাফ, আয়াত নং ৪৫

১২২। আল কুরআন, সূরা নিসা,আয়াত নং ১৭১।

১২৩। আল কুরআন,সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৭৭।

১২৪। আল কুরআন,সূরা আনকাবুত,আয়াত নং ৪৬।

১২৫। আল কুরআন,সূরা আনআম,আয়াত নং ১৮।

১২৬। আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি প্রত্যেক সময়ের জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাক দাও। তুমি তো সরল পথেই আছো। ওরা যদি তোমার সাথে তর্ক করে তবে বলো, তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মিমাংসা করে দেবেন।" [১২৭]

"বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা! আমি তার উপাসনাকারী হবনা। যার উপাসনা তোমরা কর, আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী হবো না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছো। আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যাঁর উপাসনা আমি করি! তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।"[১২৮]

* নারী নির্যাতন ও ব্যভিচার

নারী নির্যাতন বলতে যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগ, অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিদেশে পাচার, তালাক, ধর্ষণ করতে গিয়ে জখম করা ইত্যাদি অনাচারকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাপক অর্থে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিক বা নৈতিক যে কোন ধরণের নিপীড়নকে নারী নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারী নির্যাতন বলতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার যে কোন ধরণের তৎপরতাকে বোঝায় যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন, মানসিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে–

❖ শিক্ষা গ্রহণে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করণ

ইসলাম নারী ও পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার ও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার পালন না করলে দুনিয়াতে কি বিপর্যয় হবে এবং আখেরাতে কি শাস্তি হবে- ইসলাম সে কথাও বলে দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের এই সকল বিধিবিধান সম্পর্কে নারী ও পুরুষদের অজ্ঞতাই পারস্পারিক অধিকার হরণ ও নির্যাতনের মূল কারণ। যার ফলে পুরুষ নারী থেকে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় পুরুষ কর্তৃক নারীরাই নির্যাতিত হয়। মহানবী (সাঃ) এই নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে নারী পুরুষ উভয়কেই ইসলাম সম্পর্কে জানার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয বা অবশ্য-কর্তব্য।"[১২৯] এই বিদ্যার মধ্যে নারী-পুরুষের পারস্পারিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিদ্যা অন্তর্ভূক্ত। এই বিদ্যা অর্জন করলে উভয়ই পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে নারী নির্যাতন রোধ হবে।

১২৭। আল কুরআন,সূরা হজ্জ, আয়াত নং ৬৭।

১২৮। আল কুরআন, সূরা মূল্ক, আয়াত নং ৬৯।

১২৯। সুনানু ইবনে মাজাহ,আল-মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

* কর্মে ও অর্থ উপার্জনের প্রেরণা

সমাজে নারী নির্যাতনের একটি কারণ হলো- নারীরা অর্থোপার্জন করে না এবং তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। বিত্তহীনতা আর পরনির্ভরশীলতা নারীকে পুরুষের অবহেলা আর নির্যাতনের শিকারে পরিণর করে। কিন্তু ইসলাম নারীকে শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীর শ্রমলব্ধ ফলকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। আল-কুরআনের ভাষায়, "পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।"[১৩০]

হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ব্যবসার কথা তো সর্বজনবিদিত। তা ছিল বিরাট আকারের। তাঁর ব্যবসা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা এসছে, "খাদিজা (রাঃ) অনেক ধন-সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি লোকজনকে (নিজ ব্যবসায়) নিয়োগ করতেন, মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতেন।"[১৩১]

এভাবে ইসলাম নারীকে অর্থোপার্জনের অধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছে এবং নারীদেরকে অবহেলা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

❖ উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান

বিভিন্ন ধর্ম নারীকে পিতা-মাতা বা স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নারী নির্যাতনের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম নারীকে পুরুষের পাশাপাশি উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে নারীর মর্যদাকে সমুন্নত করেছে এবং নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ রেখে মারা যায় তাতে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি নারীরও অধিকার রয়েছে, তবে কিছু কম আর বেশি।"[১৩২]

❖ যৌতুক নয়, মহরানা নিশ্চিত করণ

সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে যৌতুক প্রথাকে চিহ্নিত করা যায়। যৌতুকের দাবীকে কেন্দ্র করে মানসিক এবং দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে মহিলাদের আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম এই যৌতুক প্রথাকে হারাম ঘোষণা করে বিবাহ করার সময় স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা ফরজ করেছে। আল-কুরআনের ভাষায়– "তোমাদের স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা দিয়ে দাও।"[১৩৩] আরও বলা হয়েছে, "ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও।"[১৩৪] এভাবে যৌতুক নয়, বরং স্ত্রীকে মোহরানা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে নারী নির্যাতন অনাচার রোধ করেছে ইসলাম।

১৩০। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত নং ৩২।

১৩১। মাওলানা সাইয়েদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদ- মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ.২৫০।

১৩২। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা আয়াত নং- ৭।

১৩৩। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত নং- ৪।

১৩৪। আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত নং- ১০।

Dhaka University Institutional Repository

❖ মর্যাদার আসনে সমাসীন করা

নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানের অধিক মূল্য দানের মানসিকতা নারী নির্যাতনের প্রবণতা সৃষ্টির কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইসলাম নারীর মর্যাদা ঘোষণার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের পথকে বন্ধ করেছে। মহানবী (সঃ) কন্যারূপে নারীর মর্যাদা ঘোষণা করে বলেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে সে ও আমি কিয়ামতের দিন এতোটুকু কাছাকাছি থাকবো। এই বলে হুযুর (সঃ) ইশারায় তাঁর দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে নৈকট্যর পরিমাণ প্রদর্শন করলেন।"[১৩৫] প্রিয় নবীজী স্ত্রীরূপে নারীর মর্যাদা ঘোষণা করে বলেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"[১৩৬] নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে হুযুর (সাঃ) বলেছেন, "সম্মানিত ব্যক্তি তাদেরকে (নারীদের) সম্মান করো আর অভদ্র দুর্ভাগা ব্যক্তি তাদেরকে অপমান করে।"[১৩৭]

❖ স্বামীদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের নিদের্শ

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতনের অন্য একটি রূপ হলো স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেওয়া। অনেক সময় স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান করে না। ফলে স্ত্রীকে বহু কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু ইসলাম এই নির্যাতনের অবসান ঘটিয়েছে। মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "যথাযথভাবে তাদের (স্ত্রীদের) পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমদের উপর অপরিহার্য।"[১৩৮]

❖ জীবন-সঙ্গী নির্বাচনে নারীদের সুযোগ প্রদান

একজন মেয়ের উপর সবচেয়ে বড় নির্যাতন হলো তার অপছন্দনীয় কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে তার উপর চাপিয়ে দেয়া। আমাদের সমাজে পুরুষরা কাঙ্ক্ষিত মানের স্ত্রী লাভের জন্য হাজারো কনে দেখতে পারেন, কিন্তু নারীদের এ জাতীয় অধিকার তেমন দেওয়া হয় না। বরং পছন্দ করা যেন নারীর অধিকারই আসে না, বরং এ সমাজে এ দায়িত্ব নিছক অভিভাবকরাই আনজাম দিয়ে থাকেন।

একপেশে ও অধিকার হরণকারী জাতীয় নীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো- নারীর বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে এবং জীবন-সঙ্গী বাছাইয়ের ব্যাপারে তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেন, "বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেওয়া যাবে না।" [১৩৯]

১৩৫। সহীহু লি মুসলিম, কিতাবুল বিররে, হাদীস নং-৪৭৬৫।

১৩৬। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৩০)

১৩৭। সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (কায়রোঃ দারুল ফাতহ লিল ইলমিল আরাবী, ১৯৯০) খন্ড-২, সংস্করণ-২, পৃঃ ২৯৩)

১৩৮। সহীহু লি মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং-২১৩৭।

১৩৯। সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-৪৭৪১।

Dhaka University Institutional Repository

❖ প্রয়োজনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো

ইসলাম নারীকে অত্যাচারী স্বামীর নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। স্বামী সব সময় এককভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রাখে না। ইসলাম কিছু বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীকেও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "তবে যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, আল্লাহর সীমারেখা বাস্তবিকই রক্ষা করে চলতে পারবে না- এমতাবস্থায় স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে স্বামী হতে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে স্বামী-স্ত্রীর কাউকে দোষারোপ করে এবং যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই অত্যাচারী।"[১৪০]

❖ স্বামী কর্তৃক একাধিক বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করা

একাধিক বিবাহের কারণে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। এর ফলে সংসারে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্ত্রীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ঝগড়া লেগেই থাকে। এগুলো নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম অনিবার্য কারণবশতঃ পূর্ব-স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে, একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, স্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে এই শর্ত ভঙ্গ করবে তার জন্য শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, "যে লোকের দু'জন স্ত্রী থাকবে একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে, কিয়ামতের দিন তার এক পাশের গাল কাটা ও ছিন্ন অবস্থা ঝুলতে থাকবে।"[১৪১] এভাবে মহানবী (সাঃ) একাধিক বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে নারী নির্যাতনের পথকে রুদ্ধ করেছেন।

❖ স্ত্রীর সাথে সদাচারণের নির্দেশ

ইসলাম স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিণ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে মেয়েরা খুবই লাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। অল্পতেই রেগে যাওয়া অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে ওঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। মেয়েদের এ স্বাভাবিক দুর্বলতা কিংবা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন,"তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালভাবে ব্যবহার ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দিবেন।"[১৪২]

১৪০। আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত নং- ২২৯।

১৪১। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ হাদীস নং-১০৬০।

১৪২। আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, আয়াত নং- ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সাঃ) স্বামীদের নসীহত করে বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্য আমার এ নসীহত কবুল কর। কেননা নারীরা জন্মগত ভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোরপূর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চুর্ণ করে দিবে। আর যদি তাকে এমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার জন্য আমার এ উপদেশ গ্রহণ করবে।"[১৪৩] অপর এক হাদিসে নবী করীম (সঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"[১৪৪]

এভাবে মহানবী (সাঃ) স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করে তাদেরকে নির্যাতন করার মন-মানসিকতাকেই পাল্টে দিয়েছেন।

❖ কঠোর শাস্তির বিধান

ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে যেমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমিন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতন কারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। ইসলাম নারী নির্যাতন তথা-ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই অপহরণ এসিড নিক্ষেপ, অংগহানী, সম্মাণহানী মিথ্যা-অপবাদ প্রদান ইত্যাদির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে। এসব বিধানের ন্যায়সঙ্গত বাস্তবায়ন সম্ভব হলে মুসলিম সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ হওয়া সম্ভব।

অহেতুক বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর আজীবনের বন্ধন। এ বন্ধন কোন সাময়িক প্রেম-নিবেদন বা আনন্দ গ্রহণের জন্য নয়। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বন্ধন তৈরি হয় তা এ জগত ও পরজগতের চিরন্তন বন্ধন। কিন্তু তালাক এই স্বর্গীয় বন্ধনের মাঝে এক অভিশাপ। রহমতের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাই এই তালাককে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছেন এবং আবশ্যক কারণ ছাড়া তালাক দেওয়াকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধুর বন্ধনের মাঝে তালাক নামক যন্ত্রণার যেন অশুভ আগমন না ঘঠে, তাই মহানবী (সাঃ) স্বামী-স্ত্রী ও অভিভাবকদের বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহ-পরবর্তী কিছু আদেশ মান্য করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। নিম্নে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. পাত্র-পাত্রী একে অপরকে পছন্দ করা

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর চিরজীবনের বন্ধন। সুতরাং বিবাহের পূর্বে উভয়কে দেখে নেয়া আবশ্যক। পাত্র-পাত্রী না দেখলে বিবাহের পর পাত্র-পাত্রী পছন্দ না হলে তা পারিবারিক জীবনে অশান্তি এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মহানবী (সাঃ) বিবাহ বিচ্ছেদ প্রতিরোধে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী উভয় উভয়কে দেখার নির্দেশ দান করেছেন । মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।"[১৪৫]

১৪৩। সহীহুল বুখারী কিতাবু আহাদিছিল আম্বিয়া, হাদীস নং-৩০৮৪।

১৪৪। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৯৭২৫।

১৪৫। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ১৭৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের কন্যাদেরকে কুৎসিৎ, অপ্রীতিকর পুরুষের নিকট বিয়ে দিও না। কেননা নারীর যেসব অংশ পুরুষের জন্য আকর্ষণীয় পুরুষের সেসব অংশই আকর্ষণীয় হয় কন্যাদের জন্য। অতএব তাদের এ অধিকার রয়েছে বিয়ের পূর্বে ভাবী বরকে দেখার।"[১৪৬]

* উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

আজকাল পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের সৌন্দর্য ও সম্পত্তিকেই শুধু দেখা হয়। কিন্তু ইসলাম দ্বীনদারী, চরিত্র ও নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসুল (সঃ) বলেছেন, "চারটি জিনিস দেখে নারীকে বিবাহ করা উচিত। ১. ধন-সম্পদ ২. বংশ মর্যাদা ৩. রূপ-সৌন্দর্য ৪. ধর্মপরায়ণতা। তবে তোমরা দ্বীনদার নারী বিবাহ করে সৌভাগ্যশালী হও।"[১৪৭]

অপরদিকে পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যখন এমন পাত্রের জন্য তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ কর, তবে তার নিকট বিবাহ দাও।"[১৪৮]

পাত্র-পাত্রীর এই সব গুণ বিচার-বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দেখে আবার কখনও পাত্র-পাত্রী আবেগের বশবর্তী হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় পরবর্তীতে তা দাম্পত্য কলহের রূপ নেয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনও স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাপন পদ্ধতি ও চিন্তা চেতনার পার্থক্যের কারণেও দাম্পত্য জীবনে কলহ বাঁধে, যা বিবাহ-বিচ্ছেদের রূপ নিতে পারে। এই কারণে মহানবী (সঃ) বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তাগিদ দিয়েছেন।

* বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) ঘৃণ্যতম কাজ

বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তালাক বৈধ ও আবশ্যক হয়ে পড়লেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হালাল কাজসমুহের মধ্যে এটাই ঘৃণ্যতম কাজ। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালাক অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য জিনিস আর একটিও সৃষ্টি করেননি।"[১৪৯]

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ) তালাকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, "তোমরা বিয়ে করো, কিন্তু তালাক দিও না। কেননা তালাক দিলে তার দরুণ আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।"[১৫০] তিনি আরও বলেন, "তোমরা বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সেসব স্ত্রী-পুরুষকে পছন্দ করেন না, যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।"[১৫১]

১৪৬। সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৫ইং), খ ২,পৃ.২৫।
১৪৭। সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-৪৭০০।
১৪৮। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১০০৪।
১৪৯। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং-১৮৬৩।
১৫০। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৭৭।
১৫১। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম কর্তৃক উদ্ধৃত প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

* দাম্পত্য কলহ মিমাংসা

ইসলাম সর্বপ্রথম দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য সকল প্রকার বিরোধ ও মনোমালিন্য শান্তিপূর্ণভাবে বিদুরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিরোধসমুহের মীমাংসা করা সম্ভব-

স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উভয়ের অধিকার ও উভয়ের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধসম্পন্ন হতে নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসুলে কারীমের এ মহামুল্যবান বাণীটি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে,[১৫২] "হুশিয়ার, তোমাদের প্রত্যকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" পুরুষ দায়ী তার পরিবারবর্গের জন্যে। আর সেজন্যে সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। "স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-বাড়ি যাবতীয় আসবাবপত্রের জন্যে এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" বস্তুতঃ এ দায়িত্ববোধ উভয়ের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত থাকলে পারিবারিক জীবনে কখনো ভাঙ্গন বা বিপর্যয় আসতে পারবে না, কখনও তালাকের প্রয়োজন দেখা দেবে না।

দাম্পত্য কলহ মিমাংসার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা এমন দু'জন ব্যক্তিকে মাধ্যম ও সালিশ হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে, যারা কোন কথা বলে, উভয়কে মানাতে পারবে।[১৫৩] এ দুজনকে এ'দের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকেই হতে হবে।

কেননা, নিকটাত্মীয়রাই প্রকৃত অবস্থার গভীরতর রূপের সন্ধান পেতে পারে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে এবং তারা অবশ্যই উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করার জন্যে সর্বাধিক আগ্রহী হয়ে থাকে। [১৫৪]

বাইরের লোক এ মীমাংসা কাজে নিয়োগ না করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আপনজন নিয়োগের নির্দেশ দেয়ার কারণ যে কি, তা আল্লামা আবু বকর আল-জাস্‌সাস-এর নিম্নোক্ত কথা থেকে জানা যায়। তিনি এর কারণ দর্শাতে গিয়ে লিখেছেন– বাইরের অনাত্মীয় লোক বিচারে বসলে তাদের কোন এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ার ধারণা হতে পারে, কিন্তু উভয়েরই আপন আত্মীয় যদি এ মীমাংসার ভার গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলে, তাহলে এ ধরনের কোন ধারণার অবকাশ থাকে না এজন্যেই আত্মীয় ও আপন লোককে এ বিরোধ মীমাংসার ভার দিতে বলা হয়েছে।[১৫৫]

হযরত আলীর খেদমতে এক দম্পতি বহু সংখ্যক লোক সমভিব্যবহারে উপস্থিত হলে তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, তার মীমাংসা চাই। তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, উভয়ের আপন আত্মীয় থেকে এক-একজনকে এ বিরোধ মীমাংসায় নিযুক্ত করে দাও। যখন দু'জন লোককে নিযুক্ত করা হল, তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তোমাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতখানি তা জান? তারপরে তিনি নিজেই বলে দিলেন, "তোমাদের দায়িত্ব হল, তারা দু'জন মিলেমিশে একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি মনে কর যে, তারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে পরস্পরকে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[১৫৬]

১৫২। সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ৪৭৮৯।
১৫৩। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮।
১৫৪। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।
১৫৫। উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।
১৫৬। উদ্ধৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারকদ্বয় সব কথা শুনে, সব অবস্থা জেনে বুঝে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা দেবে ও উভয়কে তা মানবার জন্যে বলবে। কিন্তু যদি তারা উভয় বা একজন তা মানতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্যে নির্দেশ দিতে হবে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দনিচয়ের দৃষ্টিতে বলা যায়, এ দু'জন এক এক পক্ষ থেকে উকিল, আর উকিলের কাজ হল শুধু বলা। কিন্তু সে বলায় যদি বিরোধের চূড়ান্ত অবসান না হয়, তাহলে তারা দু'জনে বিচারকর্তার মর্যাদা নিয়ে রায় মেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেবে। এ নির্দেশ মেনে নিতে উভয়েই বাধ্য। কেননা কুরআন মজিদে তাদের বলা হয়েছে 'হাকিম' হুকুমদাতা, বিচারক, ফয়সালাকারী। ফিকাহ্‌র কিতাবে এ সম্পর্কিত মতভেদ ও প্রত্যেক কথার দলিলের উল্লেখ রয়েছে।

এ ধরনের যাবতীয় চেষ্টা চালানোর পরও মিলেমিশে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবার কোন উপায় না বেরোয়, বরং উভয় পক্ষই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে অনমনীয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইসলাম তাদের দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত অবসান ঘটাবার তালাক দেয়ার- অবকাশ দিয়েছে।

* স্ত্রী-নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা:-

স্ত্রী-নির্যাতন বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যমত কারণ। সহজ-সরল, নির্যাতিতা নারী-স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। ইসলাম স্ত্রীকে নির্যাতন করা হারাম ঘোষণা করে তাদের সাথে সদাচারণের নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম সদাচরণের সাথে বসবাস কর।"[১৫৭] রাসুল (সাঃ) বলছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"[১৫৮]

* স্বামী-স্ত্রীর সজাগ দায়িত্ববোধ ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি:-

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধানতম কারণ হলো– স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করা। স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে–স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করা, ভরণ পোষণ দেয়া, ভাল ব্যবহার করা ইত্যাদি। স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণ করা, স্বামীর প্রতি বিনয়াবনত ও অনুগত থাকা, নিজের সতীত্ব ও স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, পর্দার বিধান মেনে চলা ইত্যাদি।

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিরোধ ও সুখময় দাম্পত্য জীবন গঠনের লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ) স্বামী-স্ত্রীকে তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ করেছেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই পরিচালক ও দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার স্ত্রী-পরিবার পরিজনের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এইজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের পরিচালক ও দায়িত্বশীল । এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।"[১৫৯]

১৫৭। আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, আয়াত নং- ১৯।

১৫৮। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৯৭২৫।

১৫৯। সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-৪৭৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

* জুয়া ও লটারী

জুয়া ও লটারী সামাজিক অনাচার এর একটি মারাত্মক সমস্যা। মানুষ বহুপ্রাচীনকাল থেকে এ পাপাচার ও পাপানুষ্ঠানে আসক্ত হয়ে আছে। সমাজের বহু অন্যায়, অপরাধসহ বিভিন্ন 'সামাজিক অনাচার' এ জুয়ার পাপাচার থেকে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম তাই জুয়াকে চিরতরে নিষিদ্ধ ও হারাম করেছে।

বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের আনাচে-কানাচে, নগরীর চিপাগলিতে, বস্তিতে ও বিভিন্ন মৌসুমী মেলায় জুয়া-লাটারীর জমজমাট আসর সামাজিক অধঃপতনের রোডম্যাপ নির্মাণ করেছে আবহমান কাল থেকে।

জুয়া কি?

জুয়া জঘন্যতম সামাজিক অনাচার। জুয়াকে কুরআন মজিদের ভাষায় মাইসির বলা হয়েছে। মাইসির অর্থ-সহজ উপার্জন। অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অপরকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে জুয়া বলা হয়। জুয়ার মালিকানা বা লাভ ঘটানাক্রমের ওপর নির্ভরশীল। এক ব্যক্তির সম্পদ অন্য ব্যক্তির হস্তগত হওয়ার ভাগ্যক্রমে বা দৈব চক্রের সব কাজই জুয়ার অর্ন্তভুক্ত। এটি শয়তানি কাজ, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও প্রতারণামূলক কাজ।

প্রাক ইসলামী যুগের জুয়া

আরবের জাহিলী যুগের লোকেরা নানাভাবে জুয়া খেলত। যেমন আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলা প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরিক হয়ে একটি উট জবাই করত। কিন্তু সমান অংশে মাংস ভাগ না করে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত থাকত। আর তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। যার নামে যে অংশ বিশিষ্ট শর উঠত সে তত অংশ মাংস পেত। আর যার নামে অংশবিহীন শর ওঠত, সে কিছুই পেতনা। ইসলাম এ ধরনের কাজকে হারাম করা হয়েছে। কেননা এতে প্রকৃত মালিক বঞ্চিত হয়। সূরা মায়িদার পরের আয়াতে বলা হয়েছে-"শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?"[১৬০]

আধুনিক যুগের জুয়া

আধুনিক বিশ্বে নানাভাবে নানা উপায়ে এ জুয়ার আসর জমজমাট করে রেখেছে। বিভিন্ন নামে চলছে জুয়ার আড্ডা। লটারিও এক রকম জুয়া। একে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মানবিক স্বার্থের নামে লটারীকে জায়েয মনে করা কোনক্রমেই সহীহ কাজ হতে পারে না। যারা এ ধরনের কাজের জন্য লটারীকে বৈধ মনে করে, তারা হারাম-নৃত্য ও হারাম শিল্প ইত্যাদির দ্বারা এসব উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করতেও পিছপা হয় না। কিন্তু সুস্থ বিবেকবান মানুষ এটা গ্রহণ করতে পারে না। কেননা, রাসূল (সঃ) বলেন- আল্লাহ পবিত্র-তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। জুয়া যেসব কারণে নিষিদ্ধ লাটারীও সেসব কারণে নিষিদ্ধ। সৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য পবিত্র পন্থা ও উপায় অবলম্বনের জন্য ইসলামের তাগিদ রয়েছে। ইসলাম সব ধরনের জুয়াকে হারাম করেছে।

১৬০। আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৯১

Dhaka University Institutional Repository

জুয়া ও লাটারীর সামাজিক প্রভাব

জুয়া একটি শয়তানি কাজ। জুয়া, মদ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে। জুয়ার দ্বারা একজন লাভবান হয়। অন্যজন হয় নিঃস্ব। ফলে একে অপরের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা সৃষ্টি হয়। জুয়া খেলায় খোদ জুয়ারি ও খেলোয়াড়দের মধ্যে গভীর শত্রুতা ও হিংসা প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে দেয় অতি স্বাভাবিকভাবেই।

মুখের কথায় ও বাহ্যত মনে হবে তারা পরস্পরের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন। কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে জয়ী বিজিতের দন্দ্ব প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে প্রতি মুহূর্তে। আর বিজিত চুপ হয়ে থাকলেও ক্রোধ, আক্রোশ ও ব্যর্থতা প্রতিহিংসায়, সে জ্বলতেই থাকে। কেননা সে বিজিত এবং তার সবকিছু সে খুইয়েছে। আর যদি সে ঝগড়া ও বাকবিতণ্ডা করতে শুরু করে তাহলে তার অন্তরে সেই চাপা ক্ষোভ তাকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

জুয়া হচ্ছে অন্যকে ঠকিয়ে লাভবান হওয়া। আর এতে আসল হকদার তার হক বা অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ লটারীতে যার নামে অংশবিহীন শর ওঠে, সে অংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এতে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়। বস্তুতঃ জুয়া ও লটারী হচ্ছে পরের ধন অপহরণের বাতিল হারাম পন্থা। জুয়া সম্পদ অর্জনের কোন মাধ্যম নয়। এটা বিনা শ্রমে অন্যকে বঞ্চিত করে সম্পদ অর্জনের অপকৌশল মাত্র। কাজেই বন্টনের এ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াটি ন্যায়-নীতিশূণ্য ও নির্যাতনমূলক। মুসলমানের পক্ষে অর্থ উপার্জনে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম ও পথ অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। জুয়া ও লটারী মানুষের মধ্যে ভাগ্য ও ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্খার উপর নির্ভর, তা গ্রহণের প্রবণতা জাগিয়ে তোলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্থ উপার্জনের জন্য যেসব চেষ্টা প্রচেষ্টা, শ্রম ও কার্যকারণ অবলম্বনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ও আদেশ করেছেন, জুয়া তা গ্রহণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না। বরং অন্যায় পথে উদ্বুদ্ধ করে।

জুয়া সকলের জন্যই খারাপ আচরণ বা কার্যক্রম, এতে সংশ্লিষ্ট কোন শ্রেণীর মানুষেরই সামান্যতম কল্যাণ নেই। এজন্য যেসব বস্তু বা কাজ আমাদের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ তা'য়ালা তা আমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর সমাজ জীবনে মানুষের জন্য অকল্যাণকর কার্যাবলী হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। জুয়ার দ্বারা আপাততঃ লাভের বিষয়টি দৃশ্যমান হলেও এর দীর্ঘ মেয়াদী ও সূদুর প্রসারী ফলাফল হচ্ছে একসময় জুয়ারী সর্বশান্ত হয়ে পরে।

জুয়া খেলায় বাজীতে হেরে গেলে বিজিত ব্যক্তি আবার নবোদ্যমে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে শুরু করে। সে গভীরভাবে আশা পোষণ করে যে ইতিপূর্বে সে যা হারিয়েছে তা ফেরৎ পেতেই হবে। এ আকাঙ্খা নিয়ে জুয়া খেলায় গভীরভাবে মশগুল হয়ে পরে। অপরদিকে বিজয়ী ব্যক্তির জিহ্বায় আবারও বিজয়ী হওয়ার লোভে লোলুপ মুখে পানি টসটস করতে থাকে। সে জন্য সে বারবার খেলতে বাধ্য হয়। আরও বেশি বেশি অর্থ লুণ্ঠনের লোভ তাকে অন্ধ ও অপরিণামদশী বানিয়ে দেয়। খেলার ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে। জয়ী বা বিজিত চূড়ান্ত পর্যায়ে এ সময় সর্বস্বান্ত হয়। এ কারণে জুয়া খেলার নেশা যেমন ব্যক্তির জন্য বিপদ ডেকে আনে, তেমনি সমাজেও কঠিন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ নেশা মানুষের শুধু ধন- সম্পদই হরণ করে না, তার জীবনটাও বরবাদ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিনা শ্রমে জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত টাকা পেয়ে তা খরচ করার জন্য জুয়াড়ী নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জুয়াড়ি যেনা-ব্যভিচার ও মাদকাসক্ত হয়। জুয়ার টাকা সংগ্রহের জন্য জুয়াড়ি নানা ফন্দি-ফিকির করে। নিজের সম্পদ নষ্ট করে। অপরের টাকা লুট করে, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি ও সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ে। জুয়াড়ি জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যায়। পরিবার, সমাজ ও জনগণের প্রতি সে থাকে উদাসীন। এ ধরনের লোক নিজের স্বার্থের কাছে নিজের দ্বীন-ধর্ম, ইজ্জত-আবরু ও দেশকে বিক্রি করে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সে তার পরিবার পরিজন, সমাজ, দেশ ও জাতিকেও বিকিয়ে দিতে পারে । তার কাছে কোন কিছুই নিরাপদ নয়।

জুয়া অনেক অপকর্মের জন্ম দেয়। সমাজকে কলুষিত করে । জুয়ার সংক্রমণে সংক্রমিত ব্যক্তি ও সমাজ মানবতার ঘৃণ্য শত্রু। এ জন্য কুরআনে একে শয়তানি কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। জুয়া একটি সামাজিক অনাচার। অনেক পাপাচারের উৎসাহদাতা। জুয়া সংক্রমণ ব্যাধির মত। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ব্যক্তি ও সমাজ সভ্যতা কলুষিত হয় এবং নিঃশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ কারণে ইসলাম জুয়াকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সামাজিক আচার-আচরণে ইবাদাতের প্রভাব

সাধারণ ও বিস্তৃত তাৎপার্যের দৃষ্টিতে আদেশ-নিষেধ সমন্বিত আল্লাহর গোটা দীন পালন করাই ইবাদাত। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথ পালন করা অপরিহার্য। তা'হলেই উবুদিয়াতের তাৎপর্য আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। যে কাজেই মানুষের নৈতিক বা দৈহিক ক্ষতি বা কষ্টের দিক নিহিত, ইসলাম তা নিষেধ করেছে। তা সগীরা হোক, কী কবীরাহ্। এর ফলে আজ পর্যন্ত যত প্রকারের অনাচার জানতে পারা গেছে তা সবই শরীয়তের আওতাভুক্ত। কুরআন মজিদে বর্ণনা ভঙ্গীর স্টাইল হিসেবে গৃহীত বিভিন্ন রূপ ও আঙ্গিকে তা মওজুদ রয়েছে। আর সহীহ হাদীসে কখনও তা এজমালীভাবে দেয়া হয়েছে। আবার কখনও বলা হয়েছে সবিস্তারে।

ইসলামে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা প্রকাশ্য হোক, কি গোপনে। "তোমরা নির্লজ্জতা, নগ্নতা, অশ্লীলতার নিকটেও যেও না- তা প্রকাশ্য হোক, কি গোপনীয়"[১৬১]।

"বল হে নবী! আমার রব্ হারাম করেছেন সমস্ত নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা, তা প্রকাশমান হোক কি গোপন"[১৬২]।

১৬১। আল-কুরআন, -সূরা আন্আম,আয়াত নং ১৫১

১৬২। আল- কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত নং ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

যে কাজ বা কথা জঘন্য, কুৎসিত, নির্লজ্জতাময়, কুরআনের ভাষায় তা-ই (এক বচনে) ফহেশা (আরবহু বচনে) ফাওয়াহিশ। সমাজকে এই নির্লজ্জতা-অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করারও তাকিদ রয়েছে ইসলামে। সমাজের লোকদের চক্ষু ও কর্ণ যাতে করে নির্লজ্জতার শব্দ ও দৃশ্য থেকে রক্ষা পায়, সে জন্য বিশেষ সতর্কতাবলম্বন ইসলামে কাম্য। এই কারণে কুরআনে নির্লজ্জতা অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটনাকে কঠিন অনাচার জনিত কাজ বলে ঘোষিত হয়েছে। "যে সব লোক ঈমানদার লোকদের সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, ব্যাভিচারী প্রকাশিত হোক তা পছন্দ করে, ভালবাসে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে। তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন, তোমরা জানো না"[১৬৩]

* ইসলামের মৌলিক ইবাদাত

ইসলামের চারটি ইবাদাত সর্বজনপরিচিত, মৌলিক এবং ইসলামী জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। সে চারটি ইবাদাত হচ্ছে- সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ। মুলত এর প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া উপস্থাপিত করছে। প্রত্যেকটিরই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সকল প্রকার হীনতা নীচতা থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র অনুগত বান্দাহ্ বানানো।

মানব জীবনকে সকল প্রকার পাপ, নাফরমানি ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করা গেলেই এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। তখন মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবেই সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচারমূলক কাজ থেকে দুরে সরে থাকবে। এই ইবাদাতসমূহের প্রত্যেকটিই মানুষকে সেই লক্ষ্যে প্রস্তুত করে। ইবাদাতসমুহের সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিভাবে সম্ভব হয়, এখানে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

১। সালাত

সালাত মুলতঃ মহান আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাহর এবং বান্দাহর সাথে তার মা'বুদের গভীর পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে, মনে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ভাবধারার সৃষ্টি করে। সালাতে মানবদেহের প্রায় সবকয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবারের সালাত আল্লাহ তা'আলা পূর্ণবয়স্ক সব মানুষের উপর ফরয করেছেন। এরই মাধ্যমে বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুনিয়ার কোন ফিতনাই সে সম্পর্ককে দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। বান্দাহ্ তখন ভুলে যায় না যে, তার উপর আল্লাহর হক সর্বাগ্রে এবং তার ফরমানসমুহ কাজে পরিণত করতেই তার সে অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হতে পারে।

আল্লাহর বান্দাহ্ দিনের সূচনা করে ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে। দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদা দিয়ে তার হামদও সানা পাঠ করে প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর বান্দাহ তার বন্দেগীতে তার হৃদয় যেন স্বচ্ছ ও পবিত্র রয়েছে। এভাবে সে সকল প্রকার পাপ থেকে দুরে থেকে সারাদিন ব্যাপী কার্যকলাপের মধ্যে পবিত্র থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে অতঃপর সে তার নিরলস কর্মতৎপরতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রে একান্তভাবে আল্লাহর বান্দা থাকার জন্য যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অবলম্বনের প্রয়োজন, তা-ই নামাযের মাধ্যমেই সে তা সংগ্রহ করে নেয়। তার কর্মব্যস্ততার মধ্যেই উপস্থিত হয় জোহরের সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় ।

১৬৩। আল-কুআন, সূরা নূর,আয়াত নং ১৯

Dhaka University Institutional Repository

তারপরে আসরের সালাতের সময় ও তার কর্ম ব্যস্ততার একবিন্দুও ভাটা পড়ে না। মাগরিবের সালাতের মাধ্যমে দিনের অবিশ্রান্ত কর্মব্যস্ততার পরিসমাপ্তি ঘটে। মানুষ যেমন ফজরের সালাতে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়েও তার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিনের যাত্রা শুরু করেছিল, ইশা ও বেতরের সালাতে হাজির হয়ে সে সর্বশেষবারের তরে প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর বান্দা হিসেবে দিনের তৎপরতা শুরু করেছিল ও নানা ব্যস্ততায় ডুবে গিয়েছিল, এখনও সে সেই আল্লাহরই একনিষ্ঠ বান্দাই রয়েছে। সারাদিনে বিচিত্র ধরনের কর্মতৎপরতায় মশগুল হয়েও সে আল্লাহর বন্দেগীর সীমালংঘন করেনি। সারাদিনের কোন মূহুর্তেও মহান আল্লাহকে ভূলে না যাওয়াই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বড় সুফল, মহামূল্য প্রাপ্তি। এরূপ অবস্থায় কোনরূপ অনাচারমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না এই কারণে সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষনা হচ্ছে:

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সর্বপ্রকারের নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখে"[১৬৪]।

নবী করীম (সাঃ) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সালাতের উক্ত সুফলের খাত বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার ঘরের সম্মুখে প্রবাহিত ঝর্ণায় প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তা হলে তার দেহে কোনরূপ মলিনতা অবশিষ্ট থাকবে বলে কি তোমরা ধারণা করতে পার?

সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন, ঠিক এমনিভাবেই পাঁচ বারের সালাত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দা যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে থাকে। সালাত মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। সেখানে সে অন্যান্য মুসল্লী মুসলিম ভাই'র সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে। তারা একই কাতারে দাঁড়িয়ে একই ইমামের পিছনে ইকতিদা করে। আল্লাহর ইবাদাত সম্পন্ন করে এবং তা সন্তুষ্টি লাভ করে। প্রত্যেকেই তার অপর ভাইয়ের হাল-অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবহিত লাভ করে। নিয়মিত মসজিদে আসা কোন লোক কখনও অনুপস্থিত হলে তার বিষয়ে খবর জানার তাকিদ লোক অনুভব করে। এভাবেই মুসল্লিদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামষ্টিকতার উদ্রেক ঘটে। ফলে তারা সকলেই প্রত্যেকের পরিপুরক হয় পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তাবোধ সহকারে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। এভাবে দৈহিক ও সামাজিকভাবে পরস্পর নিকটস্থ লোকেরা অন্তরের দিক দিয়ে গভীরভাবে একান্ত হয়ে উঠে, তারা সকলে একই ইমামের পিছনে একই কেবলামুখী হয়ে একই ইবাদাত পালন করে, একই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টিতে পরিণত হয়। এভাবেই মুসলিম উম্মতের একাত্মতা গড়ে তোলা ও পরস্পরের ভাই বানিয়ে দেয়াই আল্লাহর ইচ্ছা ও বাসনা। তাই সব মুমিনরাই পরস্পরের ভাই।

মুসলমান যখন একদিনে পাঁচবারের সালাতের মাধ্যমে অভিন্ন উম্মত হয়ে গড়ে উঠে, তখন তারা পবিত্র হৃদয় নিস্কলুষ ও পবিত্র মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রত্যেক মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে পছন্দ করে নিজের জন্য। আল্লাহকে সে ভয় করতে থাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাই তার পক্ষে কোন অনাচার করা সম্ভব হয় না। কেননা তার অকৃত্রিম বিশ্বাস রয়েছে, অনাচারে জড়িত হলে জাহান্নামে যেতে হবে।

১৬৪। আল-কুরআন, সুরা আনকাবুত, আয়াত নং ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

২। সিয়াম (রোযা)

রমযানের এক মাস সিয়ামের প্রশিক্ষণমূলক অবদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির উপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং রোযাদারকে যাবতীয় নাফরমানিয় কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। অনাচার যে ধরনের ও যে প্রকৃতিরই হোক, তা নফসের, খায়েশ, বাসনা, লোভ ও লালসা থেকেই উৎসারিত হয়। আর তার গোড়াতে তিনটি প্রবল শক্তি-উৎস নিহিত থাকে। প্রথম, লোভ-লালসার শক্তি; দ্বিতীয় যৌন স্পৃহা ও কু-প্রবৃত্তি এবং তৃতীয় হচ্ছে অহমিকতা-দাম্ভিকতাবোধ। সিয়ামের প্রবল প্রশিক্ষণমূলক প্রভাব রয়েছে এই তিনটি শক্তি উৎসের উপর। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র রিয্কসমূহ হালাল করেছেন এবং সকল প্রকার অপচয় অপব্যবহারমুক্ত পানাহারকে মুবাহ ঘোষণা করেছেন। এরশাদ করেছেন– আর খাও, পান কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ তা'আলা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। হে নবী এই লোকদের বল, আল্লাহর সেসব সৌন্দর্য অলংকারকে হারাম করছে, যা আল্লাহর দেয়া পবিত্র জিনিসসমুহকে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই বরং কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে।

মানুষ সাধারণত দিন রাতে তিনবার পানাহারে অভ্যস্ত-সকাল, দুপুর এবং রাতে। আর যখনই পিপাসা লাগে পান করে যখনই ইচ্ছা হয় পানাহার করে। কিন্তু রমযান মাসে এই পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। ছুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তা সবই বন্ধ থাকে। এই সময় ক্ষুধা তাকে যন্ত্রনা দেয়, পিপাসা তার বক্ষদেশ জ্বালায় যদিও তার সম্মুখে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু আহার্য সবই বর্তমান থাকে। আর তার জন্য আল্লাহ তা হালালও করেছেন। কিন্তু সিয়ামের এই সময় সে সেইসব কিছু পান ও গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তার অর্থ, যে আল্লাহ্ তার জন্য এ সব পানাহার হালাল করে দিয়েছেন, এই সময়টায় তারই আদেশে তা থেকে বিরত থেকে মানুষ এই কথাই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, যখন আল্লাহ্ যা করার অনুমতি দান করেন। বছরের বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাসকাল ধরে যে নিজেকে এভাবে চালিত করতে অভ্যস্ত হয়, তার এ অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী বলে পরবর্তী এগারোটি মাস সে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পানাহার ও ধন-মাল থেকে নিজেকে বিরত রাখতে খুবই সাফল্য সহকারে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য বিয়ে ও স্ত্রী সঙ্গম হালাল করেছেন।

অতএব তোমরা স্ত্রী রূপে গ্রহণ কর, দু'জন তিন জন, চারজন যা তোমার ইচ্ছা। আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় হলে মাত্র একজন। ফলে বান্দা দিনে রাতে যখন ইচ্ছা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করতে ও আসল ক্ষেতে বীজ বপন করতে পারে, কোন বাঁধা নিষেধ নেই-কেবলমাত্র স্ত্রীর হায়েয অবস্থা ছাড়া ।

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত সমতুল্য । অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যখন যেভাবে ইচ্ছা"[১৬৫]

কিন্তু রমযান মাসে এই মুসলিম ব্যক্তির জীবনে এই অবাধ স্বাধীনতা সীমিত হয়ে আসে। তখন এই কাজ কেবলমাত্র রাত্রিকালেই সম্পন্ন হতে পারে, দিনের বেলা নয়।

১৬৫। আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত নং ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

রমযানের রাত্রিকালে তোমাদের স্ত্রীদের সহিত যৌন মিলন হালাল ও সঙ্গত ঘোষণা করা হয়েছে। ওরা তোমাদের পোশাক, তোমরা ওদের পোশাক। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন, তোমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস রক্ষা করতে অসমর্থ হচ্ছ। এই কারণে আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করেছেন, ক্ষমা করে দিয়েছেন ইতিপূর্বের ভুল-ত্রুটি। এক্ষণে তোমরা তাদের সহিত (রাত্রিকালে) সঙ্গম করতে পার এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখে দিয়েছেন তার সন্ধান করতে পার"[১৬৬]।

রোযাদার মুসলিম একমাসকাল ধরে দিনের বেলা স্বীয় যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকতে যখন সক্ষম হচ্ছে, অথচ স্ত্রীসঙ্গম তার জন্য সম্পূর্ণ হালাল তখন স্বভাবতই আশা করা যায় যে, বছরের পরবর্তী মাসগুলিতে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গম থেকে সে নিজেকে অশ্লীল, বাজে ও অর্থহীন কথাবার্তা বলা থেকেও বিরত রাখে। এই কাজ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সাধারণভাবে ও হারাম বটে; কিন্তু রমযান মাসে এই গুলির হারাম তো আরও তীব্র ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল ত্যাগ করল না, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করে চলায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী-মুসলিম)।

কুরআনে যদিও অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সকলকেই দেওয়া হয়েছে- যেমন বলা হয়েছে, অন্যায়ের প্রতিফল অনুরূপ অন্যায়ই হয় কিন্তু রোযাদারকে এক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। কারো পক্ষ থেকে অন্যায় হলেই সেও তার জওয়াবে অন্যায় করবে এইরূপ স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়নি। কেহ তাকে গাল-মন্দ বললে সেও অনুরূপ গাল-মন্দ তাকে শুনিয়ে দেবে, তা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে রোযাই তাকে ঢাল স্বরূপ আড়াল করে রাখবে। হাদীসে এই কথাই বলা হয়ছে এই ভাষায়: সওম (রোযা) ঢাল বিশেষ। রোযার দিনে কারোরই স্ত্রীসঙ্গম করা উচিত নয়,

হৈ-হল্লা, চিৎকার ও গোলমাল করা উচিৎ নয়। কেহ যদি তাকে গাল-মন্দ বলে বা তার সহিত মারামারি করতে আসে, তা হলে তার বলা উচিত: আমি একজন রোযাদার ব্যক্তি। বুখারী মুসলিম।

এভাবে একজন লোক যদি সারা মাস ধরে ক্রোশ-আক্রোশ এড়িয়ে চলার অভ্যাস করে, অন্যদের উপর বাড়াবাড়ি করা থেকেও বিরত থাকে, তা হলে পরবর্তী এগারো মাসকাল এই অভ্যাসের শক্তি দিয়ে সকল প্রকার অবাঞ্চিত পরিস্থিতিতে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে-এটাই তো আশা করা যায়।

মানুষের উপর সর্বাধিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটায় মানুষের ইচ্ছাশক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তিই যদি এক মাসকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে সে তার ঈমানী শক্তিকে প্রবল ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির উপর বিজয়ী করে ও তাকে শরীয়তের বিধানের আওতায় নিয়ন্ত্রিত রাখতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যেই রোযার এই সুমহান ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৬৬। আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত নং ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩। যাকাত

যাকাত মুসলিম ব্যক্তির সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ইবাদত। লোভ-লালসা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, ধন-সম্পদের প্রেম-মায়া ইত্যাদি থেকে মানব মনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এই যাকাত। কুরআন মজীদে এরশাদ করা হয়েছে–

"যেসব লোক তাদের মধ্যকার কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তারাই সফলকাম"[১৬৭]।

বহুলোক শুধু ধন-মালের লোভে পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত হয়। একদল অন্য দলের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয় শুধু এই জন্য যে, ওদের আছে, আর এদের নেই। মানুষকে 'আছে ও নেই' এই দুই ভাগে বিভক্ত করে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যাকাত এই সব বিপদ-আপদকে দুর থেকেই প্রতিরোধ করে। যে মুসলিম যথারীতি যাকাত আদায় করে এবং এই যাকাতের সাহায্যে দারিদ্র পীড়িত জনগণকে দারিদ্র্য ও অভাবমুক্ত করেছে, সে কখনও অন্য লোকের ধন-মালকে কোনরূপ মুল্য বা বিনিময় না দিয়ে হরণ করতে পারে না। লোভ-লালসাও কখনও তাকে অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করবে না।

দরিদ্র ব্যক্তি যদি শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে ধন-সম্পদ থেকে নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করে, তখন তার মনে কোন হিংসা-দ্বেষ থাকতে পারে না। 'আছে' ও 'নাই'র মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঠিক তখনই সংঘটিত হয়েছে, যখন 'আছে'রা সব ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে আছে। 'নাই'দের এক পয়সা দিতেও প্রস্তুত হয় না। এরূপ অবস্থায় 'আছে' ও 'নাই'র মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠে।

"যাকাত ভুল বিভক্তিকে মিথ্যা করে দেয়, তেমনি ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার দুরত্ব ও বিভেদ-পার্থক্য চিরতরে শেষ করে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দেয়। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অভাব মোচন করে সচ্ছলতার দিকে যাওয়ার অবাধ সুযোগ করে দেয়। এরূপ সমাজেই মানুষ পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার বন্ধনে বন্দি হতে পারে। কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে– "তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর। তা'ছাড়া তুমি তাদের পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ কর"[১৬৮]।

বস্তুতঃ যাকাতের যে সামষ্টিক ভূমিকা রয়েছে, তাতে দারিদ্রের প্রতিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত মানুষের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে গিয়ে তারা সচ্ছলতার দিক দিয়ে অতি নিকটে এসে যায়। ফলে কোন শ্রেণী পার্থক্য থাকে না যেমন, তেমনি লোকদের অন্তরে নিহিত হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা দূরীভূত হয়। তার দরুন শ্রেনী-সংগ্রামের আগুন কখনই জ্বলে উঠে না। মানুষ পরস্পরের ভাই হয়ে পরম একাত্মতার মধ্যে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। সমাজের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের অভাব মোচনের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হয়। যাকাতের বন্টন খাতসমূহ দেখলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

১৬৭। আল-কুরআন, সূরা তাগাবুন, আয়াত নং ১৬

১৬৮। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, পৃ.৯১

Dhaka University Institutional Repository

"যাকাতের সম্পদ ফকির, মিসকিন, সেই কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের মন রক্ষার প্রয়োজন, যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দি ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্‌র পথে এবং নিঃস্ব পথিকের জন্য - আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞানী"[১৬৯]।

বস্তুত ধনীদের ধন-মালে গরিব-মিসকিনদের হক রয়েছে। এই চেতনাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের প্রাণ-শক্তি। এই চেতনা মুসলমানদের শোষণ-পীড়ণ ও যুলুম সীমা লংঘনের জ্বালায় জর্জরিত করণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে ইসলামী সমাজে এই ধরনের কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পুর্ণ অস্বাভাবিক।

৪। হজ্জ

হজ্জ মুসলিম ব্যক্তির দেহ-আত্মা-হৃদয়-মন সহকারে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে এক মহাযাত্রা। তথায় সে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করে, সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 'সায়ী' করে, মিনা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করে। পালন করে অন্যান্য যাবতীয় জরুরী অনুষ্ঠানাদি। হজ্জের ক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার হজ্জযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট 'মীকাত' থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। তখন সে তার মন ও দেহ - দেহ ও মন উভয়কেই সম্পূর্ণরুপে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে নেয়, পবিত্র থাকে তার মন পরনের দীনাতিদীন ব্যক্তির উপযোগী পোশাক। এভাবে হজ্জ পালন করে সে গুনাহ্ মুক্ত হয়, নিস্পাপ হয়ে যায় মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই।

"হজ্জের সমগ্র সফরে 'তাল্‌বিয়া'-লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা - পাঠ করতে হয়। তা পাঠ করে হজ্জযাত্রী ঘোষণা করে, 'হে রব! আমি তোমার ডাকে হাজির হয়েছি। আমি তোমার নিকটে হাজির হয়ে আছি। বস্তুতঃ হজ্জ একসাথে বিপুল সংখ্যক ইবাদতের সমন্বয়। হাজী যখন বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করে, তখন তার মন সালাতের সেই কিবলার সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়, যে দিকে মুখ করে সে নিজের ঘরে থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। কা'বার তওয়াফকারী সব মানুষ যদিও বিভিন্ন দেশের, বর্ণের, আকার-আকৃতির, পোশাক-পরিচ্ছদের, তবুও তারা এক ও অভিন্ন এই দিক দিয়ে যে, তারা সকলে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার এবং এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের প্রত্যেকের চরমতম লক্ষ্য। এ কারণে তারা এক ও অভিন্ন। এই গোটা অনুষ্ঠানই আর একটা বিরাট ঐতিহাসিক ও দৃষ্টান্তহীন আত্মদানের মর্মস্পর্শী দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে তাদের অন্তর গভীরভাবে ভারাক্রান্ত ও অবনত হয়ে উঠে মহান আল্লাহ্‌র অসীম অনুকম্পায় আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় একটি দিন সে অতিবাহিত করে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি ও দোয়া-প্রার্থনা করে"[১৭০]।

"যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃত ভালো কাজের সুফল সম্মুখে উপস্থিত পাবে। আর যে খারাপ কাজ সে করেছে, সে বিষয়ে তার মনে এই কামনা জাগবে যে, কতই ভালো হতো যদি তার সাথে সে জিনিসের অনেক বেশি দূরত্ব হতো"[১৭১]।

১৬৯। আল-কুরআন, সূরা তাওবা,আয়াত নং ৬০ ।

১৭০। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১৭১। আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ৩০

Dhaka University Institutional Repository

হাজী হজ্জ করে এই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে এবং সেই পাথেয় নিয়ে সে নিজের দেশে ফিরে আসে। এই শক্তিই তার পরবর্তী সমগ্র জীবনে সর্বপ্রকারের পাপ ও অনাচার থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঢালের কাজ করে। এভাবেই মৌলিক এবাদাতসমূহ সমাজ ও ব্যক্তির মন থেকে অনাচার প্রতিরোধে সার্থক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সামাজিক অনাচার দমনে হিযরতের ভূমিকা

'হিজরত' একটি আরবী শব্দ এর অর্থ পরিত্যাগ করা, দেশত্যাগ করা, স্থান পরিবর্তন, একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা। দেশ ও জাতির সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিকসহ সকল কর্মকাণ্ডে অনিয়ম, অবিচার, অত্যাচার, যুলুম, শোষণ পীড়ন নির্যাতন সহ গর্হিত কার্যাবলী যখন ন্যায় ও সত্যের উপর বিজয়ী হওয়ার সম্ভবনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে, আল্লাহর পছন্দনীয় এবং জাতির জন্য কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের অনুকূল পরিবেশের অভাবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের স্থান ত্যাগ করাকে 'হিযরত' বলা হয়। দুনিয়াবী কাজে কোন নারী বা বন্ধুদের অন্তর ভালবাসার টানে দেশ ত্যাগ করলে তাকে 'হিযরত' বলা যাবে না।

হিযরত ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। হিজরতের পদ্ধতি প্রক্রিয়া ও সুফল একটি সম্ভ্রান্ত জাতির জাতীয়তাবোধ, ব্যক্তিত্ব ও পর্যায়ক্রমে তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা মুসলিম জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সামাজিক অন্যায় অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ন্যায়সঙ্গত ফর্মূলা প্রণয়নের লক্ষ্যে নবী রাসুলদের দৈন্যদশা এবং প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগের ইতিহাস চিরশ্বাশ্বত। হযরত মুসা (আঃ), হযরত ইসা (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ) সহ অনেক নবী রাসুলদের শারিরীক মানসিক নির্যাতন বরণসহ প্রতিবাদী চেতনার মূল কারণ ছিল তাদের আবির্ভূত সমাজের চলমান অনাচার, অপসংস্কৃতি সংস্কারের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণময় কোন জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তন । সমাজ থেকে অপরাধজনিত আচরণ বিলুপ্ত করার টার্গেটে নবী রাসুলসহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আবিসিনিয়া হেযাজ ও মদিনায় হিযরতের করুণ ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে সমাজ সংস্কারের চেতনায় জাগ্রত করেছে।

* তৎকালীন সামাজিক অনাচার ও মহানবীর হিযরত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৬১০ খৃঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর জন্মভূমি মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু তাঁর নবুয়তির দায়িত্ব প্রাপ্তির প্রাক্কালে তৎকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সামাজিক অনাচার বা অপরাধের বিন্দুমাত্র অবর্তমান ছিল না তৎকালীন সমাজে। নারী, কন্যাসন্তান, দাস-দাসী নির্যাতন, উৎপীড়নের শ্রেণীতে মহানবীকেও আবদ্ধ করা হল। অন্যায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ইসলামের প্রচারাভিযান ব্যাহত করতে ব্যর্থ হয়ে মহানবীকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ অবস্থায় নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর ৬২২ খৃঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব (মদিনায়) গমন করেন।

"ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনাই মহানবীর 'হিযরত' নামে সু-পরিচিত। ঐতিহাসিক জোসেক হেল বলেন হিযরতই মহানবী (সঃ) এর জীবনের পরিবর্তনকারী সীমা"[১৭২]।

১৭২। অধ্যাপক কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃ.৪২

Dhaka University Institutional Repository

হিযরতের প্রাক্কালে সামাজিক অনাচার

মৌলানা আকরাম খান বলেন, "প্রাক ইসলামী যুগে সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলিন্য প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। এ বংশ মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন লোকদের মধ্যে অহংকার, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ যথেষ্ট রূপে বিদ্যমান ছিল। "নারীর সামাজিক অবস্থান বলতে কিছুই ছিল না"[১৭৩]।

খোদা বক্সের মতে, "আরববাসীরা সূরা, নারী, ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত" নারী ছিল অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভোগের সামগ্রী। পারিবারিক অমর্যাদা ও যথেষ্ট যৌনাচার তখনকার সমাজ জীবনকে কঠিনভাবে কলুষিত করেছিল। বৈবাহিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে সেচ্ছাচারী কামার্ত পূরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত অবৈধ ভাবে"[১৭৪]

একজন পুরুষ যেমন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, তেমনি একজন নারী একাধিক স্বামী বা পুরুষ গ্রহণ করত। বহুপতি গমনের প্রথা পুরুষ প্রধান আরব সমাজে সত্যিই ছিল খুবই ঘৃণ্য। এ ছাড়া পরকিয়া প্রেম, নারীদের সম্পত্তির দাবি থেকে বঞ্চিত, নারীদেরকে খেলার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার, দাস প্রথা, দাসী ভোগের সামগ্রী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা, নৈতিক অবক্ষয়, ব্যভিচার, ঘৃণীত যৌনাচার, কুসীদ প্রথা, জুয়া খেলা, লুটতরাজ, প্রভৃতি গর্হিত কাজ আরব্য সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত ও কর্দমাক্ত করে তুলেছিলো। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হিযরতের মাধ্যমে প্রথমতঃ মদিনায় প্রজাতন্ত্র গঠন, নেতৃত্বদান এবং উপরোক্ত সকল অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে আনসার ও মুজাহিদ সমন্বয়ে মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরব সমাজকে অনাচার মুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

অনাচার দমনে হিজরত সম্পর্কিত হাদিসের ভাষ্য

হিযরত মানে পরিত্যাগ করা। সমাজে চলমান মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে চলা ঈমানী দায়িত্ব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলে পাক (সাঃ) বলেন, "সেই (প্রকৃত) মুহাজির যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করেছেন"।[১৭৫]

আলোচ্য হাদিসে মুহাজিরের স্বরূপও পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে-ই প্রকৃত মুহাজির যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিষ পরিত্যাগ করে। হিজরত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ করা। এক ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন থেকে তার হিযরতের কাজ শুরু হয়। প্রথমে তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে ইসলামের বিপরীত আকীদা-বিশ্বাসসমূহ বহিস্কৃত করে, এটা তার প্রথম হিজরত। দ্বিতীয় পর্যায় সে আল্লাহর যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে, হারাম জিনিষ ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সকল নিষিদ্ধ জিনিষ ও কাজ পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র অপরিহার্য। তৃতীয় পর্যায়ে সে এদিকে মনোনিবেশ করে।

১৭৩। অধ্যাপক কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১।

১৭৪। অধ্যাপক কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

১৭৫। মহিউস সুন্নাহ্ বাগবীহ (রহঃ), মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করতে চায়; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা এদিক দিয়ে যদি চরম নৈরাশ্যজনক মনে হয় তখন সে নিরূপায় হয়ে সমাজ ও দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। প্রচলিত ভাষায় একেই বলা হয় 'হিজরত'। কিন্তু আলোচ্য হাদিস হতে জানা গেল যে দেশ বা সমাজ ত্যাগ করাই আসল ও একমাত্র হিযরত নয়। হিযরতের আসল অর্থ ত্যাগ করা আর সমাজ ও দেশ ত্যাগ করা এর চুড়ান্ত পর্যায় ও সর্ব শেষ উপায়।

হিযরত ও জিহাদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জিহাদ হল হিজরতের বাস্তব রূপ। জিহাদের মত হিযরতকেও হাদিস বিশারদ আল্লামা মুহীউসসুন্নাহ বাগবী (রহঃ) দুই ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ প্রকাশ্য হিযরত, অর্থাৎ যেখানে মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের দৈনন্দিন আচার আচরণ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড সমাজকে বসবাসের অনুপোযোগী করে তুলে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থার অস্থিত্ব প্রায় বিপন্ন করে ফেলে সে সমাজ ত্যাগ করে অনুকূল পরিবেশে বা নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকারের হিযরত হল বাতিনী বা অপ্রকাশ্য হিযরত। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসুল কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলী পরিত্যাগ করে চলা। প্রকাশ্য হিযরতের তুলনায় অপ্রকাশ্য হিযরত খুব কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। কারণ এ ধরনের হিযরত হচ্ছে নফসের সাথে জিহাদ বা যুদ্ধ করা। সমাজের অপরাধজনিত আচরণগুলো নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির কারণেই ঘটে থাকে । ভাল এবং মন্দ দু'টি বৃত্তি মানুষের একান্তই সহজাত প্রবৃত্তির খারাপ দিকগুলো অন্তর থেকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে প্রথম ও প্রধান হিজরত। কাজেই বিবেক দিয়ে আত্মা ও মনের মধ্যে বিরাজমান ও লালিত অনাচারগুলো গোপন হিযরতের মাধ্যমে প্রথমে প্রত্যাখান করতে হবে এবং অন্য জনের মন থেকেও পরিত্যাগ করানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে হিজরতের কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

43677

সামাজিক অনাচার দমনে জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদ ইসলামের একটি মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য সম্ভারে এর উল্লেখ রয়েছে ব্যাপকভাবে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মুয়ায ইবনে জাবালের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল সালাত আর সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ" [আহমাদ, তিরমীযী] জিহাদ ব্যতীত ইসলামের পূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জিহাদ দ্বীন ইসলামের প্রাক শক্তি। ইসলামী জীবন বিধান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল ছিন্ন করার অন্যতম হাতিয়ার জিহাদ। সমাজের বঞ্চিত নিপীড়িত, নির্যাতিত, বিপন্ন মানবতার সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে ও মুক্তি সাধনে জিহাদের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে সমাজের লম্পট দুস্কৃতিকারী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ঘুষখোর, সুদখোর, মদ্যপায়ী, ব্যাভিচারী, দূর্নীতিবাজসহ ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের কঠিন হস্তে দমন করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে আসছে জিহাদ।

জিহাদের সংজ্ঞা

জিহাদ শব্দটি 'জুহ্দুন' শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হল কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ করা ও চুড়ান্ত চেষ্টা সাধণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ সমাজের অন্যায় অবিচার পাপ পঙ্কিলতার মূলোৎপাটন, শক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনার পছন্দনীয়, সমাজের সর্বস্তরের জনতার উপকারী মতাদর্শ তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে কাফের, শয়তানের বিরুদ্ধে আর্থিক, মানসিক, কায়িকসহ সার্বিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াই জিহাদ। সামাজিক অনাচার দমনে এ জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবতা রক্ষায় জিহাদ

ইসলাম মানবতার বিবেক বুদ্ধির স্বাধীনতা এবং মানবের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দেয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের বুকে শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রবর্তন করা এবং সকল প্রকার শোষণ, জুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাস, ফেতনা-ফাসাদসহ বিভিন্ন সামাজিক অনাচার দমন ও বন্ধ করা, ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নে জিহাদের গুরুত্ব অপরিহার্য।

সামাজিক অনাচারের প্রভাবে সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, অনাহার, অশিক্ষা, অপসংস্কৃতির পিছনে সামাজিক অনাচারগুলো দূর্নীতিবাজদের মধ্য দিয়েই সমাজদেহে অনাচার নামক ঘাতক ব্যাধি হিসেবে লালিত পালিত হচ্ছে। প্রভাবশালী মহলের নিত্য সঙ্গী সামাজিক অনাচারকে প্রতিরোধ ও দমন করার মহৌষধ হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট প্রেসক্রিপশন হচ্ছে জিহাদ। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার বৈধতা প্রদান করেছেন।

বহুরূপী সন্ত্রাস ও জিহাদ

সামাজিক অনাচারসমূহের মধ্যে সন্ত্রাস অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অনাচার। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নারী নির্যাতন, লুটতরাজ, মাদকাসক্তি, ডাকাতি, ছিনতাই, পাচার, অহেতুক হত্যাসহ আরও অনেক অনাচারের জনক। তেমনি পরনিন্দা, মিথ্যাচার, মিথ্যা অপবাদ, ঘুষ, উপঢৌকন, আদিম আদালতের দূর্নীতি ও সহমর্মিতার ঘাটতির কারণে ও সন্ত্রাসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এজন্য সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়েও জঘন্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আল-কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শ তো বটেই, ইতিহাসও বার বার এ সাক্ষ্য দিচ্ছে, সন্ত্রাস ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। যারা এই অপবাদে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে অভিযুক্ত ও ক্ষত- বিক্ষত করতে চায়, কথাটা তারাও জানে। কিন্তু জানলে কী হবে, তারা যেহেতু একটি গর্হিত ও ভয়ানক অসদুদ্দেশ্য দ্বারা চালিত, মিথ্যা জেনেও দুর্বার উৎসাহ নিয়ে তারা ইসলামকে সন্ত্রাসের পরিচ্ছদে বিশ্বসমক্ষে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান করতে চায় এবং এই লক্ষ্যেই তারা তাদের শক্তি ও পরিকল্পনা আজ একত্রিত করেছে।

রাসুল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তৎপরবর্তীকালেও সংঘটিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু লড়াইয়ের কথা আমরা জানি, কিন্তু কোথাও একটিবারের জন্য কখনো কোন সন্ত্রাসের সাক্ষাৎ মেলে না। আসলে মিলবে কী করে? পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।"[১৭৬]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, "যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।"[১৭৭]

আবার আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষন ও বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধীবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে"[১৭৮]।

গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ' ও কেতাল তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজিদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা হয়। রবী ইবনে-আনাস (রাঃ)- এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত ১৯১ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইসলামে জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়

আল্লাহপাক আরও বলেন, তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো, যদিও এ তোমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য ভাল। আর তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না"[১৭৯]

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় ও আল্লাহর ধর্ম সামগ্রীকররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে নিশ্চিত আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন।"[১৮০]

১৭৬। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৯১।
১৭৭। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ২০৫।
১৭৮। আল কুরআন,সূরা বাকারা, আয়াত নং ২১৭।
১৭৯। আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং ২১৬।
১৮০। আল-কুরআন,সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

"অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলা কর তখন তাদের ঘাড়ে- গর্দানে আঘাত কর। শেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবে তখন ওদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। তখন তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের মুক্ত করে দিতে পার বা মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দিতে পার। যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র সংবরণ করে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এ-ই বিধান।"[১৮১]

উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, আল্লাহর মনোনীত ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ফিতনা বা সন্ত্রাস দূর করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যই জিহাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নিরিখে জিহাদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রকাশ্য জিহাদ– যে জিহাদ অন্যায় অপরাধ ও অনাচারের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয়। জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

হে নবী! আপনি কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন এবং তাদের ব্যাপারে বজ্রকঠোর হোন"[১৮২] মানুষের মনের জগতে এক সীমাহীন অপ্রকাশ্য যুদ্ধ ময়দান বানিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিবেকের সাথে ন্যায়-অন্যায় উচিত্য-অনুচিত্য, ভাল-মন্দ বিবিধ বিষয়ে এ মাঠে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা চর্মচক্ষে দেখা যায় না। অপ্রকাশ্য চরম দুশমন হচ্ছে ইবলিস ও নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তি, যা মানুষকে সুপথ সুকৃতি হতে কুপথ ও বিকৃতির দিকে এবং ঈমান ও ইসলাম হতে গোমরাহী ও খোদাদ্রোহীতার দিকে পরিচালিত করে থাকে।

ক-প্রবৃত্তি কু-প্ররোচনার কাঁধে ভর করেই মদ্যপান, জুয়া খেলা, লটারী খেলা, এসিড নিক্ষেপ ধর্ষণ, ব্যভিচার সমাজে গাণিতিক হারে ছড়ায়। সমাজের এ সকল নিষিদ্ধ গর্হিত কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে 'নফসে আম্মারা' নামক এক দূর্জয় অপ্রকাশ্য শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই নফ্স বা কুপ্রবৃত্তি ইবলিসের বিরুদ্ধে চিরন্তন লড়াইকে বলা হয় বাতিনী জিহাদ, অপ্রকাশ্য যুদ্ধ বা জিহাদে আকবর।

মানুষের জীবনে বাতিনী জিহাদ হচ্ছে বৃহত্তম জিহাদ। ইসলামের পরিভাষায় এ জিহাদকে জিহাদে আকবর বলা হয়ে থাকে। মানুষের কু-রিপু তথা কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহ, ইত্যাদি মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে সমাজে অপরাধজনিত আচরণে প্রলুব্ধ করে। তাই সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা সামাজিক অনাচার থেকে মুক্ত থাকতে হলে প্রতিনিয়ত মনের ও বিবেকের সাথে বিরামহীন সংগ্রাম করে থাকতে হয়।

এ কারণেই মানুষের এ মানুষিক সংগ্রামকে বৃহত্তর জিহাদ বা জিহাদে আকবর বলা হয়ে থাকে। একবার একদল মুজাহিদ প্রকাশ্য জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করলে প্রিয়নবী (সঃ) তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তোমরা ক্ষুদ্রতর জিহাদ থেকে বৃহত্তর জিহাদের দিকে পদার্পন করলে, জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহ রাসুল বৃহত্তম জিহাদ কি? মহানবী (দঃ) বললেন, নফ্স বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল বৃহত্তম জিহাদ" বায়হাকী।

১৮১। আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ,আয়াত নং ৪।

১৮২। আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াতন নং ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সময় ও কালের পরিবর্তনে সামাজিক অনাচারের রূপ পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ, প্রতিকার বা দমনের সার্থক পদক্ষেপ আজো গৃহিত হয়নি। ফেতনা ফাসাদ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে জিহাদ বা যুদ্ধ বিগ্রহের স্বরূপ, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। ইসলামের প্রথমিক যুগে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমানে অপরাধ জগতে প্রতিবাদ বা জিহাদের প্রক্রিয়া ভিন্ন রকম। তবে জিহাদের গুরুত্ব বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পূর্বের তুলনায় মোটেই কম নয়। সমাজ থেকে অনাচারের বিরুদ্ধে জিহাদে গমনের নির্দেশ আজীবন-ই কার্যকর থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আমিন এরশাদ করেন, "যুদ্ধের উপকরণ তোমাদের অল্প হোক কিংবা অধিক হোক তোমরা সশস্ত্র সংগ্রামে বের হও এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর"[১৮৩]

মানুষের দর্শন, চিন্তা-চেতনা ও সহজাত প্রবণতার মধ্যেই অনাচার নামক দূরারোগ্য ব্যাধি স্বযত্নে লালিত পালিত হচ্ছে। অবস্থা ও সময়ের পরিবর্তনে অনাচারের রূপান্তর হলেও সার্থকভাবে সমাজ থেকে এর প্রতিরোধ তরান্বিতকরণে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ।

১৮৩। আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত নং-৪১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের চলমান অনাচারসমূহ: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সামাজিক পরিমণ্ডলে 'সামাজিক অনাচার' এর ব্যাপকতা যে সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে, এ বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 'সামাজিক আনাচার' প্রতিরোধ ও দমনের কৌশল হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রতিবাদ ও শুপারিশমালার সূর ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়তই। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় উচ্ছেদের বিষয় তো পরের কথা এদেশের 'সামাজিক অনাচার' হ্রাসের কোন লক্ষণ আজও লক্ষ্য করা যায় না। নিযার্তনের শিকার নারী, দুর্নীতির গ্রাসে নিমজ্জিত প্রায় সর্বস্তরের মানুষ। সুদ-ঘুষ, কালোবাজারি, সন্ত্রাস, পাচার, মাদকাসক্তি, লটারী-জুয়া প্রতারনা প্রবঞ্চনা বাঙালী সমাজে প্রাত্যহিক খবরের কাগজের প্রধান বিষয়বস্তু। আলোচনা-পর্যালোচনা প্রতিকার প্রতিরোধের যথার্থ উপায় উদঘাটন করে সামাজিক অনাচারের বিশ্লেষধণাত্মক তালিকা ও সমীক্ষার চিত্র তূলে ধরা একান্ত দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও শিশু পরিস্থিতি

নারী ও শিশু শব্দ দু'টি পারিবারিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহুল পরিচিত ও ব্যাপক আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও শিশুদের করুণ পরিস্থিতির জন্য যুগ যুগ ধরে নারী-পুরুষ যৌথভাবে সংগ্রাম করে গেলেও নারী শিশুদের জীবন থেকে নির্যাতন নামক আতঙ্কিত শব্দের পরিবর্তন ও প্রতিরোধ ঘটেনি। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়। প্রাচীণ আরবে শিশু-কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া, ইউরোপে বুদ্ধিমতী নারীদের ডাইনি বলে পুড়িয়ে হত্যা করা, ভারতে সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা প্রভৃতিরূপে নারীকে নির্যাতন করা হত। বর্তমানে এ নির্যাতনের ধরণ পাল্টেছে। কিন্তু একে বিংশ শতাব্দীতে এসে নারী ও শিশু নির্যাতন যে রূপ ধারণ করেছে তা আরও বেশি ভয়াবহতা নিয়ে পিছনের সকল ভয়াবহতাকে অতিক্রম করে ফেলেছে। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় নারী শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নারী শিশুর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতনের বিষয়টিকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) অনুযায়ী নারীর প্রতি সহিংসতা হল-নারী শিশুকে শারিরীক, মানসিক উত্তেজিতভাবে বেদনার্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও দূর্ভোগের ভাগীদার করে এমনকিছু আচরণ বা ভীতিপ্রদর্শন হুমকি ও বলপ্রয়োগ যা তাদের স্বাধীন কাজকর্ম, চলাফেরা ও মানসিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

১। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন

দেশে নারী নির্যাতনের একটি ভয়ঙ্কর রূপ হলো– ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন। আইনে নির্যাতনের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োগের অভাব দেশে যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অনাচার বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নারীর সামাজিক গতিশীলতায় এই অপরাধ প্রবণতা একটি ভয়ের আবহ তৈরি করেছে। এদেশের সামাজিক মর্যাদার মালিকানা একমাত্রই পুরুষদের। ইট, কাঠ, পাথরের মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ও ভোগ্য পণ্যের উপরে নারীদের অবস্থান দেবার সম্ভাবনা এ সমাজে অশোভনীয়। পুরুষ কর্তৃক বল প্রয়োগে নারী সঙ্গম শুধুমাত্র এক ধরনের ধর্ষণ" [১]।

কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে নিম্নোক্ত যে কোনোভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে আইনের ভাষায় ধর্ষণ বলা হবে-

- ❖ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা নারীর সম্মতি ছাড়া;
- ❖ মৃত্যু অথবা শারীরিক আঘাতের ভয় দেখিয়ে নারীকে সম্মতি দিতে বাধ্য করা;
- ❖ ভুল ধারণাবশতঃ কোনো নারী যদি উক্ত পুরুষকে স্বামী মনে করে সহবাসের অনুমতি দেয় বা পুরুষটি সত্য গোপন করে;
- ❖ সুযোগ নেয়া;
- ❖ ১৬ বছরের কম বয়সী কোনো নারীর সঙ্গে তার অনিচ্ছায় অথবা ইচ্ছায় যৌন সম্পর্ক তৈরি করলে তাকে ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে।" [২]

"ধর্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজে উচু থেকে নিচু সর্বস্তরেই নারীরা এর শিকার হচ্ছে। একইভাবে গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তবে, তুলনামূলকভাবে গ্রামের নারীরা বেশি মাত্রায় শিকার হচ্ছে।

১। হুমায়ুন আজাদ, নারীর সামাজিক অবস্থা, পৃ. ৯১।

২। সুলতানা কামাল, আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র জুন ১৯৯৮, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ নারীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। যেমন ঘরে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ধর্ষণ করা, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করা। গ্রাম ছেড়ে শহরে চাকরি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে ধর্ষণ করা, রাস্তাঘাটে একা পেয়ে ধর্ষণ করা, রাতের আঁধারে ঘর থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হওয়া নারীদের ধর্ষণ করা"[৩]।

২০০৬ইং সালে সারা দেশে মোট ৯০৭ জন নারী ধর্ষণের শিকার হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মোট ২৬৫ জন নারী গণধর্ষণের শিকার। এ সময়ে ধর্ষিতা নারীর মধ্যে ২৮৭ জনই রাজশাহী বিভাগের।

ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন চিত্র (বিভাগ অনুসারে)
জানুয়ারী-ডিসেম্বর-২০০৬ইং

বিভাগের নাম	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	আহত	মামলা	রায়	গ্রেপ্তার	ইতিবাচক সংবাদ	নেতিবাচক সংবাদ
ঢাকা	২১৫	১৯৪	১৩৮	৮৪	১৮	৯০	২১	১৯৪
রাজশাহী	৩১৬	২৮৭	২২১	১২১	২৪	৬২	২৫	২৯১
খুলনা	২৬০	২৩৪	১২৫	১০২	১৮	৬৪	১৮	২৪২
চট্টগ্রাম	৯৬	৯৩	৭১	৩৯	৩	৪২	৫	৯১
সিলেট	৩৪	২৯	২৫	১৭	৫	১৫	৪	৩০
বরিশাল	৮৭	৭০	৪৩	২৮	৯	১২	১০	৭৭
মোট	১০০৮	৯০৭	৬২৩	৩৯১	৭৭	২৮৫	৮৩	৯২৫

তথ্যসূত্র: ২০০৬ সনের প্রায় সকল দৈনিক ও আঞ্চলিক সংবাদ পত্র।

উপরোক্ত তথ্যসূত্রে দেখা যায় যে, সারা দেশে এ সময়ে মোট ধর্ষণের শিকার ৯০৭ জন নারীর মধ্যে আহত হয়েছেন ৬২৩ জন। ধর্ষণের এই ঘটনাগুলোর বিপরীতে মামলা হয়েছে ৩৯১টি এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৮৫ জন অভিযুক্তকে। পূর্বের মামলার রায় হয়েছে ৭৭টি, যার প্রত্যেকটিতেই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। এ সময়ে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন রাজশাহী বিভাগের নীলফামারী জেলায় ৩৮ জন নারী। এছাড়া যশোর জেলায় ৩৭ জন নারী এবং ঢাকা জেলায় ৩৬ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। মাস অনুসারে ধর্ষণের ক্ষেত্রে মে মাসে সবচেয়ে বেশি ১০৫ জন নারী ধর্ষণের শিকার হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। এছাড়া মার্চ মাসে ১০১টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে কম ধর্ষণের শিকার হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে অক্টোবর মাসে ৬৪টি।

"বিধবা নারী, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, গার্মেন্টস কর্মী ও অবিবাহিত তরুনীরাই বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তবে বিবাহিত নারীরাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। নারীরা এলাকার সন্ত্রাসী অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিবেশী, বাড়িওয়ালা, গৃহকর্তা, ডাক্তার, দোকানদার, দর্জি, অফিসের বস, সহকর্মী, বন্ধু, প্রেমিক, বান্ধবীর স্বামী, শিক্ষক এবং ভণ্ড পীরদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আরও দেখা যায়, নারীদের একান্ত নিকট আত্মীয়, যাদের উপর তারা ভরসা করেন তারাই তাকে ধর্ষণ করছে।

৩। দীপংকর মোহান্ত, লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ: পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এই তালিকায় আছে খালাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচা, মামা, ফুফা, শ্বশুর, দেবর, ভাসুর এবং স্বামী। আরও দেখা যায় ধর্ষণ শেষে নারীদের উপর আরও নানা ধরণের নির্যাতন চালানো হয়। যেমন-শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা, যৌনাঙ্গে আঘাত করা, হাত পা কেটে নেয়া বা চিরে দেয়া, চুল কেটে দেয়া, এসিড নিক্ষেপ করা, শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয়া এমনকি সব শেষে হত্যা পর্যন্ত করা হয়ে থাকে"[৪]।

ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক বল প্রয়োগে নারী সঙ্গম। বল প্রয়োগে সঙ্গম হচ্ছে, সে সঙ্গম যাতে নারীর স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন সম্মতি নেই। এতে সব সময় বল প্রয়োগের দরকার হয় না। ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ যা নারীকে তার সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার দেয় না"[৫]।

ধর্ষণের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- ধর্ষণের শিকার হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর নারীরা। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটছে। ধর্ষণের শিকার নারীরা হলেন- প্রতিবন্ধী, বিধবা, দুস্থ, স্বামীবিচ্ছিন্ন, গৃহপরিচারিকা, গার্মেন্টসকর্মী, যৌনকর্মী, সন্ত্রাসী কাজে নিযুক্ত নারী, ইউপি মহিলা মেম্বার ও আদিবাসী নারী।

- ধর্ষণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতরা হলো- স্বামী, শ্বশুর, চাচাশ্বশুর, দেবর, ভাসুর, দাদা, প্রতিবেশী, পুলিশ, শিক্ষক, ডাক্তার, বেকার যুবক, উঠতি বয়সের যুবক, এলাকার মাস্তান, ডাকাত, সন্ত্রাসী, চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, গ্রামের মাতব্বর, প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রভাবশালী ব্যাক্তির সন্তান, কারখানার মালিক, গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা, বন্ধু, প্রেমিক, সহকর্মী ও ভন্ডপীর।

- ধর্ষণের পর চুল, হাত, কান, নাক, আঙ্গুল, স্তন কেটে দেয়া, চোখ উপড়ে ফেলা, এসিড নিক্ষেপ করা সহ নানাভাবে নির্যাতন করছে। ধর্ষণের পর ধর্ষিতার নগ্ন ছবি তুলে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার নারীকে একঘরে করা ও অন্যায়ভাবে ফতোয়া জারি করার ঘটনাও ঘটেছে। ঘটনা প্রকাশ হলে পুনরায় ধর্ষণ, হত্যার হুমকি দেয়া হয়। ধর্ষণের পর ধর্ষিতাকে পতিতাপল্লীতে বিক্রি করা, পাচার করার ঘটনাও ঘটছে।

- ধর্ষণের ক্ষেত্রে সালিশ আইনত নিষিদ্ধ হলেও অনেক ধর্ষণের ঘটনাই সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সালিশের আয়োজক সব সময়েই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে গ্রামের মেম্বার, চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। সালিশের রায়গুলো হয়েছে এ রকম: ধর্ষকের সঙ্গে নির্যাতিতার বিয়ের আয়োজন করা, ধর্ষককে কান ধরে উঠবস ও জুতোপেটা করে ছেড়ে দেয়া কিছু টাকা জরিমানা দিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেয়া, সালিশের নামে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি করার পর প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেলে কিছুই না দেয়া।

- বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে, গ্রাম ছেড়ে শহরে চাকরি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে, রাস্তাঘাটে একা পেয়ে, রাতের আঁধারে ঘর থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলে, ঘরে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে, অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে, ডাক্তার দেখাতে এসে নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।

---

৪. সংবাদ পত্র পরিবীক্ষণ-২০০৬, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত: পৃ. ২২।

৫. হুমায়ুন আজাদ, নারী (সারে চার বছর নিষিদ্ধ থাকার পর প্রকাশিত) পৃ. ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

- ধর্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ঐ নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তাকে বিয়ে না করা এবং সন্তানের পিতৃপরিচয় না দেয়া। দেখা যায় ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী সন্তানের পরিচয় নিয়ে অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

- এ সময়ে আইনশৃঙ্খলাকর্মী তথা পুলিশ কর্তৃক নারীধর্ষণের শিকার হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

- ধর্ষণের ঘটনায় যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলো: জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে, প্রতিপক্ষের বউ, মা, বোন বা নিকটাত্মীয়কে ধর্ষণ করে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা, কুপ্রস্তাবে রাজি করতে না পেরে, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, বিয়ে করতে না পেরে, প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য ধর্ষণকে পন্থা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

- ধর্ষণের পর থানায় মামলা না নেয়া, প্রভাবশালী মহলের চাপ, পারিবারিক চাপ, লোকলজ্জা প্রভৃতি কারণে সালিশের মাধ্যমে ঘটনা নিষ্পত্তি করা হয়।

- ধর্ষণের ক্ষেত্রে মামলা কম হওয়ার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: লোকলজ্জা এবং সামাজিকভাবে মর্যাদাহানির ভয়ে নির্যাতিতা মামলা করতে চায় না, গ্রাম্য সালিশে ধর্ষণের বিচার করা হবে এই আশ্বাসে ধর্ষিতাকে মামলা করতে দেয়া হয় না, অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হওয়ার কারণে নির্যাতিতার পরিবারকে মামলা না করার হুমকি, ধর্ষণ হওয়ার পরপরই মেডিক্যাল পরীক্ষা না করানোর ফলে ধর্ষণের সব চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায় থানা মামলা নেয় না।

- ধর্ষণের ক্ষেত্রে রায় কম হওয়ার পেছনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: মামলা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না হওয়া, চার্জশিট দাখিলে দীর্ঘ সূত্রিতা, যথাযথ প্রমাণ ও সাক্ষীর অভাব, অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করতে না পারা, মামলা চলাকালীন মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদানকারী ডাক্তারদের অনুপস্থিতি, আক্রান্ত পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে অর্থের বিনিময়ে আপস করে ফেলা ইত্যাদি।

এক নজরে বয়স ভিত্তিক ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন তথ্য
জানুয়ারী-ডিসেম্বর-২০০৪ খ্রি.

বয়স / ধর্ষণের ধরণ	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখনাই	মোট	হত্যা	আত্ম হত্যা	গৃহীত পদক্ষেপ		
											মামলা	শালিশ	নিজ হেফাজত
ধর্ষণে চেষ্টা	০৪	০৬	১২	০৫	০৪	০১	৬৮	১০০	০৩	০১	৪০	০৬	-
একক ধর্ষণ	৫০	৮৪	৬৬	২০	০৯	১৫	১৯৪	৪৩৮	০৬	১১	১৮৪	২৮	০৪
গণধর্ষণ	০২	২০	৭৩	২৩	২২	১২	২০৭	৩৫৯	৪৫	০৫	২০০	০৫	০৪
ধর্ষণের ধরণ উল্লেখ নেই	-	০২	১০	০২	০৫	০৫	৫৬	৮০	৭১	-	১৯	-	-
মোট	৫৬	১১২	১৬১	৫০	৪০	৩৩	৫২৫	৯৭৭	১২৫	১৭	৪৪৩	৩৯	০৪

তথ্য সংরক্ষন ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

Dhaka University Institutional Repository

২০০৪ সনের বয়স ভিত্তিক ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের পরিসংখ্যানে প্রতীয়মান হয় যে, বয়স উল্লেখ নাই এমন ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ৫২৫ জন, ৬ বছরের কন্যা শিশু ৫৬ জন, ৭-১২ বছরের ১১২ জন, ১৩-১৮ বছরের ১৬১ জন, ১৯-২৪ বছরের ৫০ জন, ২৫-৩০ বছরের ৪০ জন, ৩০ বছরের উর্দ্ধে ৩৩ জন সহ মোট ৯৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের ধর্ষণের মধ্যে একক ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৪৩৮ জন।

এক নজরে বয়স ভিত্তিক ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন তথ্য

জানুয়ারী-ডিসেম্বর-২০০৫ইং

বয়স / ধর্ষণের ধরণ	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখনাই	মোট	হত্যা	আত্ম হত্যা	গৃহীত পদক্ষেপ		
											মামলা	শালিশ	নিজ হেফাজত
ধর্ষণে চেষ্টা	০৩	০৭	১১	০৫	০৭	০২	৮১	১১৬	০৪	০৪	২৮	০৬	-
একক ধর্ষণ	৫৪	৭৮	৭৩	১৬	১০	০৫	১৬৬	৪০২	১৮	০৮	১৭১	৩৯	০৩
গণধর্ষণ	-	১৪	৪১	২২	১৯	০৬	১৪৮	২৫০	২৭	০২	১১২	০৬	০২
ধর্ষণের ধরণ উল্লেখ নেই	-	০১	০৪	০৯	০৬	০২	৪৫	৬৭	৬৪	-	২৩	-	-
মোট	৫৭	১০০	১২৯	৫২	৪২	১৫	৪৪০	৮৩৫	১১৩	১৪	৩৩৪	৫১	০৫

তথ্য সংরক্ষন ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

২০০৫ সনের বয়স ভিত্তিক ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের পরিসংখ্যানে প্রতীয়মান হয় যে, বয়স উল্লেখ নাই এমন ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ৪৪০ জন, ৬ বছরের কন্যা শিশু ৫৭ জন, ৭-১২ বছরের ১০০ জন, ১৩-১৮ বছরের ১২৯ জন, ১৯-২৪ বছরের ৫২ জন, ২৫-৩০ বছরের ৪২ জন, ৩০ বছরের উর্দ্ধে ১৫জন সহ মোট ৮৩৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের ধর্ষণের মধ্যে একক ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৪০২ জন।

নোট: ২ জন নারী, আনসার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

৪ জন নারী, পুলিশ এবং ১ জন নারী সেনা সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টা।

৯ জন নারী, পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

১ জন নারী, সেনা সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

১ জন নারী, আনসার কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছে।

এক নজরে বয়সভিত্তিক ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন তথ্য

জানুয়ারী-ডিসেম্বর-২০০৬ খ্রি.

বয়স / ধর্ষণের ধরণ	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখনাই	মোট	হত্যা	আত্ম হত্যা	গৃহীত পদক্ষেপ		
											মামলা	শালিশ	নিজ হেফাজত
ধর্ষণে চেষ্টা	০৩	১০	১২	১০	০৯	০৭	৮২	১৩৩	০৫	০৬	৩১	০৮	-
একক ধর্ষণ	৫৫	৮০	৭৫	২০	১৫	০৫	১৬৮	৪১৮	১৮	০৮	১৭২	৪২	০৩
গণধর্ষণ	-	১৪	৪৬	২৭	২৪	০৯	১৫২	২৭২	২৮	০৫	১১৪	১৪	০৪
ধর্ষণের ধরণ উল্লেখ নেই	-	০২	০৬	১৩	০৯	০৫	৪৯	৮৪	৬৮	-	২৫	-	-
মোট	৫৮	১০৬	১৩৯	৭০	৫৭	২৬	৪৫১	৯০৭	১১৯	১৯	৩৪২	৬৪	০৭

তথ্য সূত্র: তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সনের বয়সভিত্তিক ধর্ষণ যৌন নির্যাতনের পরিসংখ্যানে প্রতীয়মান হয় যে, বয়স উল্লেখ নাই এমন ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ৪৫১ জন, ৬ বছরের কন্যা শিশু ৫৮ জন, ৭-১২ বছরের ১০৬ জন, ১৩-১৮ বছরের ১৩৯ জন, ১৯-২৪ বছরের ৭০ জন, ২৫-৩০ বছরের ৫৭ জন, ৩০ বছরের উর্দ্ধে ২৬ জন সহ মোট ৯০৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ধরণের ধর্ষণের মধ্যে একক ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৪১৮জন।

বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশে সংঘটিত ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মাস ভিত্তিক তথ্য।

		২০০২-২০০৬ সন পর্যন্ত												
সন	বিষয়	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চঃ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ	মোট
২০০২	ধর্ষণ	৬৫	৪৭	১২৪	১১৬	৯৮	১০৬	৯২	১০৩	৮১	৯৭	৬১	৭০	১০৬০
২০০৩	ধর্ষণ	২২	৩৭	৮১	১০০	১৪৪	১০১	১২০	৮৬	১০৩	৭৯	৫৩	৫৬	৯৮২
২০০৪	ধর্ষণ	২১	৩৫	৮০	১০২	১১২	১০৭	১১৪	৮৯	১০০	৭৮	৫৭	৮২	৯৭৭
২০০৫	ধর্ষণ	৮৫	৬৪	৯৮	৭০	৯৭	৭৪	৮২	৭০	৫৮	৫৫	৬১	২১	৮৩৫
২০০৬	ধর্ষণ	৯২	৬৪	১০১	৮১	১০৫	৭৮	৮৬	৭৮	৬৩	৬২	৬৬	৩২	৯০৭
মোট	ধর্ষণ	২৮৫	২৪৭	৪৮৪	৪৬৮	৫৫৬	৪৬৬	৪৯৪	৪২৬	৪০৫	৩৭১	২৯৮	২৬১	৪৭৬১

তথ্যসূত্রঃ ওসিসি এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ।

বাংলাদেশের পাঁচ বছরে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের সূচকে লক্ষ্যণীয় যে, ৪৭৬১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তুলনামূলক কম ধর্ষণ হয়েছে ২০০৫ সনে (৮৩৫জন)। সর্বোচ্চ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২০০২ সনে (১০৬০ জন)। মাসভিত্তিক গড় হিসেবে কম ঘটনা ঘটেছে ফেব্রুয়ারি মাসে (২৪৭ জন)। আর সর্বোচ্চ ঘটেছে মে মাসে (৫৫৬ জন)।

২। ধর্ষণ জনিত হত্যাঃ

ধর্ষণের ঘটনায় যখন কোনো নারী ঘটনাস্থলে বা ধর্ষণ-পরবর্তী সময়ে মারা যায় তাকে ধর্ষণজনিত হত্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। ধর্ষণজনিত হত্যার প্রক্রিয়াগুলো হলো ধর্ষণশেষে জবাই করে হত্যা, এসিড দয়ে হত্যা, শ্বাসরোধ করে হত্যা, পানিতে ডুবিয়ে হত্যা এবং আত্মহত্যায় বাধ্য করানো।

দেশে গত জানুয়ারি ডিসেম্বর '০৫ সময়ে প্রতি মাসে গড়ে ১৪ জন নারী ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছেন। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণজনিত হত্যার ঘটনা ঘটে ঢাকা বিভাগে ৬৭টি। এর মধ্যে ঢাকা জেলাতেই ২৭ জন নারী এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

ধর্ষণজনিত হত্যার চিত্র (বিভাগ অনুসারে)

জানুয়ারি-ডিসেম্বর-২০০৬

বিভাগের নাম	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	আহত	মামলা	রায়	গ্রেপ্তার	ইতিবাচক সংবাদ	নেতিবাচক সংবাদ
ঢাকা	৮০	৬৭	৬৭	২৮	০৬	২৪	০৬	৭৪
রাজশাহী	৫১	৪৭	৪৭	১৩	০৩	০২	০৩	৪৮
খুলনা	৩১	২৫	২৫	১০	০৭	০৪	০৭	২৪
চট্টগ্রাম	১৯	১৮	১৮	০৫	০০	০৬	০০	১৯
সিলেট	০১	০০	০০	০০	০১	০০	০১	০০
বরিশাল	১২	১১	১১	০২	০১	০৭	০১	১১
মোট	১৯৪	১৬৮	১৬৮	৫৮	১৮	৪৩	১৮	১৭৬

তথ্যসূত্রঃ ২০০৬ সনের প্রায় সকল দৈনিক ও আঞ্চলিক সংবাদ পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সারাদেশে ধর্ষণজনিত হত্যা-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪টি। এই সময়ে মোট ১৬৮ জন নারী ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছেন। এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হয়েছে ৫৮টি এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৩ জন অভিযুক্তকে। এ সম্পর্কিত পূর্বের মামলার রায় হয়েছে ১৮টির। প্রত্যেটি রায়েই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

ধর্ষণজনিত হত্যার ক্ষেত্রে এলাকাগত কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ে। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ জনিত হত্যার ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাে। ৬৭ জন নারী এর শিকার হয়েছেন। এর পরেই রাজশাহী বিভাগে বেশি ধর্ষণজনিত হত্যার ঘটনা ঘটেছে, ৪৭ জন। অন্য তিনটি বিভাগ খুলনা, চট্রগ্রাম, ও বরিশালে যথাক্রমে ২৫, ১৮ ও ১১ জন নারী ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সিলেট বিভাগে একজনও ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হননি। সবচেয়ে বেশি নারী ধর্ষণজনিত হত্যার ঘটনা ঘটেছে ঢাকা জেলায়, ২৭ জন।

এ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণজনিত হত্যার ঘটনা ঘটেছে মে মাসে এবং এ মাসে ২৫ জন নারী ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হন। এ ছাড়া নভেম্বর মাসে ২০ জন ও মার্চ মাসে ১৯ জন নারী এর শিকার হয়েছেন। সবচেয়ে কম সংখ্যক নারী ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছেন জানুয়ারি ও অক্টোবর মাসে ১১ জন করে।

- ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার নারীদের মধ্যে অন্যতম হলো: অজ্ঞাত নারী, প্রতিবন্ধী, বিধবা, দুস্থ, স্বামীবিচ্ছিন্ন, গৃহপরিচারিকা, গার্মেন্টস কর্মী, যৌনকর্মী, সন্ত্রাসী কাজে নিযুক্ত নারী, ইউপি মহিলা মেম্বার ও আদিবাসী নারী।
- প্রাপ্ত তথ্য মতে, ধর্ষণজনিত কারণে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা হল- শ্বশুর, দেবর, ভাসুর, প্রতিবেশী, শিক্ষক, এলাকার মাস্তান, ডাকাত, সন্ত্রাসী, প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তান, বন্ধু, প্রেমিক, সহকর্মী, ভণ্ড পীর, গৃহকর্তা।
- ধর্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হত্যা করার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো : জবাই করে হত্যা, পুড়িয়ে হত্যা, এসিড দিয়ে হত্যা, শ্বাসরোধ করে হত্যা, পানিতে ডুবিয়ে হত্যা, আত্মহত্যায় বাধ্য করানো।
- ধর্ষণজনিত হত্যার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অধিকাংশ লাশের ময়নাতদন্ত করা হয় না; তাড়াতাড়ি করে লাশ কবর দিয়ে ফেলা হয়।
- নারীরা প্রধানত যেসব কারণে ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে, কুপ্রস্তাবে রাজি করাতে না পেরে, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, বিয়ে করতে না পেরে।
- ধর্ষণজনিত হত্যার ক্ষেত্রে মামলা কম হওয়ার কারণগুলো হলো: ময়না তদন্ত না হওয়া, মেডিকেল পরীক্ষা না হওয়া, আলামত নষ্ট করে ফেলা ও অভিযুক্ত ক্ষমতাশালী হওয়া।
- ধর্ষণজনিত হত্যার ক্ষেত্রে রায় কম হওয়ার কারণগুলো হলো: মামলা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না হওয়া, সাক্ষীর অভাব, মামলা চলাকালীন মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রদানকারী ডাক্তারদের অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের বিভিন্ন সংবাদ পত্র, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে ধর্ষণজনিত হত্যার পরিসংখান দেওয়া হল।

বয়সভিত্তিক ধর্ষণজনিত মৃত্যুর তথ্য ছক ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত

সন	বয়স / বিষয়	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখনাই	মোট	গৃহীত পদক্ষেপ		
										মামলা	শালিশ	লিচ হেফাজত
২০০২	ধর্ষণ	০৪	২১	৩১	২৪	১১	০৮	৭২	১৭১			
২০০৩	ধর্ষণ	০৭	১৮	২৯	১৮	১৪	২৩	৬৯	১৭৮		০২	
২০০৪	ধর্ষণ	০২	১০	২৪	০৬	০৭	১০	৬৬	১২৫	০৯	০৩	
২০০৫	ধর্ষণ	০২	১০	১৮	১০	১০	০৩	৬০	১১৩	১০		
২০০৬	ধর্ষণ	০৫	২২	২৪	২৫	১৭	০৯	৬৬	১৬৮	১৭	০৪	
মোট		২০	৮১	১২৬	৮৩	৫৯	৫৩	৩৩৩	৭৫৫	৩৬	০৯	

তথ্যসুত্রঃ ওসিসি এবং দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহ।

ধর্ষণের পর নারীদের হত্যা করার পৈচাশিক অনাচারের তথ্যে প্রতীয়মান হল যে, অজ্ঞাত বয়সের নারীরাই ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার বেশি (সংখ্যা ৩৩৩) এছাড়া ১৩-১৮ বছরের তরুনীরা ধর্ষণের পর মৃত্যুর শিকার হয়েছে বেশি, সংখ্যা-১২৬। পাঁচ বছরে মোট ৭৫৫ জন নারী ধর্ষণজনিত হত্যার করুণ পরিনতির শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর মৃত্যুর হার বেশি ঘটেছে ২০০৩ সনে, (সংখ্যা-১৭৮ জন)।

৩। অপহরণ ও পাচার

কত বিচিত্র উপায়ে যে নারী পাচার ও অপহরণ হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দেহ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, পারিবারের অন্য কোন সদস্যের সঙ্গে শত্রুতার কারণে, মুক্তিপণের দাবিতে নারীদেরকে অপহরণ করা হয়। তবে দারিদ্র্যের কারণেই অপহরণ ও পাচার সংঘটিত হচ্ছে বেশিরভাগ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ অপহরণ পরবর্তীর্তে পাচার করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ১০-২০ হাজার নারী ও শিশু পাঁচার হয়ে যাচ্ছে ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ অনান্য দেশে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদেরকে যৌন ব্যবসায় ব্যবহার করা হয়। পাচার হয়ে যাওয়া সব নারীরা পরবর্তীতে যখন দেশে ফিরে আসে তখন দেখা যায় এইডস সহ আরও বিভিন্ন যৌন রোগ বহন করে নিয়ে আসায় বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যত হয়ে পরে আরও ভয়াবহ।

বিগত ২০০৬ সালের জানুয়ারি-ডিসম্বরের মধ্যে পাচারের শিকার হয়েছে মাত্র ৩২৯ জন নারী। পাচারের এসব ঘটনার মামলা হয়েছে মাত্র ৩৮টি পূর্বের মামলার রায় হয়েছে ১৮টি। বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ১১০ জন। পাচার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২০৮ জনকে। উক্ত সময়ে আপহরণের শিকার হয় ১৮৪ জন নারী, এ সক্রান্ত মামলা হয়েছে ৯৩টি অপহরণের সাথে জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১২ জনকে। আপহরণের পর উদ্ধার করা হয়েছে ৬৮ জনকে।

শিশু পাচার বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের একটি ঘৃণ্য সামাজিক অনাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা পাচারের মূল কারণ হলেও সামাজিক কারণেও নারী ও শিশুরা পাচার ও অপহরণের শিকার হচ্ছে। যেমন সমাজে নারীর অবস্থান, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, তালাকের অবাধ সুযোগ, নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ইত্যাদি। রাজশাহী পাচার বিরোধ বেসরকারী সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

(এসিডি) এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক সালিমা সরোয়ার জানান–দরিদ্র্যতা, কর্মসংস্থানের অভাব, অশিক্ষা, যৌতুকপ্রবণতা, সীমান্ত এলাকা হওয়া এবং যোগাযোগ সহজ হওয়ার কারণে পাচার ও অপহরণের ঘটনা ঘটে। তিনি আরও জানান সেখানে মেয়েরা শুধু পতিতালয়েই কাজ করে তা নয়। বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে তারা জড়িত হয়। তবে সেটা বাধ্যতামূলকভাবে। যেমন– ফ্যাক্টরীর কাজ করা, যাত্রাপালায় নাচা, রিক্সা, চামরা, গরুর ব্যবসা, চিনি, শাড়ি ইত্যাদি ব্যবসার আড়ালে নারী ও শিশু পাঁচার হয়ে থাকে বলে তিনি জানালেন"[৬]।

"চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক মানবাধিকার সম্মেলনে প্রথম দিনেই আলোচিত হয়েছে নারী ও শিশু পাচার নিয়ে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লুইস বলেছেন, বিশ্বজুড়ে মানব পাচার ব্যাপক হারে বেড়েছে। মৌলদাসী, ভিক্ষুক, আইন শ্রমিক, শিশু যোদ্ধা ও উটের জকি হিসেবে প্রতি বছর লাখ লাখ নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ ধাপ"[৭]। অন্যদিকে ইউনিসেফ-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর মতে গোটা পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ পাচার হচ্ছে। তবে সবচেয়ে করুণ অবস্থা বাংলাদেশ ও নেপালের মতো অতি দরিদ্র দেশের কর্মসংস্থানের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে। "নারী ও শিশুরা পাচারের ফাঁদে পরে দেশ ছাড়ে এবং ভারত ও পাকিস্তানে গিয়ে ঝি-কাম যৌনদাসীর কাজ বা পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়"[৮]।

মাসভিত্তিক নারী ও শিশু পাচার চিত্র
জানুয়ারী- ডিসেম্বর-২০০৬।

পাচাররের ধরণ		জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চঃ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ	মোট
শিকার	নারী	১৮	১৯	১৯	১৩	২৪	১৬	২০	২৪	০৭	০৭	১৫	০২	১৮৪
	শিশু	১৮	২৩	৬৯	২৮	৩৭	৭৫	৫১	২৮	১৭	৫০	২৩	-	৪১৯
উদ্ধার	নারী	০৮	০৮	০২	০৫	০৬	০৫	১০	০৯	০৫	০৫	০৫	০	৬৮
	শিশু	১৫	২০	৬৯	২৪	২৩	৬২	৪৮	২৫	১০	৪৬	২০	-	৩৬২
গ্রেপ্তার	নারী	২৬	০৯	০৩	০৪	১৪	০৬	১৩	১৯	০৯	০৫	০৩	০১	১১২
	শিশু	০৮	০৭	০৭	১০	১৫	২৯	০৯	১৪	০৭	১১	১৩	-	১২০
মামলা	নারী	১০	১০	০৯	০৯	১৩	০৭	১১	১১	০৪	০১	০৭	০১	৯৩
	শিশু	০১	০৪	০৬	০৪	১১	০৭	০৪	০৪	-	০২	০২	-	৪৫
রায়	নারী	০০	০৩	০২	০৩	০১	০০	০৩	০১	০	০০	০১	০	১৪
	শিশু	০২	০৯	০৩	০১	১৩	০২	০৪	-	-	-	-	-	২৫
আহত	নারী	০৩	০৪	০৬	০১	০২	০০	০৩	০১	০	০১	০৪	০০	২৫
	শিশু	-	-	০১	-	-	-	০১	-	-	-	-	-	০২
নিহত	নারী	০	০১	০১	০১	০০	০০	০০	০০	০	০	০০	০০	০৩
	শিশু	০৩	-	-	-	-	-	০১	-	-	-	-	-	০৪
মোট	নারী	০৬	১১০	১৯৫	১০০	১৩৯	১৯২	১৭২	১৩০	৫২	১৮৫	৯১	৪	১৪৭৬
	শিশু													

তথ্যসূত্রঃ ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার

৬. এসিডি রাজশাহী-এর নির্বাহী পরিচালকের এর সাথে স্বাক্ষাত ।

৭. বেইজিং+১০, সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদন, বাংলাদেশের নারী উন্নয়নঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ.২১।

৮। দৈনিক আমার দেশে, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সনের নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্যণীয় যে, পাচারের শিকার, উদ্ধার, মামলা, গ্রেপ্তার, মামলার রায়, আহত ও নিহতের গণনায় মোট শিকার হয়েছেন ১৪৭৬ নারী ও শিশু। সর্বোচ্চ পাচারের ঘটনা ঘটেছে, উক্ত বছরের মার্চ মাসে যার সংখ্যা ১৯৫ জন। ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করলে নারীদের তুলনায় শিশুদের পাচারের সংখ্যাই বেশি লক্ষণীয়।

বিভাগভিত্তিক শিশু অপহরণ চিত্র-২০০৬

বিভাগ	শিকার	আহত	নিহত	মামলা	গ্রেপ্তার	উদ্ধার	রায়
ঢাকা	২০৮	০৮	১২	৬৮	১৫১	১৩১	২৮
রাজশাহী	১৮৮	০৩	০৪	৮৫	১১৫	১০১	০৭
খুলনা	১৬০	০৩	০৫	৬৪	৮৯	৮০	০৮
চট্টগ্রাম	১৪০	০৪	০৫	৪৮	১১৮	৭৫	০৬
সিলেট	৩১	-	-	১১	১৯	১৭	০৫
বরিশাল	৪৮	০১	০১	২২	২৭	২৭	০১
মোট	৭৭৫	১৯	২৭	২৯৮	৫১৯	৪৩১	৫৫

তথ্যসূত্র: ২০০৬ সনের প্রায় সকল দৈনিক ও আঞ্চলিক সংবাদ পত্র।

বিভাগ ভিত্তিক অপহরণের সমীক্ষায় সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগ থেকে অপহরণের শিকারের বিষয় লক্ষ্য করা যায় সংখ্যা ২০৮, অপহরণের পর আহত হয়েছেন ০৮ জন, নিহত হয়েছেন ১২ জন, মামলা হয়েছে ৬৮টি, গ্রেফতার হয়েছে ৫১ জন, উদ্ধার হয়েছে ১৩১ জন, রায় হয়েছে ২৮টি মামলার। সে হিসেবে অন্য বিভাগে সর্বমোট অপহরণ জনিত ৫০৬টি ঘটনা ঘটেছে।

৪। এসিড নিক্ষেপ

বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামোর ভেতরে এদেশের নারীরা নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছে। সাম্প্রতিককালে নির্যাতনের একটি নতুন সংযোজন এসিড অনাচারে শিকার হচ্ছে নারীরা। দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং শত্রুতার কারণে নারীরা এসিড অনাচারের শিকার হয়। এছাড়া প্রেম প্রস্তাব, বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও এসিড অনাচারে শিকার হতে হচ্ছে নারীদের।

"এসিড একটি ক্ষয়কারী রাসায়নিক তরল পদার্থ। দেখতে পানির মতো হলেও শরীরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বলতে থাকে এবং চামড়া পুড়তে পুড়তে মাংশপেশী এমনকি হাড়েও ক্ষত হতে পারে"[৯]। এসিড আক্রমণের ভয়াবহ দিক হল এতে মৃত্যুর হার কম হলেও আহতের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। এসিড আক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয়বহুল ও আমাদের দেশে দূর্লভ। দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রনা ও সামাজিক অবজ্ঞার মধ্যে অসহনীয় জীবন যাপন করতে হয় এসিডদগ্ধকে।

"২৬ ফেব্রুয়ারী-২০০৬ সরকারের জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের সভায় এসিড অনাচার নির্মূলের জন্য এসিড নিক্ষেপের চাঞ্চল্যকর মামলাগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল তদারকি করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এসব মামলার বিচার করা হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। জেলা শহরের চাঞ্চল্যকর মামলাগুলো জেলা প্রশাসন মনিটরিং সেল তদারকি করবে।"[১০]

৯. 'দৈনিক ইনকিলাব' ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

১০. 'দৈনিক আমারদেশ' ২৪ মে, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৩শে 'মে' ২০০৬ জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের সভায় নির্দেশ করা হয়েছে যে, এসিড অনাচার সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে থানায় মামলা গ্রহণপূর্বক দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে এবং এর ব্যাঘাত ঘটলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখন থেকে জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল থেকে একটি ছক তৈরি করে সহিংসতার বিস্তারিত তথ্য জানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১১]

বিগত জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০০৬ সারাদেশে ১৯৫ জন নারী এসিড অনাচারের শিকার হয়েছে। এ সময়ে গড়ে প্রতিমাসে ১৬ জন নারী এসিড অনাচারের শিকার হয়েছে। বিগত ১২ মাসে সকল দৈনিক পত্রিকাসমূহে ২৫৮টি এসিড সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়ে ১৮৯ জন নারী আহত এবং ৪৬জন নিহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়ে সারা দেশে এসিড অনাচারের পূর্ববর্তী ঘটনার রায় দেয়া রয়েছে মোট ২৩টি। এসব রায়ে মৃত্যু দণ্ডাদেশ, বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা প্রদান করা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদের ৪৭টি ইতিবাচক এবং ২১১টি নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[১২]

মাস ভিত্তিক এসিড নির্যাতনের চিত্র ২০০৬ খ্রি.।

মাসসমূহ / ধরণ	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ	মোট
শিকার	১৩	১৫	০৭	১৩	১৭	২১	১৬	২০	২০	২৭	১৭	০৯	১৯৫
আহত	১৩	১৫	০৬	১৩	১৭	২০	১৬	১৮	২০	২৭	১৬	০৮	১৮৯
নিহত	০০	০০	০১	০০	০০	০১	০০	০১	০০	০০	০১	০০	৪৬
মামলা	০৭	০৫	০২	০৮	০৫	০৫	০৮	০৬	০৭	০৯	০২	০২	৬৬
রায়	০৩	০৩	০১	০১	০৪	০১	০৪	০২	০১	০২	০১	০০	২৩
গ্রেফতার	০২	০৭	০৭	০১	০০	০৫	০৫	০৭	০৫	০২	০৯	০০	৫০
মোট	৩৮	৪৫	২৪	৩৬	৪৩	৫৩	৪৯	৫৪	৫৩	৬৭	৪৬	১৯	৫৬৫

উৎস:- ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১০টি দৈনিক এবং ১৯টি আঞ্চলিক সংবাদ পত্র।

বিগত বছরে বিভাগ ভিত্তিক এসিড নির্যাতনের সূচকে লক্ষ্য করা যায়, রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি নারী এসিড অনাচারের শিকার হয়েছে, যার সংখ্যা ৭১ জন। এর মধ্যে ৬৮ জন আহত এবং ২ জন নারী নিহত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরপরের স্থান ছিল ঢাকা বিভাগের যার সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। ঢাকা বিভাগের এসিড দগ্ধ ৪৪ জন নারীর মধ্যে ৪২ জন আহত আর ০২ জন নারী নিহত হয়েছে। জামালপুরে ১ জন নারী পিতার দ্বারা এসিড নিক্ষেপের হুমকির সম্মুখীন হয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছেন। খুলনা বিভাগে এসিড সহিংসতার শিকার ৪৪ জনের মধ্যে আহত হয়েছেন ৪৪ জনই। এখানে কেহ নিহত হয়নি। বরিশালে এসিড সহিংসতার শিকার ২০ জন নারীর ২০ জনই আহত হয়েছে। বিভাগগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম ও সিলেটে সবচেয়ে কমসংখ্যক নারী এ সহিংসতায় শিকার হয়েছে। উভয় বিভাগেই ৮ জন নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিগত (২০০২-২০০৬) পাঁচ বছরের এসিড নিক্ষেপের বর্বরতার ইতিহাস খুবই করুণ। এসিড অনাচার সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ২০০২ সনে। ৬টি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে এসিডের শিকার হয়েছিল ঢাকা বিভাগে মোট ৯১ জন। এটা ছিল বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের সর্বোচ্চ সংখ্যক এসিড নিক্ষেপের ঘটনা। ৬টি বিভাগে সর্বোচ্চ এসিড শিকারের সংখ্যা ২৫৯ জন, ২০০২ সনে। আর সর্বনিম্ন সংখ্যক এসিডদগ্ধ হয়েছিল ২০০৫ সনে ১৩০ জন নারী।

১১. দৈনিক আমারদেশ, ২৮ অক্টোবর, ২০০৬।

১২. ২০০৬ সনের ১০টি দৈনিক ও ১৯টি আঞ্চলিক সংবাদ পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সালে এসিড অনাচার ঘটনায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকারী রাজশাহী বিভাগ, বিগত পাঁচ বছরের এসিড নিক্ষেপের ঘটনাবলীর গড় হিসাব পূর্বানুসারেও প্রথম স্থান লাভ করেছে। বিগত ৫(পাঁচ) বছরে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে, ঢাকা বিভাগে ৩২০টি, রাজশাহী বিভাগে ৩২১টি, খুলনা বিভাগে ২১০টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯টি, সিলেট বিভাগে ৫৮টি ও বরিশাল বিভাগে ৬৫টি এসিডদগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ৬টি বিভাগে সর্বমোট এসিড অনাচারের ঘটনা ঘটেছে ১০৫৩ টি।

এসিড অনাচার এর পরিসংখ্যান (২০০২-২০০৬)পর্যন্ত

ক্রমিক নং	বছর / বিভাগ	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	সর্বমোট
০১	ঢাকা	৯১	৭৭	৬৫	৪৩	৪৪	৩২০
০২	রাজশাহী	৭৬	৭৬	৬৮	৩০	৭১	৩২১
০৩	খুলনা	৫০	৪৬	৫২	১৮	৪৪	২১০
০৪	চট্টগ্রাম	২০	২২	২৪	১৫	০৮	৮৯
০৫	সিলেট	০৯	১১	০৯	১১	০৮	৪৮
০৬	বরিশাল	১৩	০৯	১০	১৩	২০	৬৪
০৭	সর্বমোট	২৫৯	২৪১	২২৮	১৩০	১৯৫	১০৫৩

তথ্যসূত্রঃ ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রণীত সংবাদপত্র পরিবীক্ষণ ২০০৬ সনের প্রতিবেদনের আলোকে।

বাংলাদেশে এসিড অনাচারের প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল ষাট এর দশকে। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এ ঘটনার সূত্রপাত। পরে আশির দশকে একজন যাত্রাশিল্পীর গায়ে এসিড নিক্ষেপ করা হলে বিষয়টি সংবাদপত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারপর থেকেই এসিডকে একটি সস্তা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। প্রতিবছর ঝলসে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন বয়সের বহু নারী ও শিশু। এসিডের সহজলভ্যতা এসিড অনাচার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশের শিশুরা জন্মগতভাবেই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। দারিদ্র্যতার কশাঘাতে নিষ্পেষিত জীবনও নিস্কৃতি পায় না এসিড অনাচারের কাল ও ছোবল থেকে। বয়সের ভিত্তিতে এসিড অনাচার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিগত ৫ বছরের গড় হিসেবে ত্রিশোর্ধ নারীরাই এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি, তাদের সংখ্যা ২১৯ জন, ২৫-৩০ বছরের নারী ১৭০ জন, ১৯-২৪ বছরের নারী এসিড দগ্ধ হয়েছে ১৬০ জন, ১৩-১৮ বছরের ১৬৮ জন, ৭-১২ বছরের শিকার হয়েছে ৫৪ জন। বয়স উল্লেখ নাই, এমন নারীদের সংখ্যা ২৯০ জন। কাজেই শিশু থেকে ত্রিশোর্ধ নারী ও শিশু এবং বয়স উল্লেখ ছাড়া মিলিয়ে বিগত পাঁচ বছরে মোট এসিড অনাচারের ঘটনা ঘটেছে ১০৫৩টি।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স ভিত্তিক পাঁচ বছরে বাংলাদেশের এসিড সহিংসতা (২০০২-২০০৬)।

ক্রমিক নং	বয়স / বছর	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নাই	মোট
০১	২০০২	১২	২৫	৪৮	৪২	৩৯	৪১	৫২	২৫৯
০২	২০০৩	১৩	১৬	৪১	৩৯	৩৭	৪৮	৪৭	২৪১
০৩	২০০৪	১১	১৭	৩৮	৩৬	৩৫	৪৭	৪৪	২২৮
০৪	২০০৫	০৪	০২	১৬	১৭	২৫	৩৭	২৯	১৩০
০৫	২০০৬	১৪	১২	২৫	২৬	৩৪	৪৬	৩৮	১৯৫
০৬	মোট	৫৪	৭২	১৬৮	১৬৭	১৭০	২১৯	২৯০	১০৫৩

তথ্যসূত্রঃ সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ।

৫। যৌনকর্মী ও অনাকাঙ্খিত শিশুঃ

শিশু নির্যাতনের বিবিধ ধরণের মধ্যে যৌন নির্যাতন অন্যতম। দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সামাজিক অপরাধী চক্র, বিশেষতঃ দালাল চক্র শিশুদের জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করছে। প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে শিশুদের দৈহিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে। এ ধরণের শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা সংক্রমিত রোগ-ব্যাধি, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ ও মাদকাসক্তিসহ নানা রকম মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। সার্ক অটোনোমাস উইমেন অ্যাডভোকেসি গ্রুপের তথ্য মতে দেশের যৌনকর্মীদের প্রায় ৮৩.৪ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। এই পতিতালয়ে কর্মরত অর্ধেক যৌনকর্মীর সর্দারনী নামে পরিচিত মহিলারা বাইরে থেকে দুস্থ ও অবলা নারী কিনে আনে বলে জানা যায়। আর বাকি অর্ধেক হলো পতিতাদের সন্তান। বাইরে থেকে যেসব মেয়ে কিনে আনা হয় তাদের যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে মুচলেকা দিতে হয় এবং এ সময়ে তাদের উপার্যনের অর্থ সর্দারনীর হাতে তুলে দেয়। উন্নত জীবনের লোভ দেখিয়ে একশ্রেণীর লোক এদের পতিতাপল্লীতে সর্দারনী নামে পরিচিত মহিলাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। বিক্রি হওয়ার পর এসব মেয়ের অধিকাংশই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

একশ্রেণীর লোক আছে যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দরিদ্র পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি, বাসাবাড়িতে কাজসহ ভাল থাকা-খাওয়ার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এনে পতিতা-পল্লীগুলোতে বিক্রি করে দেয় এবং এরাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্মে জড়িয়ে পড়ে। যারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত, স্থানীয় ভাষায় এরা দালাল নামে পরিচিত। এভাবেই অনেক শিশু যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করছে এবং তারা তাদের এ কাজ মেনে নিয়েছে। যারা মানতে পারেনি তারা নানাভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে আবার কেউ কেউ পুলিশের সহায়তায় উদ্ধার হয়েছে। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, ২০০৬ সময়ে নিজ উদ্যোগে এবং পুলিশের সহায়তায় মোট ২৩ জন শিশু উদ্ধার হয়েছে।

সংবাদ বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, অধিকাংশ কিশোরীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ করনো হচ্ছে। যৌন কর্মে বাধ্য করা এসব শিশুর ওপর শারীরিক নির্যাতন সহ নানা ধরনের নির্যাতন করা হয়ে থাকে। পতিতালয়ের সর্দারনী বলে খ্যাত মহিলারা এসব অত্যাচার করে থাকে এবং এগুলো নিত্যই ঘটে থাকে। যৌনকর্মী হিসেবে ব্যবহৃত শিশুরা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। তাদের উপার্জিত টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগবাটোয়ারা করার পর অবশিষ্ট যে অর্থ, তা দিয়ে তাদের জীবনযাপনের বাকী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

এগুলো ছাড়াও শিশু যৌনকর্মীরা আরও নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। সম্প্রতি রাজবাড়ী জেলার দৌলতদিয়া যৌনপল্লীর শিশু যৌনকর্মীদের ওপর নতুন ধরনের এক সংবাদ প্রকাশিত হয় আর তা হলো ১১/১২ বছরের শিশুদের গরু মোটাতাজাকরণের ট্যাবলেট 'ভেটলিন' খাওয়ানো-সংক্রান্ত। 'ভেটলিন' খাওয়ার পর শিশুদের শরীর ফুলে ১৮/২০ বছর বয়সী মেয়েদের মতো দেখায়। এ বর্বরতার শিকার শিশু যৌনকর্মীরা এক পর্যায়ে ফুসফুসের ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে বলে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু বলতে মূলতঃ সমাজে নারী-পুরুষের বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কের জের ধরে জন্ম নেয়া শিশুদের চিহ্নিত করা হয়। এ ছাড়া পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে গর্ভধারণ, ধর্ষণ, ভয়ভীতিপূর্বক ধর্ষণ ইত্যাদির কারণে জন্ম নেয়া শিশুদের অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু বলা হয়ে থাকে। অভাবের কারণে শিশু বিক্রি হলেও শিশুদের অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হয়।

যেসব অবস্থায় সাধারণত অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুদের দেখা যায় ঃ[১৩]

লোকলজ্জার ভয়ে অধিকাংশ মা-ই তাদের সন্তানদের হাসপাতাল ক্লিনিকে অথবা রাস্তার মোড়ে ডাস্টবিনে ফেলে যেতে বাধ্য হন অথবা জীবন্ত পুঁতে ফেলার চেষ্টা করেন। নিষ্ঠুর এ কাজটি করার মধ্য দিয়ে মা তার সম্মান বাচাঁনোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ঘটনার মূল নায়ক পুরুষ ঘটনার আড়ালেই থেকে যায়। অতি সম্প্রতি এ ধরনের অমানবিক একটি ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

গত ২৯ নভেম্বর ২০০৬ আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী,গত ১৭নভেম্বর ২০০৬ এক রিক্সাওয়ালা বৌবাজার বালুর মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময় এক শিশুর কান্না শুনতে পান। মাঠের দিক তাকাতেই তিনি দেখতে পান একটি শিশু হাত-পা নাড়ার চেষ্টা করেছে। পাশেই কয়েকটি কাক তাকে ঘিরে অপেক্ষা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সামনে গিয়ে বালু খুঁড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। ততক্ষণে কাক ঠুকরে শিশুটির থুতনির ডান দিক, ডান হাতের কব্জি ও বাম পায়ের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। বালুচাপা দেয়ার সময়ে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শিশুর মুখ বেরিয়েছিল। তা দেখে কাকগুলো খাবার ভেবে শিশুটিকে ঠুকরে ঠুকরে খায়। তিনি শিশুটিকে নিয়ে সিকদার মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রকাশিত সংবাদে সমাজসেবা কর্মকর্তা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় অজ্ঞাত কোনো কুমারী মা লোকলজ্জা থেকে মুক্তি পেতে গর্ভজাত কন্যাশিশুটিকে বালুচাপা দিয়ে চলে গিয়েছিল।[১৪]

---

১৩. রাস্তার পাশে পলিথিন মোড়ানো ও ডাস্টবিনে ফেলে যাওয়া অবস্থায়

* জন্মের পর ক্লিনিকে ফেলে যাওয়া অবস্থায়
* গলা টিপে হত্যা করে ফেলে যাওয়া অবস্থায়
* কবরস্থানের পাশে ফেলে যাওয়া অবস্থায়
* বিভিন্ন আবাসিক ভবনের সামনে থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অবস্থায়
* অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করে দিলে
* অবৈধ সন্তানকে বস্তায় ভরে ফেলার চেষ্টা
* জীবন্ত কবর দেবার চেষ্টা

১৪. দৈনিক আমারদেশ ২৯শে নভেম্বর, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ ভিত্তিক অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু চিত্রঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর'-২০০৬

বিভাগ	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	উদ্ধার	গেপ্তার	রায়	আহত	নিহত
ঢাকা	৫৭	৬৪	৩	৩	-	২	৫৬
রাজশাহী	৪০	৫৭	১	-	১	-	১৮
খুলনা	৫৪	৫৩	২	১		১	৩২
চট্টগাম	৩৭	৩৫	৬	২	-	১	১৪
বরিশাল	১২	৮	১	-	-	-	৮
সিলেট	৩	৩	-	-	-	-	৩
মোট	২০৩	২২০	১৩	৬	১	৪	১৩১

উৎসঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১০টি দৈনিক এবং ১৯টি সংবাদপত্র

এভাবে জন্ম নেয়া শিশুরা সমাজে স্বীকৃতি পায়না। ফলে তারা ভোগে নিরাপত্তাহীনতায়, অনিশ্চয়তায়। এসব শিশুর ব্যাপারে জাতিসংঘের সনদে বলা হয়েছে, যেসব শিশুকে লালন-পালনের কেউ নেই তাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। পিতৃ-মাতৃহীন, পরিত্যক্ত শিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের লক্ষে যথোচিত নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কথাও বলা হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্য ছকে জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬ এক বছরে সারা দেশে অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুবিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৯৯টি। শিকার হয়েছে ২২০ জন শিশু। বিভিন্ন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে ১৩ জনকে। এসব ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৬ জনকে। মামলা হয়েছে ১৪টি। মামলার রায় দেয়া হয়েছে মাত্র একটি। বিভিন্ন জায়গায় ফেলে যাওয়া অবস্থায় ১২৫ জন নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং মামলা রায়ের সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয় অপরাধী কিংবা জড়িত ব্যক্তি বা পুরুষ তেমন কোনো সাজা হয় না। তারা ঘটনার আড়ালেই থেকে যায়।

মাসভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মার্চ মাসে অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ঘটনা প্রকাশিত হয়। এ সময়ে ২১টি সংবাদে ৪১জন শিশু শিকার হয়। ১৮জন শিশুকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। জানুয়ারি মাসে এ সংক্রান্ত সংবাদ পাওয়া গেছে সবচেয়ে কম।

৭। যৌতুক ও বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকঃ

যৌতুক ও বিবাহবিচ্ছেদ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অতি পরিচিত "সামাজিক অনাচার'। এ পদ্ধতি নারীদের উপর নির্যাতনের বাস্তব স্বরূপ/ধরণ নির্দেশ করে। যৌতুকের জন্য নারীর উপর নির্যাতন একজন নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বধীনতা দলিত করে আসছে; নারীর স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার পথে প্রতিবন্ধকতাসৃষ্টি করে আসছে। সাধারণতঃ কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বিয়ের প্রতিদান হিসেবে যদি মূল্যবান জামানত বা সম্পত্তি হস্তান্তর করে বা করতে সম্মত হয় সেটাই যৌতুক বলে বিবেচিত হয়। যৌতুকের কারনে নারীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদেরকে দুর্বল ভাবার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের ওপর অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সব ধরণের পরিবারেই যৌতুকপ্রথা বিদ্যমান। যৌতুকের কারণে গ্রামাঞ্চলের নারীদের ওপরে নির্যাতন প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে শহরের মেয়েরাও এই নির্যাতন মুক্ত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের শিকার অধিকাংশ নারী যৌতুকের বলি। যৌতুকের কারণে নারীরা কখনো লাঞ্ছিত, কখনও নির্যাতিত হচ্ছে। নির্যাতনের কারণে মারাও যাচ্ছে অসংখ্য নারী। আর যারা অত্যাচার সহ্য করেও নিজের জীবনকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে তারাও বেঁচে থাকছে শত অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে।

যৌতুকের কারণে হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন নির্যাতন সংঘটিত হলেও পেছনে রয়েছে আরও অনেকগুলো কারণ। মূলতঃ মানুষের অর্থ-লালসা থেকেই যৌতুক প্রথা সৃষ্টি। এ ছাড়া নারী সমাজের পরনির্ভশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, সামাজিক রেওয়াজ, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগের অভাব, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাত্র ব্যবসায়িক মানোবৃত্তি যৌতুকের কারণ।

ছক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে যৌতুক সংক্রান্ত ঘটনায় ১হাজার ২৩৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এর মধ্যে ১ হাজার ৩ জন নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২৮জন এবং নিহত হয়েছে ৫০৫ জন। মোট প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে ১৫৪টি ইতিবাচক এবং ১ হাজার ৮১টি নেতিবাচক। জুন মাসে বেশি সংখ্যক নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং মার্চ মাসে বেশি সংখ্যক নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

নারী আইনি অধিকারের (যৌতুক)চিত্রঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬

মাস	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	নির্যাতনের মাত্রা		মামলা	রায়	গ্রেপ্তার
			আহত	নিহত			
জানুয়ারি	৮৩	৭০	৩৯	৩১	২৫	৩	৯
ফেব্রুয়ারি	৯৭	৬৭	৩৭	৩০	৩৮	৫	১৮
মার্চ	১৩২	১০৯	৩৯	৪৫	৫১	৬	২৫
এপ্রিল	১০৫	৭৯	৪১	৩৮	৪৩	৫	১৮
মে	১২৩	৯৬	৪৯	৪৭	৪৯	১১	২১
জুন	১৩৬	১০৩	৩৪	৬৬	৫১	৮	১৪
জুলাই	১১৭	৮৬	৩৩	৫৩	৪৬	৪	২৭
আগষ্ট	১১৯	১০২	৩৯	৪৫	৪০	১২	১৩
সেপ্টেম্বর	১০১	৯১	২৩	৬২	৪০	৬	২১
অক্টোবর	৮৮	৭৫	২৯	৩৬	২৬	১১	১০
নভেম্বর	৮৯	৮১	৪০	৩৬	৩১	২	১১
ডিসেম্বর	৪৫	৪৪	২৫	১৬	২৩	১	৭
সর্বমোট	১২৩৫	১০০৩	৪২৮	৫০৫	৪৬৩	৭৪	১৯৪

উৎসঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১০টি দৈনিক এবং ১৯টি আঞ্চলিক সংবাদপত্র

সংবাদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, যৌতুকের কারণে হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন নির্যাতন সংঘটিত হলেও এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। নারী সমাজের পরনির্ভরশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, সামাজিক রেওয়াজ, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগের অভাব, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাত্রপক্ষের ব্যাবসায়ীক মনোবৃত্তি যৌতুকের মূল কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ

সামাজিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিয়ে চিহ্নিত পরিস্থিতির কারণে স্বামী-স্ত্রীর সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন দু'জনের সম্মতিতে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। সিডো সনদে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় নারীর মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে পুরুষের একক ইচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তালাক বা বিচ্ছেদকে নারীর ওপর একটি নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পারিবারিক আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দু নারীর তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো অধিকারই নেই, স্ত্রীকে স্বামীর মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়।

নারী আইনি অধিকারের (তালাক) চিত্রঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৬

মাস	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	নির্যাতনের মাত্রা		মামলা	গেপ্তার	উপকৃত
			আহত	নিহত			
জানুয়ারি	৩	০	০	০	০	০	০
ফেব্রুয়ারি	৮	৫	১	০	০	০	০
মার্চ	৪	৩	০	০	০	০	০
এপ্রিল	৬	৫	০	১	০	১	৪০০
মে	৬	৬	০	০	১	১	০
জুন	২	২	০	০	০	০	০
জুলাই	১	০	০	০	০	০	০
আগস্ট	১	১	০	০	০	০	০
সেপ্টেম্বর	৩	৩	০	০	০	০	০
অক্টোবর	২	২	১	০	২	২	০
নভেম্বর	১	১	১	০	০	০	০
ডিসেম্বর	২	২	০	০	০	০	০
সর্বমোট	৩৯	৩০	৩	১	৩	৪	৪০০

উৎস: ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১০টি দৈনিক এবং ১৯টি আঞ্চলিক সংবাদপত্র

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে বিয়েবিচ্ছেদ সংক্রান্ত ৩৯টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিচ্ছেদের শিকার হয়েছেন ৩০ জন নারী। কেবল বিয়েবিচ্ছেদের শিকার হওয়া নয়, তাদের মধ্যে আহত হয়েছেন ৩ জন এবং নিহত হয়েছেন ১ জন নারী। এ বিষয়ে প্রকাশিত ৩৯টি সংবাদের মধ্যে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ৩টি।

সংবাদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের সময় নারী মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে পুরুষের একক ইচ্ছায় বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তালাক বা বিচ্ছেদকে নারীর ওপর একটি নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া গ্রামে নিম্নবিত্তদের মধ্যে তালাক প্রবণতা বেশি থাকলেও শহরে ভিন্নচিত্র লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত পরিবারে নারীদের মধ্যেও তালাক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। পারিবারিক কলহ, বারবার কন্যাসন্তান জন্ম দেয়া, দ্বিতীয় বিয়েতে বাঁধা দেয়া, পরকীয়া প্রেম, স্ত্রীর হাজতখাটা, সম্পত্তি চুরির অভিযোগ, প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়া, জবাবদিহিতা না থাকা, যৌতুক, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই চাকরিজীবী হওয়া, প্রতিশোধ পরায়ণতা, আত্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

স্বজনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক না থাকা, কিছু হলে আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে উকিলের কাছে যাওয়া এবং তৃতীয় লোকের ভুল পরামর্শের কারনে বেশিরভাগ বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

৯। শিশু কর্তৃক চোরাচালানি, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রবহন

সঙ্গত কারনে প্রশ্ন ওঠে, শিশু কে? অর্থাৎ কত বছর বয়সী মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে, সে বিষয়ে এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম ধারণা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন সব মানব-সন্তানকে শিশু বলা হবে। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (১৯২৯)-এ বলা হয়েছে, ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।

বয়স	অধিকার
০৭ বছরের নিচে	শিশুর কোন আইনগত দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা নেই
৬-১০ বছরের নিচে	শিশুর বাধ্যতামূলক প্রথমিক শিক্ষা
১২ বছরের নিচে	শিশু শ্রম নিষিদ্ধ
১৪ বছরের নিচে	কারখানায় কাজ নিষিদ্ধ
১৫ বছরের নিচে	পরিবহন খাতে কাজ নিষিদ্ধ
১৬ বছরের নিচে	শিশু অপরাধীকে কারাগারে রাখা বে আইনি
১৮ বছরেরর নিচে	ভোটাধিকার নেই, মেয়েদের বিবাহ বে আইনি
২১ বছরের নিচে	ছেলেদের বিবাহ বে আইনি

তথ্যসূত্রঃ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ।

এ ছাড়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত আই. এল. ও সনদ নম্বর ৫৯ (১৯৩৭)-এ শিল্পকারকানায় কর্মরত শিশুদের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যে সব কারখানায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় এবং ১০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে সেগুলোতে ন্যূনতম বয়স ১২ বছর, রেলওয়ে এবং বন্দরের ডকে কয়েক ধরনের কাজের জন্য ১৩ বছর এবং খনিতে খনন কাজে কিংবা অন্যান্য বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে সর্বনিম্ন বয়স ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। আইএলও সনদ নম্বর ১৩৮ ও সুপারিশ নম্বর ১৪৬-তে শিশুদের কাজের ন্যূনতম বয়স ১৫ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। তবে স্কুলের বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ হলে এই ন্যূনতম বয়স কার্যকর হবে না।

বাংলাদেশের শিশুরা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এক শ্রেণীর সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক নেতা শিশুদের চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রবহনের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করছে। পুলিশ ও RAB-এর দেয়া তথ্যে দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ৭ লাখ শিশুকে বোমা বহন, নিক্ষেপ, বোমা তৈরি, চাঁদাবাজি এবং হরতালের পিকেটিংসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্রবহন এবং সন্ত্রাসীদের মাঝে তথ্য আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অভিযানের ফলে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা পালিয়ে বেড়ালেও তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়নি। সন্ত্রাসীরা তাদের অবৈধ গোলা-বারুদ, বোমা ও গ্রেনেড বহনের মতো কাজে শিশুদের ব্যবহার করছে।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা ছাড়াও মাদক ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় শিশুদের মাদকদ্রব্য কেনাবেচার কাজে নিয়োজিত রাখছে। মহানগীরতে ২০টি সন্ত্রাসী গ্রুপ এসব শিশুর মাধ্যমে অনাচার নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত করছে। শিশুদের কেউ সাধারণত সন্দেহ করে না বলে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। বোমা ও অবৈধ অস্ত্রবহন এবং হরতালে পিকেটার হিসেবে ব্যবহৃত অধিকাংশ শিশু ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বস্তি, মেস, বাসাবাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বসবাস করছে।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সারা দেশে প্রায় ৩৫ হাজার শিশু-কিশোর সন্ত্রাস ও অনাচারের সঙ্গে জড়িত। এদের বয়স ৮ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ঢাকা শহরেই রয়েছে প্রায় ২০ হাজার, চট্টগ্রামে ৬ হাজার, খুলনায় ৫ হাজার এবং অন্যান্য জেলা শহরে ৪ হাজার। প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এরা চুরি, ছিনতাই, মাদকব্যবসা, চোরাচালানিসহ খুনখারাবীতে জড়িত রয়েছে। এসব শিশু-কিশোর সন্ত্রাসীরা পিস্তল, রিভলবার, শটগান, কাটা রাইফেল, কিরিচ, ছুরি ও ক্ষুর চালাতে পারে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, অপরাধের সঙ্গে জড়িত শিশুদের শতকরা ৯০ ভাগই মাদকাসক্ত। এরা ফেনসিডিল, হেরোইন ও গাঁজায় আসক্ত।

শিশুদের চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রবহন চিত্র-২০০৬

মাস	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ
সংবাদ সংখ্যা	০	০	০	৩	০	২	১	২	১	০	১	০
শিকার	০	০	০	০	০	১০,০০০	১	৭০০,০০০	০	০	১	০

তথ্যসূত্রঃ পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।

অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রাজধানী ঢাকা মহানগরীতেই প্রায় ৭ লাখ শিশু বোমা বহন, নিক্ষেপ, বোমা তৈরি, চাঁদাবাজি এবং হরতালে পিকেটিংসহ ভয়ঙ্কর অনাচারমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে। এদের অধিকাংশ সভা-সমাবেশ এবং হরতাল-ধর্মঘটে পিকেটার হিসেবে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে কাজে নিয়েজিত হয়। এ ছাড়া মদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র বহন এবং পাড়া-মহল্লায় সন্ত্রাসীদের মাঝে তথ্য আদান-প্রদানসহ বিভিন্নসহ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

দেশের সীমান্ত এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ শিশু চোরাচালানির সঙ্গে জড়িত। এসব এলাকার অভাবী আর দুঃস্থ পরিবারের শিশু-কিশোরদের চোরাচালানি পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত করেছে চোরাচালানকারীরা। পেটে ভাত কিংবা সামান্য অর্থের বিনিময়ে শিশু-কিশোরদের ভারতীয় পণ্যের পোটলা মাথায় নিয়ে চোরাচালানিদের নির্দেশমতো এখানে থেকে সেখানে বহন করে বেড়ায়। এ কাজে তাদের ৩০/৪০ টাকা দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর-০৫ সময়ে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র বহন-সংক্রান্ত মোট ১১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদে বিভিন্ন অপরাধে ৭,০১,০০২ জন শিশুর সংশ্লিষ্ট থাকার খবর পাওয়া যায় । পুলিশ ও র‍্যাবের দেয়া তথ্যে দেখা যায়, ঢাকা মহানগরীতে শিশুদের বোমা বহন, নিক্ষেপ, বোমা তৈরি, চাঁদাবাজি এবং হরতালের পিকেটিংসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র বহন এবং সন্ত্রাসীদের মাঝে তথ্য আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। র‍্যাবের অভিযানের ফলে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা পালিয়ে বেড়ালেও তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়নি। সন্ত্রাসীরা তাদের অবৈধ গোলাবারুদ, বোমা ও গ্রেনেড বহনের মতো কাজে শিশুদের ব্যবহার করছে।

দেশের অভ্যন্তরে ছাড়াও সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানিরা শিশুদের অবাধে ব্যবহার করছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা ও গ্রামের শিশুদের চোরাচালনও মাদকদ্রব্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এ ছাড়া ঠাকুরগাঁও ও জয়পুরহাট জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা ও গ্রামের শিশুদের চোরাচালানি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব এলাকার ৭০ ভাগ শিশু ভারতীয় পণ্য আনার কাজে জড়িত। সামান্য মজুরির বিনিময়ে ভারতীয় বিভিন্ন মালামাল এনে চোরাচালানিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এ কাজে দিনে তাদের ৩০/৪০ টাকা দেয়া হয় এবং ঐ টাকা দিন শেষে তারা তাদের বাবা-মা'র হাতে তুলে দেয়।

দারিদ্র্য আর অসচেতনতা শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখলেও শিশুদের চোরাচালানে নিয়োজিত করার পেছনে রয়েছে আরও অনেক কারণ। শিশুদের এ ধরনের কাজে নিয়োজিত করার জন্য একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ও দালাল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশুর দ্বারা চোরাইপণ্য বহন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ঐ অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের হাতে নগদ পুঁজি তুলে দিয়ে এ ব্যবসায় উৎসাহ যোগাচ্ছে। এ ছাড়া আরও যে সব কারণে শিশুরা এ কাজে আসক্ত হচ্ছে তা হলো– মাতা-পিতার অসঙ্গতা, আদর-শাসন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সঙ্গদোষ, সংঘাতময় পরিবেশ, ভঙ্গুর পরিবার, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের অভাব, অশিক্ষা, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্ব, পাড়ার বড় ভাই মাস্তানের সাহচর্য, অপসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা।

চোরাচালানি, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র বহনের কাজে জড়িত শিশুরা একসময় সন্ত্রাসী হিসেবে গড়ে উঠে। পরে এই শিশুরাই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তারা হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এই মাদকাসক্ত শিশুরা পরে চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতিসহ নানা ধরনের অনাচারে জড়িত হয়। পুলিশ সদরদপ্তরের এক হিসাব মতে দেশে প্রায় এক লাখ শিশু-কিশোর এ অনাচারের সঙ্গে সক্রিয় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাদক ও মাদকাসক্তি

মাদক শব্দের আভিধানিক অর্থ হল মত্ততাজনক ও নেশার জিনিস। আর আসক্তির অন্যতম অর্থ হল লিপ্সা, ভোগবিলাস ও অনুরাগ। সুতরাং যা পাবার জন্য মনপ্রাণ অস্থির হয়ে যায়–তাই হল মাদক নেশা। মাদকদ্রব্যের প্রতি যার প্রবল আসক্তি রয়েছে, তাকে বলা হয় মাদকাসক্ত। মাদক একধরনের ঔষধ যে ঔষধ সেবনে মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং উত্তরোত্তর সে সব ঔষধ বা দ্রব্যাদি সেবনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তা-ই মাদকদ্রব্য হিসেবে আখ্যায়িত হয়। আর মাদকাসক্তি এমন একটি মানসিক, কখনও বা শারীরিক অবস্থা যার আবির্ভাব ঘটেছে জীবিত প্রাণী ও মাদকদ্রব্যের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এ অবস্থায় আচরণগত ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাদকসৃষ্ট ফল পাওয়ার মানসিক প্রলোভন বা মাদকের অনুপস্থিতি জনিত অস্বস্তি এড়ানোর জন্য মাদকদ্রব্যটি কম-বেশি নিয়মিত গ্রহণ করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা।[১৫]

মাদক ও মাদকাসক্তি সহ যে কোন ধরনের আসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে,[১৬] "আসক্তি হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিশনের (Neurotransmission)[১৭] স্ব-আবেশিত এমন এক পরিবর্তন যা সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণের জন্ম দেয়। আর মাদকাসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Drug addiction is the habitual use of certain narcotic that leads in time to mental and moral deterioration, as well as to deleterious social effects."[১৮]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকাসক্তি হল, "মাদকদ্রব্যের উপরে আসক্তি বা নির্ভরশীলতা। এটি হচ্ছে একটি মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যার উপর নির্ভরশীলতা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয় তখন সে মাদকদ্রব্য সেবনের অবর্তমানে উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে সে যে কোন অপরাধ সংঘটন করতে পারে।

মাদকদ্রব্যের অর্থ সংকুলানের জন্য যা খুশি তা করতে পারে। এক কথায় মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অবিরাম বা পর্যায়ভিত্তিক নেশাগ্রস্ততা যার ফলস্বরূপ ক্ষেত্র মতে এক বিশেষ মাদকদ্রব্য অবশ্যই নিয়মিতভাবে সেবন করতে হয়। ক্রমাগত মাদকদ্রব্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়। শারীরিক, মানসিক বা উভয়ভাবে এই মাদক ক্রিয়ার উপরে নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগতভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সাথে বৃত্তিমূলক দিকের অবনতি হতে থাকে।"[১৯]

---

১৫. মুহাম্মদ সামাদ, মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ইং), পৃ.১৪৮।

১৬. এ কে নাজিবুল হক, মন ও মনোবিজ্ঞান, সম্পাদনা, এ খালেক ও এ. ইউ. আহমেদ (ঢাকা ঃ ১৯৮৯ইং), পৃ. ২০০।

১৭. নিউরোট্রান্সমিশন হচ্ছে এমনি একটি প্রক্রিয়া যার মাধমে স্নায়ুপ্রবাহ (Impulse) এক স্নায়ুকোষ (Neuron) থেকে অন্য স্নায়ুকোষে পাঠাতে হয়।

১৮. Kimbal Young W. Mack Raymond, Sociology and Social Life, (New York: 1962).P.446.

১৯. এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (ঢাকা ঃ খোশরোজ কিতাব মহল ১৯৯৯ ইং), পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

মাদকাসক্তির ধারণার আরও একটি ব্যাখ্যা হলো, "The concept of drug addiction is concerned with the three terms-tolerance, physical dependence and habituation.Tolerance is a phycological survival mechanism of the body in which an organism adapts to a drug and thus better able to withstand continual exposure to its toxic substances." [২০]

মাদকাসক্তির ধারণার আরও একটি ব্যাখ্যা হলো, "Drug addiction of course is manifested as a state in which a person has lost the power lf self control with reference to a drug and abuses the drug to such an extent the person or society is harmed." [২১]

সুতরাং মাদকাসক্তি বলতে বুঝায়, কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি মাদক জাতীয় দ্রব্য, কোন ঔষধ কারণ ব্যতীত বার বার সেবন করে এবং উক্ত ঔষধের উপর শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্য ভাবে বলা যায়, "Drug addiction means strong attraction for any harmful things. In this sense taking tea, coffee, smoking and drinking alcohol may be called addiction. Now a days drug addiction means taking opium, heroine, cocaine, marijuana, morphine etc." [২২]

১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী, "মাদকাসক্তি বলতে বুঝায় এমন একজন মদ্যপায়ীকে যে অভ্যাসগত ভাবে মাদক দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, মাদক দ্রব্য সেবন কিংবা গ্রহণ যেন তার নিকট রোগক্রান্ত তুল্য, মদ্যপান তাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে, অবক্ষয়ের দিকে তিলে তিলে ধাবিত করছে।"[২৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা যার ফলে রোগী ড্রাগের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ ব্যবহার ভালো লাগার আমেজের মধ্যদিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের ইচ্ছা। এভাবে পুনঃপুনঃ ড্রাগ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে ব্যবহারকারীকে ড্রাগের মাত্রা বাড়াতে হয়। এভাবে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, ড্রাগ ব্যবহার না করলে শরীরে প্রত্যাখ্যানজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর এরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় তাকে টেনে নিয়ে যায় ড্রাগের দিকে। ফলে আসক্ত ব্যক্তি একমাত্র ড্রাগ ব্যবহারের চিন্তা ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের বাকি সব চাহিদা, দায়িত্ব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ড্রাগ ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলেও পরবর্তীতে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও ড্রাগসংগ্রহ ও ব্যবহার। এভাবেই তার পরিণতি হয় মারাত্মক শারীরিক মানসিক জটিলতা যার পরিণাম মৃত্যু।[২৪]

---

২০. B. Klienmuntj, Essential of Abnormal Psychology (New York: Harper and Row Publishers 1974). P.39.

২১. Bucher (est all). The Foundation of Health Meredith, (New York Publishing Company, 1967), P.134.

২২. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, সমাজকল্যাণ অনুক্রম (ঢাকা ঃ ১৯৯৫ইং), পৃ. ৯১।

২৩. আব্দুল মতিন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন (ঢাকা ঃ মাদল প্রকাশনী, ১৯৯০ ইং), পৃ. ৪।

২৪. আব্দুল হাকিম সরকার প্রমূখ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মাদকাসক্তি সমস্যা ঃ সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭০, অক্টোবর ২০০৪ইং), পৃ. ২০৬-২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

১। মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যাবলী

মাদকাসক্তির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বেশকিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

* যারা মাদকাসক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে মাদক গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা প্রবল মাত্রায় বর্তমান থাকে।
* নিয়মিত নেশা গ্রহণের সাথে সাথে নেশা আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়।
* মাদক গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, আসক্ত ব্যক্তির. কাছে তার প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্খা বিরাজমান।
* নেশা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাদক গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।
* আসক্ত ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, চিন্তাসহ অন্যান্য কর্মক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
* মাদকাসক্তি অনাচার শুধু ব্যক্তির একার সমস্যা নয়। এটা ব্যক্তি, দল, পরিবার, সমষ্টি ও গোটা সমাজের জন্য সমস্যা।
* মাদকাসক্তি অনাচার এর সাথে আরও বিভিন্ন ধরনের অনাচারমূলক কার্যক্রম জড়িত থাকে।
* যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন, পতিতাবৃত্তি, পুরুষদের পতিতালয়ে গমন ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, বিবাহ বিচ্ছেদসহ পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি।
* আসক্ত ব্যাক্তি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং দৈহিক কর্মকাণ্ডের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।
* প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক অসঙ্গতির কারণে আসক্তদের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

২। মাদকের ইতিবৃত্ত

মাদকদ্রব্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ মানুষের এক আদিম প্রবণতা। এ প্রবণতার কারণেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল কখনও আনন্দের উৎসব হিসেবে, কখনও ধর্মীয় উৎসবে। নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে, মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যতগুলো অভ্যাস রয়েছে তন্মধ্যে প্রাচীনতম হল মাদকদ্রব্যের ব্যবহার। তাদের মতে, "All the naturally occuring sedatives, narcoties, euphoraints, hallucinogens and excitants were discovered thousands of years ago, before the dawn a civilization..... By the late Stone Age man systematically poisoning himself..... There were some addicts long before there farmars."[২৫]

চিকিৎসার প্রয়োজন, সামাজিক বিনোদন, ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে এবং তান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার অনুসঙ্গরূপে দীর্ঘদিন ধরে মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আদিবাসীদের মধ্যে উদ্ভিদ থেকে তৈরি ড্রাগ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

---

২৫. A. Huxley. The Door of perception (London: Chatto and windus, 1954), P.67.

Dhaka University Institutional Repository

হেরোডোটাস, হিপোক্রাটিস, এরিস্টটল থেকে ভার্জিল, প্লিনি, এন্ডারসহ বহু প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকের লেখায় চিকিৎসার জন্য পপি ও আফিম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] মেসোপটেমিয়া, এশিয়া ও ইউরোপ ঔষধ হিসেবে আফিমের ব্যবহার শুরু হয় খৃস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে। ১৫০০ খৃস্টপূর্ব থেকে মিসরের চিকিৎসকগণ আফিমের ব্যবহার করত এ্যানেসথেটিকরূপে। সেখানকার আদিম অধিবাসীগণ তখন কোক পাতা চিবিয়ে খেত। মেক্সিকোর ইন্ডিয়ানগণ খৃস্টপূর্ব ১০০ অব্দে ধর্মীয় উৎসব ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য Hallucinogenic Psitocybin mashroom's নামক উদ্ভিদ নির্জাস গ্রহণ করত; যাকে তারা বলত 'ইশ্বরের দেহ মাংস'। ফনীমনসা জাতীয় (Pyote) গাছের নির্যাসও তারা ব্যবহার করত। আমেরিকার গির্জাগুলোতে (Pyote) ক্যাকটাস ব্যবহারের নিয়ম ছিল।[২৭]

খৃস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যুগে এশিয়ার মাইসরের আফিম ও পপিকে আনন্দ উদ্দীপক নেশা হিসেবে ব্যবহার করত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাইওয়ানে প্রস্তর যুগের ১০,০০০ বছর পূর্বেও গাঁজার ব্যবহার ছিল। চীনে খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে 'মাহুয়াং' নামক ড্রাগ 'ইনথেলেন্ট' রূপে ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রায় একই সময়ে চীনে সম্রাট সেনমুঙ্গ-এর শাসনামলে নেশাকর ড্রাগ হিসেবে গাঁজার ব্যবহার ছিল। প্রাচীনকালে চীন ছাড়াও পারস্য, তুরস্ক, মিসর ইটালী জার্মান এবং অন্যান্য দেশে গাঁজার ব্যবহার ছিল।[২৮]

খৃস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্যানাবিসের প্রচলন শুরু হয়। সম্ভবতঃ ভারতীয়রাই প্রথমবারের মতো আফিম, ধুতুরা এবং ভাঙ ব্যবহারের সূচনা করে। বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু সাধক ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ক্যানাবিস ব্যবহার করতেন। এটি সম্ভবতঃ ধ্যানে মগ্ন বা মনকে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করত। ক্যানাবিস এক ধরনের পানীয় হিসেবে বহু মন্দিরে পরিবেশন করা হত। ক্যানাবিস বিভিন্ন উৎসবাদি যেমন– তোলি, শ্রীভারতী এবং বিবাহ উৎসবে ব্যবহার করা হত। [২৯]

সাধু-সন্ন্যাসী, বাউল, যোগী, তান্ত্রিক ইত্যাদি ধরণের লোক ও সিদ্ধি সাধনায় 'একাগ্রতা সৃষ্টি ও ধ্যানস্থ' হওয়ার জন্য গাঁজা ও ভাঙ ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন পুরাণ ও উপকথায় নানা প্রসঙ্গে গাঁজার কথা পাওয়া যায়।[৩০] হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পুরাণে ধর্মীয় মর্যাদা প্রদান করে বলা হয়, ইন্দ্র তাঁর সহস্র চক্ষু, রোগ নাশক শক্তি ও দৈত্যনাশক ক্ষমতা দিয়েছেন এই গাঁজাকে। সেই থেকে হিন্দুদের কাছে গাঁজা গাছ 'পবিত্রতার' প্রতীক হয়ে আছে। তাদের কাছে স্বপ্নে গাঁজা গাছ এর পাতা দেখা সৌভাগ্যস্বরূপ। বেদে গাঁজা ও অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত পানীয় ভাঙকে দুশ্চিন্তানাশক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩১]

মাদকদ্রব্য সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে, "Nor does any one put new wine into old skin, if he does, the new wine will burst the skin , the wine will be wasted and the skin ruined fresh skins for new wine! And no one after dringking old wine wants new, for he says, the old wine is good."[৩২]

---

২৬. এস.ই. হক মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষিত (ঢাকা : ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ২৮

২৭. শাহীন আকতার, মাদকদ্রব্য ও বর্তমান বিশ্ব (ঢাকা : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ১৯৯০), পৃ. ১১।

২৮. আব্দুল হাকীম সরকার প্রমূখ, প্রগুক্ত, পৃ. ২০৮।

২৯. প্রগুক্ত, পৃ. ২০৮।

৩০. এ কে.এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামী নেশা (ঢাকা : মা প্রকাশনী, ১৯৯৩) পৃ. ৮৬।

৩১. আবদুল হাকিম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত.পৃ.১০৮।

৩২. The New English Bible, 1961, p. 100.

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞতার যুগে অন্যান্য অপরাধ ও অপকর্মের পাশাপাশি মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুরা পান তখন আভিজাত্য বলে মনে করা হতো। প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে সুরা পান ছিল অপরিহার্য উপাদান। ইসলামের বিকাশ লাভের পূর্বে আরব দেশে সুরা পান ছিল একটি গ্রহণযোগ্য রীতি কিন্তু নেশাগ্রস্ততা মানুষের জীবনে অনেক ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে বলে– ইসলাম এর প্রতি পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানী কার্যের অন্তর্ভূক্ত; সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৩৩]

মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিক্রিয়া জানা এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে মাদকাসক্তি নামক অনাচার বিদ্যমান। ৬০০-১০০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত চর্যাপদে বাংলাদেশের প্রচীন শুড়িখানায় গাছের ছাল-বাকল দিয়ে চোলাই মদ তৈরির তথ্য পাওয়া যায়।[৩৪]

যা হোক, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পপি ফুলের শুকনা রস ব্যবহার হয়ে আসছে। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির উপরে পপি ফুলের রসের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি গ্রীক ও রোমানগন অবহিত ছিল। ইংরেজ ভেষজবিদ ১৭০০ সালে সর্বপ্রথম আবিস্কার করেন যে, অনেকদিন ধরে মাদকদ্রব্য সেবনে এর উপরে প্রচণ্ড আসক্তির জন্ম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিস্কার হয় মরফিনের। মরফিন হচ্ছে আফিমের বিশুদ্ধ প্রকরণ। ১৮৯৮ সাল হতে হেরোইন ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে ধমনীতে এর ইনজেকশন দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হেরাইন এ সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত এবং আলোচিত ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য, সাদা বা বাদামী রঙের পাউডারের মতো। মাদকাসক্তদের কাছে 'ব্রাউন সুগার' নামে বেশি পরিচিত। এ মাদকদ্রব্যটির মূল উৎস হচ্ছে আফিম।

পোপাভার সমনিফেরাম নামক এক ধরনের উদ্ভিদের ফুলের রস থেকে আফিম তৈরি হয়। ১৮০৫ সালে মাটারনাম নামে একজন বিজ্ঞানী আফিম থেকে আরও শক্তিশালী বেদনানাশক দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং গ্রীক নিদ্রাবেদী 'মার্ফিউস' এর নামানুসারে এর নাম দেয় 'মরফিন'। পরবর্তীকালে ১৮৯৫ সালে জার্মান ফার্মাসিস্ট মরফিন থেকে অধিক গুণ শক্তিশালী বেদনানাশক দ্রব্য হেরোইন প্রস্তুত করেন। হেরোইনের নেশা মরফিনের তুলনায় ৩ গুণ এবং আফিমের তুলনায় ৩০ গুণ অধিক।[৩৫]

গাঁজা তৈরি হয় ক্যানবিস স্যাটাইভা নামের এক ধরনের উদ্ভিদের পাতা, ডাল, ফুল ও বীজ থেকে। গাঁজাতে সাধারণত তামাকের চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ কার্বন মনোক্রাইড বেশি থাকে, যার ফলে এ মাদকদ্রব্য সেবনে ফুসফুসে ক্ষত বা ক্যান্সারের অশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোকা পাতা হতে তৈরি হয় কোকেন। ১৫৩২ সালে পিজারো এটা আবিষ্কার করেন। ১৮৮৪ সালে কোকা পাতা থেকে কোকেন পৃথক করা হয় ভিন্ন রূপে। ১৮৮৪ সালে সিগমন্ড প্রয়েড মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় কোকেনের ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে অস্ত্রোপচারের সময় এ্যানাসথেটিক রূপে কোকেনের ব্যবহার শুরু হয়।[৩৬]

---

৩৩. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা : আয়াত নং ৯০।

৩৪. আবু তালেব, হেরোইন : আর এক মারণাস্ত্র (খুলনা : অমরাবতী প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১৩৬

৩৫. মুহাম্মদ সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

৩৬. এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

অ্যামফেটামিন এক জাতীয় কৃত্রিম ড্রাগ। ১৯৪০ সালে আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ও জাপান সরকার সৈন্যদের মানসিক অবসাদ দূর করে কর্মোদ্দীপক করে তোলার জন্য এ্যামফেটামিন চালু করে। কোকেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় ড্রাগ। ১৮৬৪ সালে দু'জন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফনমেরিং ও ফিশার বারবিচ্যুরেট আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ সাল হতে এটা ঔষধরূপে ব্যবহার হতে থাকে 'ভারনাল' ট্রেড নামে। ১৯৪০ সনে গবেষণায় ধরা পড়ে যে, এটা এক আসক্তিজনক দ্রব্য। ট্রাংকুলাইজারসের আবির্ভাব শত শত বর্ষ ধরে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ড. আলবার্ট হকম্যান ও ডিব্লিউ এ স্টোল এল.এস.ডি. আবিষ্কার করেন। এটা বন্দীদের নিকট হতে তথ্য বের করতে এবং শত্রুদেরকে অসমর্থ করতে ব্যবহৃত হয়। এটা চিকিৎসার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৭]

বাংলাদেশে ধুমপানের সূত্রপাত হয় সম্ভবত চট্রগ্রাম বন্দরে পর্তুগীজদের আনাগোনার সাথে সাথে। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার চুরুটের ব্যবহার ফ্রান্স, স্পেন, বৃটেনসহ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৮] তাই বলা যায়, অতীতকালের সাথে বর্তমানে সংযোজিত হয়েছে হেরোইন, প্যাথিড্রিন, ফেন্সিডিল ও ইয়াবা'র মতো মারাত্মক নেশাকর দ্রব্য। আর এই মাদকদ্রব্য ইতিহাসের ক্রমধারায় এখন শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে কাজ করছে।

৩। মাদকের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রকরণ

মাদকাসক্তি সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনেক মতামত রয়েছে। বিশিষ্ট ইংরেজ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জেমস্ উইলিস প্রদত্ত মাদকের শ্রেণীবিভাজনটি বহুলস্বীকৃত। তিনি মাদকদ্রব্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

ক. সেডেটিভ হিপ্নটিক বা নিদ্রা আকর্ষক মাদকদ্রব্য, খ. স্টিমুলেন্ট বা উত্তেজক মাদকদ্রব্য, গ. হ্যালো সিনোজেনিক বা অমূলক প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য। সেডেটিভ মাদকদ্রব্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়; ১. নারকোটিক এনালজেসিক যা মূলত বেদনানাশক শক্তিশালী ঔষধ হলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তির চৈতন্য আচ্ছন্ন করে এবং নিদ্রালস করে, ২. সেডেটিভ বার্বিচ্যুরেটর এ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য, দ্রুতঘুম আনা থেকে শুরু করে অহরহ আচ্ছনতা নিদ্রা সৃষ্টিতে এর জুড়ি নেই।[৩৯]

ইয়াবা, গাঁজা, হাশিশ, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকো, ক্যাফেইন, আমফেটামিন, বার্বিচুয়েট মেথাকোয়ালেন, ট্রাংকুইলাইজার্স, এল.এস.ডি. পেথেড্রিন, আফিম, কোডিন, থিবাইন, প্যাপাভারিন, নোসকাফাইন, নারকটিন, মেথাডন, ডেকাট্রোমোবামাইড, হাইড্রো মরফাইন, আলফেন্টানাইল, আলফামিথাইল, ফেন্টানাইল, সুপেন্টানাইল, লোফেন্টানাইল, এন্টোফাইন, অক্সিকোডন, ডিমেরাল, ক্যানাবিস, রেসিন, মদ, হুইস্কি, জিম, রাম, ভদকা, তাড়ি, পচাই, সুরাসার, ডিনেচাডছ, স্পিরিট বা মেথিলেটেড স্পিরিট, ক্লোরডায়াজিপক্সাইড, ডায়াজিপাম, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, ফরাজিপাম, ক্লোরজিপেট, নাইট্রোজিপাম, ট্রায়াজেলাম, ট্রেমজিপাম, গাঁজা, ফেন্সিডিল ইত্যাদি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাদক।

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৩৮. Encyclopedia Britanica (1978) Vol-20,P.839.

৩৯. মানস রায় চৌধুরী, জেনেশুনে বিষ করেছি পান, দেশ পত্রিকা (ঢাকা : ৫৫ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১৬ জুলাই ১৯৮৮) পৃ.২৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ভরতা সৃষ্টিকারী ঔষধের এক আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাজন করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে : ১. আচ্ছন্নভাবে উদ্রেগকর মাদক, যেমন- ক. আফিম ধরণের যথা-মরফিন, হেরোইন, পেথিড্রিন, কোডেইন, মিথাডোন ইত্যাদি। খ. বার্বিচুয়েট ধরনের যথা- গাঁজা, চরস, ভাঙ, সিদ্ধি। গ. এ্যমফেটামিন ধরনের, যথা- মেথিড্রিন, ডেক্রিড্রিন, ফেনফ্লোরামিন। ঘ. কোনকন জাতীয় কোকেন বড়ি বা নস্যি। ঙ. ভ্রম বা মায়া উৎপাদনকারী মাদক, যেমন- এল.এস.ডি. মেসক্যালিন। ২. বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, যেমন-ক. যন্ত্রণা নিবারক ঔষধ যথা- অ্যাসপিরিন, পেন্টাজোনিন। খ. পেট্রোলিয়াম উদ্ভূত দ্রব্য, যথা- আটা, শোঁকা, জুতো পালিশ শোকা, পেট্রোল শোকা।"[৪০]

বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য পরিস্থিতি

অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান তিনটি আফিম ও আফিমজাত পণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চলের কাছাকাছি দেশ হওয়ায় এবং প্রতিবেশী কয়েকটি দেশে বিপজ্জনক মাদকদ্রব্যের অবৈধ চোরাচালান ব্যবসা জমজমাট হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশকে গত প্রায় দেড় দশক ধরে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। [৪১]

মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও পাচারের জন্য এশিয়ার তিনটি সীমান্ত পয়েন্টকে তিনটি নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন- গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ওয়েজ। মায়ানমার (বার্মা), লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্ত গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল; পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও গোল্ডেন ক্রিসেন্ট এবং ভারত ও নেপাল সীমান্ত গোল্ডেন ওয়েজ নামে পরিচিত। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তের ল্যান্ডিকোটাল দিয়ে প্রচুর মাদকদ্রব্য ভারতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জল, স্থল ও আকাশ এই তিনপথেই অবৈধ মাদকদ্রব্য পাচার হয়ে থাকে, তবু বিস্তৃত জলপথই মাদকদ্রব্য চোরাচালানের অবাধ ক্ষেত্র হিসেবে অধিক উপযোগী।[৪২]

বিশ্বব্যাপী মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের ৫০০ কোটি মানুষের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষ এখন মাদকাসক্ত।"[৪৩] সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী কয়েক বছরের মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যহারের বিবরণ :

---

৪০. মীর আফরোজ জামান, মাদকের ভয়াল ধ্বংসের মুখে যুব সমাজ, সাপ্তাহিক রোববার (ঢাকা ঃ ২৬ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৫), পৃ. ৩০।
৪১. আলী হাসান, শতাব্দীর অভিশাপ ড্রাগসক্তি ঃ বিপন্ন তারুণ্য, মাসিক রোকসানা (ঢাকা : আগস্ট ১৯৮৮), পৃ. ২২।
৪২. মুহাম্মদ সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
৪৩. মৈয়দ শওকতুজ্জামান বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৩) পৃ.২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে আফিমজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং ব্যাবহার সংক্রান্ত চিত্র
(২০০৩-২০০৬, টন হিসেবে)

দেশের নাম (উৎপাদন)		২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
অষ্ট্রেলিয়া		৫৫.৬	৬৯.০	৭৪.৫	১২১.৩
ফ্রান্স		৪৮.৯	৪৭.৩	৫৫.৭	৬০.২
ভারত		৮০.৭	৮৩.৭	১০৪.৪	১১৬.১
স্পেন		৪.২	৪.১	২.০	৬.৮
তুরস্ক		৭৫.২	১৬.১	৪১.৬	৪৬.০
অন্যান্য দেশ		২৫.৫	১৬.৯	২০.০	২০.০
মোট	উৎপাদন	১৯০.১	২৩৭.১	২৯৪.২	৩৭০.৪
	ভোগ ব্যবহার	২৩৭.২	২৩৬.৩	২৪০.০	২৪০.০

Source: Report of the International Narcotics Control Board for, 2005, 24 feb, 2006, International Narcotics Control Board, United Nations. P. 26

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মাদকদ্রব্য ব্যবহারের নির্দিষ্ট পরিমাণের হিসাব না থাকলেও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উৎপাদন লক্ষ্য করলে আমাদের দেশের মাদক দ্রব্যের ভয়াবহতা অনুমান করা যায়। হেরোইন উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোর প্রায় সব ক'টি দেশের সাথে এ দেশের রয়েছে সরাসরি বিমান ও নৌ-যোগাযোগ। তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারী ভারতের সাথে বয়েছে ২৮৩ কি.মি. অভিন্ন সীমান্ত যা বাংলাদেশকে মাদকাসক্তির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা যোগ করলে এ সংখ্যা যে কয়েক গুণ বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪৪] কিন্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দেয়া এক তথ্যানুযায়ী গত দশ বছরে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রায় ৩ লাখের উপর হেরোইন সেবী।[৪৫]

২০০৫-২০০৬ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের শুধু মোহাম্মদপুর অঞ্চলেই ৪০ হাজারের মতো মাদকাসক্ত লোক রয়েছে, তাদের অধিকাংশই হেরোইনসেবী।[৪৬] অবশ্য হেরোইন সেবনের পরিমাণ সাম্প্রতি বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়ে দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে ফেন্সিডিলের ব্যবহার। এ দেশে প্রতিবছর ৪ লক্ষ ৪০ হাজার গ্যালন দেশী মদ ব্যবহৃত হয় এবং চোরাই পথে আনীত বিপুল পরিমাণ মদসহ দেশী মদের ব্যবসা ব্যাপক আকারে জমে উঠেছে শহরের হোটেল ও পানশালাগুলোয়।[৪৭] আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের ট্রানজিট হিসেবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে। 'বাংলার প্রগতি' নামক জাহাজ ইউরোপের পথে চট্টগ্রাম বন্দর ত্যাগের পর গভীর সমুদ্রে এতে হেরোইনের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১৯৮৩ সালে

৪৪. মোস্তফা হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৪৫. মোঃ আবু তাহের, মাদকের অপব্যবহার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (ঢাকাঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) বুলেটিন নং ৬, জুলাই ৯২ ইং, মার্চ-৯৩ সংখ্যা, পৃ. ৬০২।

৪৬. মোঃ আবদুল হাকিম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৭. নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মাসিক গণস্বাস্থ্য (ঢাকা ঃ ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৫ইং)। সর্বপ্রথম হেরোইন পাচারের ঘটনা ধরাপড়ে। এছাড়া ১৯৮২সালে বাংলাদেশের শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ 'বাংলার মিতা' থেকে ২৪ কেজি হাশিশ ও ৩৮ কেজি মারিজুয়ানা আটক এবং 'সলিডারিটি' থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

কেজি মারিজুয়ানা ও ৩ পাউন্ডের হাশিশের প্যাকেট। একই সালে চট্টগ্রাম বন্দরে শিপিং কর্পোরেশনের 'বাংলার বাণী' জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়।[৪৮] তারপর থেকে হেরোইন গ্রহণ এবং পাচার উভয়ই বাংলদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের জানা বিষয়ে পরিণত হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্রের হাতে বাংলাদেশ যে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের 'করিডোর' হিসেবে শক্ত ভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। আফিম ও হেরোইন ভারত বা বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে পাচার হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলে যায়। আর এভাবেই দিন দিন বিশ্বময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজের মূল প্রাণশক্তি যুব সমাজ।[৪৯]

২০০৫ সালে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) বাংলাদেশে মাদক পাচারের দায়ে ১৭৫৩টি মামলা রুজু হয় এবং ১৪৮৬ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। নিম্নের ছকে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য চোরাচালানের বিষয়টি আরও পরিষ্কার করবে। যেমন–

আটককৃত মাদক দ্রব্যের পরিমাণ, মামলা ও আসামী সংক্রান্ত তথ্য ছক

২০০৫ সন মোতাবেক

মাদকদ্রব্যের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আটককৃত মাদকের পরিমাণ
হেরোইন	৩৬	৫৫	৩.১৫১ কেজি
কোকেন	১	২	০.১৫ কেজি
চরস	৫	৫	২.৫৪৮ কেজি
আফিম	২	২	০.৭৭ কেজি
গাঁজা	৩২৮	৩৫৫	১,০৭৭১৬১৯ কেজি
গাঁজা গাছ	-	-	১৫,৩৬২ কেজি
গাঁজা বীজ	-	-	১ কেজি
গাঁজা সিগারেট	-	-	৩,৪৮৬ টি
চোলাই মদ	৫১৯	৪৮৪	৯,৪০৮.৩২ লিটার
বিদেশী মদ (কোয়ার্ট)	১০	১৭	১১৯ লিটার
বিদেশী মদ (বিয়ার)	৫৭	৪৮	৩৫৫.৮৭৫ কোয়ার্ট
রেকটিফাইড স্পিরিট	-	-	৫২৩ ক্যান
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৫৬	৪৯	৫৮.০৪৮ লিটার
ফিন্সিডিল (বোতল)	১১	১১	৪৩৪ লিটার
ফেন্সিডিল (খুচরা)	২৩৬	১৩৬	৩২,৯৮০ বোতল
মৃতসঞ্জীবনী	-	-	১৮২ লিটার
পেথিড্রিন	১	-	৩২ বোতল
টি. ভি. জেসিক	৩	৩	৫৪ অ্যাম্পুল
ইনজেকশন	১৮	১৬	৯৯৩ অ্যাম্পুল
জাওয়া	-	-	২৫,৭৩৪৪ লিটার
মোট	১.৩৬৫	১.১৮৩	

তথ্যসূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুলেটিন ২০০৫, পৃ. ৫।

৪৮. আব্দুল হাকিম সরকার প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৯. মোহাম্মদ সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ২০০৫-২০০৬ সালে আটককৃত বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের পরিমাণ, মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত মামলাসমূহ ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা

মাদকদ্রব্যের নাম	আটককৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ		মামলার সংখ্যা		গ্রেফতারকৃত সংখ্যা	
	২০০৫	২০০৬	২০০৫	২০০৬	২০০৫	২০০৬
হেরোইন	৬ কেজি ৫.৫ গ্রাম	১৫ কেজি ৯.৫ গ্রাম	৪২	১৪৭	৪২	১৭১
কোকেন	-	৩ কেজি	-	৩	-	১০
আফিম	৮ কেজি ৮৮৬.৫গ্রাম	৬ কেজি ৪৫২ গ্রাম	৫	১৫	৫	১৫
চরস	৫কেজি ১৩১ গ্রাম	১৫কেজি ৫৬২গ্রাম	২১	১০	২১	১৪
ভাঙ	৫৯০৩ কেজি ৫৬৮ গ্রাম এবং ৩২৮৭টি চুরুট	৪ মেট্রিক টন ৬৭কেজি ২৬১.৫ গ্রাম এবং ৪৪,৬৬১ টি গ্রাম	৭১০	৬৬৭	৭১০	৫৮৫
প্যাথেড্রিন	১৪৯৫ অ্যাম্পুল	২০৩২৭অ্যাম্পুল	৬	১২	৬	১১
ফেন্সিডিল	-	২০৪৪ বোতল	-	১৬	-	১৭
দেশি মদ	১৬২৬.৬ লিটার	৫১৮.৬৫ লিটার	১৩৫	৩০	১৩৪	২২
বিদেশী মদ	১৪৪১ কোয়ার্ট ৪০৫৬ ক্যান বিয়ার	৫১৮ কোয়ার্ট ২৯৭৪ ক্যান বিয়ার	৩৯৬	৭৫	৩৯৬	৭৯
আইডি	১লক্ষ ১০ হাজার ১৭৫.৫ লিটার	৯৪৩৭ লিটার	১৫৮৮	৭৩৮	১৫৮৫	৫৩০
মৃতসঞ্জীবনী সুধা	৮ কোয়ার্ট	৩৯০ কোয়ার্ট	১০	৬	১	৫
পরিশোধিত স্পিরিট	২৪৯৬.৫লিটার	৪৯২.৯৫ লিটার	১২৯	১৭	১২৯	১২
অপরিশোধিত স্পিরিট	১৪২৫.৩ লিটার	১৫৮ লিটার	৮২	১৭	৮২	১৫
মোট	-	-	৩১২৪	-	৩১১১	১৪৮৬

তথ্যসূত্রঃ এ. এইচ. সরকার 'এ্যাবিউজ অব ড্রাগ-ট্রি গ্রোয়িং সোশ্যাল ইন বাংলাদেশ' দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, ভল্যুম- ৬, পৃ. ৪২-৪৩।

উপর্যুক্ত সারণিগুলো দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কত ভায়াবহ রূপে বেড়ে চলছে। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, যশোর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল কয়েকটি স্পট হয়ে রাজধানীর অভিজাত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পৌছে যাচ্ছে। উত্তর সীমান্তে চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায় বস্তা ভর্তি করে আনা হয় ফেন্সিডিল। এরপর ১০টি, ৫টি ও ২০টি মাইক্রোবাস সীমান্ত এলাকা থেকে রাজধানীতে ফেন্সিডিলের চালান এসে পৌছায় নগরবাড়ীর এলাকার প্রভাবশালী একটি মাদক ব্যবসায়ী চক্রের হাতে। এ চক্রটির দায়িত্ব ফেন্সিডিলের চালান বহন করা এবং সেখান থেকে ঢাকার পার্টির কাছে তা বিক্রি করা।[৫০]

৫০. মীর আফরোজ জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ বছর ঢাকার ঐতিহ্যবাহী হোটেল পূর্ণিমা (আবাসিক) এ ইয়াবা নামক মাদক ও ইয়াবা সুন্দরীদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী মাদকাসক্তির বিষয়টি সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে আধুনিক মাদক দ্রব্যের এক নতুন কালো অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। [৫১]

বাংলাদেশের মফস্বল শহরের তুলনায় রাজধানী ঢাকায় নেশাকর উপাদানের বিস্তার হয়েছে আরও অনেক বেশি। গাঁজা, হেরোইন, প্যাথিড্রিন, ফেন্সিডিল সবকিছুই এই তালিকায়। ঢাকা শহরে বর্তমানে ছোট-বড় মিলিয়ে দুইশত কেন্দ্রে ফেন্সিডিল বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন অভিনব কায়দায় এসব মাদকদ্রব্য পাচার হয়ে রাজধানীতে আসছে। ফেন্সিডিলের অধিকাংশ চালান এখন প্রাইভেটকার, মাইক্রোবাসে করে নেয়া হচ্ছে রাজধানীতে। কারণ বাসে করে আনা নিরাপদ নয়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের চেকপোস্টের ভয়। প্রাইভেটকার তল্লাশী হয় না বললেই চলে। কারণ নানা ভি.আই.পি. বা রাজনৈতিক ব্যক্তিসহ সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষজন চলাচল করে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাসে, তাই পুলিশ সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য না পেলে সহজে প্রাইভেট কারে তল্লাশি চালায় না। নদী পথে ট্রলার যোগেও মাদক সরবরাহ হচ্ছে পূর্ণ গতিতে।

ঢাকা শহরের মাদক দ্রব্যের প্রধান সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বস্তিতে। হেরোইন এবং ফেন্সিডিল বিক্রির নিরাপদ স্থান বস্তি। প্রায় সব বস্তিতেই মাদকের ব্যবসা চলে। এ সকল বস্তিতে লাখ লাখ টাকার হেরোইন এবং ফেন্সিডিল বিক্রি হয়। [৫২]

শুধু ঢাকা শহরেই নয়, সারা দেশে এ ধরনের মাদকের ছড়াছড়ি। এক শ্রেণীর বিপথগামী তরুনই মাদকদ্রব্যের বিক্রেতা। যারা বিক্রির সঙ্গে জড়িত রয়েছে তারা একসময়ে বিনামূল্যে হেরোইন, ফেন্সিডিল, গাঁজা সেবন করেছে। এক পর্যায়ে যখনই তা নেশায় পরিণত হয়েছে, তখন বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রক কিছু রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় সমাজ সেবকরা তাদেরকে অপারেটর হিসেবে পরিচালিত করে। প্রতিদিন বিক্রির টাকার ভাগ-বাটোয়ারা হয় গভীর রাতে অত্যন্ত কড়া প্রহরায়।[৫৩]

অবৈধ মাদকদ্রেব্যে সারা দেশ এখন সয়লাব। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য। গুলশান, ধানমন্ডি, বনানী, বারিধারা, অভিজাত এলাকার ডিসকো ক্লাব থেকে শুরু করে চিপাগলির টঙ দোকানেও অবৈধ মাদকদ্রব্যের ছড়াছড়ি। অবৈধ মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানি, চোরাচালান ও অবৈধ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের চতুর্মূখী কার্যক্রমেই মূলতঃ সারাদেশে আজ মাদকদ্রব্যের অবাধ বিস্তার। ২০০০ সালে গুলশান থানায় অভিজান চালিয়ে মাছের পোনার ড্রামের ভেতর থেকে পলিথিন মোরানো অবস্থায় ২৭০ গ্রাম আফিম, ১১৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

সাম্প্রতিক প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে জুলাই হতে ডিসেম্বর-২০০৪ পর্যন্ত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের কারণে ২৬৭টি মামলা দায়ের করেছে। ও ৩০৮ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে মেট্রো উপঅঞ্চল থেকে ৮৭২০ বোতল ফেন্সিডিল, ২২১ গ্রাম হেরোইন, ২৬০১এ্যাম্পুল টিডিজেসিক ইনজেকশন আটক করা হয়। আগের বছর একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১৫২৮ বোতল ফেন্সিডিল, ১৫৭ গ্রাম হেরোইন, ২৬০১ এ্যাম্পুল টিডিজেসিক ইনকেজশন। তাছাড়া জুলাই' ২০০৪ থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত সময়ে আরও ৪৯৭ এ্যাম্পুল প্যাথিড্রিন, ১৫৬ লিটার বিলাতি মদ, ৫১২ লিটার রেক্টিফাইড স্পিরিট, ৩০ কেটি ৯০ গ্রাম চরশ ও ৯০০ লিটার ডিনেচার্ড স্পিরিট আটক করেছে। [৫৪]

---

৫১. দৈনিক যুগান্তর ২২শে অক্টোবর ২০০৭।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৫৪. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ঃ ১৪ জানুয়ারি ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

গত কয়েক বছর আগে ২৪ কেজি হেরোইনসহ তিন পাকিস্তানী নাগরিকের গ্রেফতার আরও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এ দিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার এর নেতৃত্বে তাঁর ৩নং টিম গত ১/১/২০০৫ থেকে ২১/৪/২০০৫ পর্যন্ত ৫৪০১ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। উদ্ধারের সঙ্গে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৫৫]

ডেপুটি ডাইরেক্টর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ঢাকা মেট্রো কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ভিত্তিক প্রতিবেদন জানুয়ারি ২০০৫ থেকে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত তিন মাসের কার্যকালের একটি ছক নিচে তুলে ধরা হলো

মাসের নাম	মামলার স্যখ্যা	গ্রেফতার	মালামাল উদ্ধার
জানুয়ারী	৩৮	৫৩	হেরোইন ১১১গ্রাম, ফেন্সিডিল ২২৫ বোতল কোকেন ৫০০ গ্রাম, গাঁজা সোয়া ৫ কেজি, রেক্টিফাইড স্পিরিট ৩ লিটার, বিয়ার ৩২৮ ক্যান, চোলাই মদ ২৬৮ লিটার।
ফেব্রুয়ারী	৫০	৬০	হেরোইন ৩৩ গ্রাম, ফেন্সিডিল ২১১ বোতল চরশ ৪ গ্রাম, রেক্টিফাইড স্পিরিট ৭ লিটার, বিদেশী মদ সাড়ে ৭ লিটার, বিয়ার ১৯৫ ক্যান, চোলাই মদ ১২০০ লিটার, টিটি জেসিক ইনজেশন ১ অ্যাম্পুল।
মার্চ	৪১	৩৯	হেরোইন ২০ গ্রাম, ফেন্সিডিল ৪৫০ বোতল, গাঁজা সাড়েচার কেজি, প্যাথেড্রিন ২৬ অ্যাম্পুল, রেক্টিফাইড স্পিরিট সোয়া ৩ লিটার, বিলাতী মদ ৯ বোতল বিয়ার ২৪ ক্যান, চোলাই মদ ৬ লিটার।

উৎস: সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

এভাবেই অবৈধ মাদকদ্রব্যের বিষাক্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশ। শুধু অন্ধকারেই হারিয়ে যাচ্ছে না, বিষাক্ত মাদকদ্রব্য সেবন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অসংখ্য মানুষ। ১৫-০২-২০০৪ ফেনীতে বিষাক্ত রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে প্রায় ৫০ জন লোক মারা যায়। আক্রান্ত হয়েছে কমপক্ষে শতাধিক মানুষ। এর আগে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে ফেনী জেলায় ৯ জন মারা গিয়েছিল। দেশে প্রথম রেক্টিফাইড স্পিরিট ট্রাজেডি ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের ১৪ এপ্রিল গাইবান্ধা জেলায় নববর্ষ উপলক্ষে বিষাক্ত মদ রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে শতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছিল। পরবর্তীতে ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও এলাকার বেগুনবাড়ীতে বিষাক্ত রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে ১২ জন মারা গিয়েছিল। এরপর ২০০৪ সালেও নরসিংদী জেলায় যে রেকটিফাইড স্পিরিট ট্রাজডি ঘটেছিল তাতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যের সংখ্যা দাঁরিয়েছিল ১২৬। সরকারী হিসেব মতে বিষাক্ত রেক্টিফাইড স্পিরিট পান করে গত ৫ বছরে অন্তত ২০০ ব্যক্তির মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৬]

৫৫. মীর আফরোজ জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫৬. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা : ২৫ এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং এ সকল তথ্যের পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মাদকাসক্তি নামক অনাচার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিধি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে, যার ভয়াবহতায় সচেতন মহলের অনেকেই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত।

৪। বাংলাদেশের মাদকাসক্তির কারণসমূহ

মাদকদ্রব্য ভয়ঙ্কর এক সর্বনাশা ক্ষতিকর দ্রব্য। ক্ষতিকর জেনেও মানুষ মাদকাসক্ত হয়, কিন্তু কেন? সে বিষয়ে গবেষক পণ্ডিতদের মধ্যে নানা জনের নানা মত। এ ব্যাপারে মতের ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে তারা একমত, "হীনমন্যতাবোধ আসক্তির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ।"[৫৭] বারেনসের মতে, "যারা নিজেদেরকে হীন বা অস্বাভাবিক এবং বাস্তব পরিস্থিতির হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যই নেশা গ্রহণ করে থাকে।"[৫৮] কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মাদকাসক্তিকে এক কথায় জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে পলায়নের কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী J.A. Clausan তার এক নিবন্ধে সমকালীন মার্কিন সমাজে মাদকদ্রবের ব্যাপক প্রসারের কারণ সম্পর্কে তিন ধরনের মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যার প্রতিটি কারণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা যেতে পারে।

ক. মাদকদ্রব্যের আমদানিকারক ও ফেরিওয়ালারা অপরের জীবন ধ্বংসের বিনিময়ে নিজের ভাগ্য গড়ার কাজে নিষ্পাপ ও দুর্বলচেতা মানুষের হাতে ড্রাগস তুলে দেয়। খ. বনিবনার অভাবে বা জীবন-যুদ্ধে ব্যর্থতার ফলে অনেকে মাদকদ্রব্যের মাঝে মুক্তি খুঁজে। গ. মাদকাসক্তি এক ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আচরণ এবং এ আচরণ সমাজের একই মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেনতার দ্বারা প্রভাবিত মানুষের মাঝে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।[৫৯] এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পরিসরের চেয়ে যে সব সঙ্গী-সাথীর সাথে মেলামেশা করেও যে পরিবেশে বসবাস করে, সেগুলোর প্রভাবই তাকে মাদকাসক্তির প্রতি বেশি আকৃষ্ট করে।

মাদকাসক্তির জন্য দায়ী বিশ্বব্যাপী, এসব সাধারণ কারণের পাশাপাশি বাংলাদেশে মাদকাসক্তির জন্য আরও অনেক কারণ দায়ী। বিশেষ করে মানবিক সম্পর্কের অবনতি, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, সম্ভাবনাময় যুব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি এ দেশে মাদকাসক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। কারণ পূর্বে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, যৌথ পরিবারপ্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক গণ্ডির ভেতরে স্থায়ীভাবেই সম্ভব হতো। কিন্তু আধুনিককালের দ্রুত নগরায়নের ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। মানুষের প্রতি মানুষের পরস্পর স্নেহ ভালবাসা মমতা লোপ পাচ্ছে, যার কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন আশ্রয় স্থল খুঁজে না পেয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব ও হতাশার কারণে সে আশ্রয় খুঁজে ফেরে মাদক দ্রব্যের জমজমাট আড্ডাখানায়। এভাবেই গড়ে উঠে মাদকাসক্ত যুব সমাজ।

তবে কোন ব্যক্তি হঠাৎ করেই আসক্ত হয়ে পড়ে না বরং মাদকদ্রব্য ব্যবহারে তার মনোভাব, বিশ্বাস বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এক পর্যায়ে মাদকদ্রব্যকে নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করে।[৬০]

---

৫৭. এ. এম. নাজিবুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

৫৮. মোস্তফা হাসান, মাদকাসক্তি নিরাময়ে পরিবারে ভূমিকাঃ একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা : যুক্তসংখ্যা ৫৯, ৬০,৬১ অক্টোবর, ১৯৯৭ ইং, জুন ১৯৯৮ ইং), পৃ.৭৯।

৫৯. Roben K. Merton and Robert Nisbet (eds), Contemporary Social problems. (New York: 1971), p. 205.

৬০. আবদুল হাকিম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

মাদকদ্রব্যের ব্যাপক সরবরাহ হেতু সহজলভ্যতার পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে মাদকাসক্তি অনাচার কিভাবে স্থান করে নেয়, সে সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

"On post liberation social upheaval, change of value system, personal and community frustration, economic crisis, all seem to be acting as personal and social strains which are alleged to lead to the development of the habit of drug abuse depending on one's personal and social coping capability".[৬১]

মাদকাসক্তির কারণ অনুসন্ধানে যে সকল গবেষণা-কর্ম হয়েছে তার প্রায় প্রতিটি গবেষণাতেই নিম্মোক্ত কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন– ১. কৌতুহল, ২. বন্ধু-বান্ধবের চাপ, ৩. হতাশা, ৪. ভৌগলিক সুবিধা থাকা, ৫. পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ৬. চিত্তবিনোদনের অভাব, ৭. অজ্ঞতা, ৮. ব্যক্তিগত কারণ, ৯. ধর্মীয় অনুভূতির অভাব, ১০. ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।[৬২]

অন্য এক গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে মাদকাসক্তির কারণ নিম্নরূপ: ১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, কৌতুহল ২. আসক্ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা ৩. হাতে প্রচুর অর্থ এসে যাওয়া, ৪. বেকারত্ব/ নিঃসঙ্গতা, ৫. মাদক ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শ/ সহযোগিতা, ৬. পারিবারিক বন্ধন, নিয়ন্ত্রন ও নিয়ম-কানুনের শিথিলতা এবং ৭. আপনজনের মৃত্যুতে শোকে পড়ার পর।[৬৩]

বাংলাদেশের মাদকাসক্তির জন্য মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, কৌতুহল, হতাশা ও বেকারত্ব সর্বপেক্ষা বেশি দায়ী। এ ছাড়া অবাঞ্চিত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকার অভাব এবং পাশাপাশি ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে প্রাপ্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান তরুন মনে যে নীরব দ্বন্দ্বের জন্ম দিচ্ছে, তা থেকেও সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য-নতুন মাদকদ্রব্য গ্রহণের মতো এ্যাডভেঞ্চার। মাদক প্রতিরোধ করতে না পারলে সম্ভাবনাময় তরুণসমাজ তার জীবনীশক্তি হারিয়ে একটি পঙ্গু জাতিতে পরিণত হবে।

---

৬১. Report on the study of drug Abuse Among the students in Dhaka City: Prevalance And Related Factors' 1991, Dept. of Psychiatry: (IPGMR) Dhaka, P.10.

৬২. আবদুল হাকিম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৬৩. বশিরা মান্নান, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি নিরাময়ে পরিবার ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন (ঢাকাঃ বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য বিরোধী ফেডারেশন, ১৯৯৪ ইং) পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

'সামাজিক অনাচার' হিসেবে বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতি নামক অনাচার দিনদিন অপ্রতিরোধ্য গতিতে দেশের অর্জন, অগ্রগতি ও উন্নয়নধারাকে বাধাগ্রস্ত করছে। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও প্রশাসনে, রাজনীতিতে এবং সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির কারনে বিরাজ করছে অস্থিরতা, অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতা। অত্যন্ত জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি নামক অনাচার এর মূলোৎপাটন না করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব ব্যাংকের সাথে এক বৈঠকে এ বিষয়ে বি.এন.পি. সরকারের তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছিলেন "দূর্নীতি সব দেশেই আছে, বাংলাদেশে হয়তো এক ডিগ্রী বেশী। সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে, আশা করছি দুর্নীতি কমবে"[৬৪] ।

সমাজের উন্নয়ন অগ্রগতি ও সংহতির প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। "১৯৯৪ সালে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত কান্ট্রি কমার্শিয়াল গাইড" এ বাংলাদেশে বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকেও বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান বাধা হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করেছে"[৬৫]। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে সফররত বৃটিশ প্রতিমন্ত্রী ডগলাস আলেকজান্ডার বিনিয়োগের পথে দুর্নীতিকে অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেন। "দুর্নীতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সু-শাসনের অভাবের কারনে দেশটির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে"[৬৬]।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪এর ৩(১) ধারার আওতায় ২১শে নভেম্বর ২০০৪ সালে স্বাধীন দূর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ কমিশন সম্পর্কে এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল সি প্যাটেল এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন। যদিও দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে তবে এর কাজ একেবারে ধীরগতিতে এগোচ্ছে"[৬৭]। ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের দুদক সম্পর্কে হতাশাজনক উক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং দুদক চেয়ারম্যান সুকৌশলে দমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসত্য প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে স্মরণাতীতকাল থেকে দুনীতি ছিল। সমাজের পরিবর্তনে দুর্নীতির কৌশল পদ্ধতি এবং ক্ষেত্রের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দুর্নীতি এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, মনে হয় এটি অনুকরণীয় সামাজিক নীতি ও স্বীকৃত আচারণে পরিণত হয়েছে।

---

৬৪. 'দৈনিক প্রথম আলো' ২জুন ২০০৫ইং।

৬৫. World Bank improving the investment climate in Bangladesh- 2003

৬৬. "দৈনিক দিনকাল" ২২ ডিসেম্বর ২০০৪

৬৭. "দৈনিক মানবজমিন" ২২ জুলাই ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

১। দুর্নীতির পরিচয় ও শ্রেণীবিন্যাস

দুর্নীতি একটি ব্যাপক ও জটিল প্রত্যয়। দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ জটিল কাজ। দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবী প্রভৃতির অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। Social Work Dictionary-র ব্যাখ্যা অনুযায়ী- "Corrption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extortion, influence peddling and special treatment given to sone citizens and not to others"[৬৮]..... রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনের দুর্নীতি বলতে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করাকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গণপ্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলা হয়। ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী রামনাথ শর্মার মতে, "In corruption a person wilfuly neglected his specified duty in order to have an undue advantage."[৬৯]- অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।

দুর্নীতি হলো দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ। স্ব-স্ব পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কৃত অপরাধমূলক আচরণই হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি এবং ভদ্রবেশী অপরাধ (White collar crime) সহধর্মী ও সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রকৃতি ও কলাকৌশলগত দিক হতে দূর্নীতি ভিন্নধর্মী অনাচার। যা দুর্নীতিবাজদের দৈহিক অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন- উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার ব্যবহার, অবৈধভাবে পেশাগত প্রভাব খাটানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি।

২। দুর্নীতির শ্রেণীবিন্যাস

দুর্নীতি হলো একটা সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতি এমন এক ধরণের অপরাধ যা গোপনীয়ভাবে দু'ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত হয়। "Corruption is a crime committing of which results Through collusive arrangement between committing persons and persons legally and morally responsible for combating such crimes."[৭০]

৩। দুর্নীতি চারটি দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করা যায়

প্রথমত, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি।

(Corruption creeps into the formal decision making process of the state at high levels).

---

৬৮. Upendranath tagor, Corruption in ancient India, মোঃ আতিকুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকা ঃ আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৩৩৫।

৬৯. Ramnath sharma, Indian social problem (Bombay: Media promoters and publishers Pvt. Ltd. 1942). p.101.

৭০. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক বিধি-বিধান এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বহির্ভূত খাতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পাদিত দুর্নীতি। (Corruption creeps in administering regulations and proveding services in non economic fields of state activities or operations.) এ ধরনের দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক বহির্ভূত বিভাগীয় দুর্নীতির (Departmental corruption in non-econimic fields) শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেমন- অবৈধভাবে ভূমি রেকর্ড সংশোধন, নিম্ন আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত সমন বা গ্রেফতারী পরোয়ানা এড়িয়ে যাওয়া, পাসপোর্ট ইস্যু, হাসপাতালে রুগী ভর্তি, ভাল কোন স্কুল বা কলেজে ভর্তি, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রভৃতি বিভাগীয় দুর্নীতির উদাহরণ।
তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক লেন-দেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধ লেন-দেনের মাধ্যমে সংঘটিত দুর্নীতি। এ ধরনের দুর্নীতিকে Departmental corruption in economic fields or transaction হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

চতুর্থত, আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং দায়-দেনা সম্পর্কিত দুর্নীতি। (Corruption involving avoidance of lawful obligations and liabilities) আইনগতভাবে দায়বদ্ধ অর্থ পরিশোধ যেমন-কর প্রদান, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণা (Over invoicing of imports and under invoicing of exports) প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত দুর্নীতি সরকারি অর্থ ও তহবিলের অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি এই শ্রেণীভুক্ত।"[৭১]

রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের দূর্নীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়দুর্নীতি ধ্বংসাত্মক। বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ। জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ। যখন জনগণের স্বার্থ বিবেচনা না করে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তখন রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি দেখা দেয়। ১৯৮০-এর দশকে সরকার প্রধানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশনের প্রধান হিসেবে জুনিয়র অফিসারকে নিয়োগ দান এবং প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে ক্ষমতাসীন দলের এমপিদের বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান, রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী বিভাগের দুর্নীতির বাস্তব উদাহরণ।[৭২]

অর্থনৈতিক বহির্ভূত ক্ষেত্রে দুর্নীতি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক পরিলক্ষিত হয়। স্কুল-কলেজের ভর্তি ও হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক খাতে দুর্নীতি সবচেয়ে ব্যাপক এবং মারাত্মক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের দুর্নীতি অবৈধভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থ গ্রহণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। যেমন- ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে কাউকে কোন ঠিকাদারী কাজ পাইয়ে দেয়া।

আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং দায়-দেনা এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। আয়কর ফাঁকি দেয়া, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রশাসনকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে মিথ্যা বিবরণী দান, প্রভৃতি দুর্নীতি হয়ে থাকে। দুর্নীতি অভিন্ন স্বার্থে প্রণোদিত লোকদের মাধ্যমে বেশি সংঘটিত হয়। আইনগত বাধ্যবাধকতাজনিত দায়বদ্ধতা এড়ানোর জন্য সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি অহরহ ঘটছে। গোপন আঁতাতের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি বিরাজ করছে।

---

৭১. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, ৩৩৬।
৭২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪। বাংলাদেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাতসমূহ

দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ ও প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে যেসব খাতে শতকরা ৫ ভাগের বেশি দুর্নীতি লক্ষ্যণীয়, তার ভিত্তিতে পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতকে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাতসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও সমীক্ষা দেয়া হল।

(ক) পুলিশ

বাংলাদেশে নানা কারনে পুলিশ সারা বছর জুড়েই তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার বিষয় হয়ে থাকে। এই আলোচনার বিষয়বস্তু পুলিশের চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, মামলা দায়েরের মাধ্যমে হয়রানি, গ্রেপ্তার বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে টাকা ছিনতাই। ট্রাফিক সার্জেন্টদের বিরুদ্ধে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে চাঁদাবাজির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। চাঁদাবাজি তো বটেই, ছিনতাই আর লুটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় আবারও সংকটের মুখে পড়েছে পুলিশের ভাবমূর্তি।

২০০৫ সালে TIB কর্তৃক পুলিশ বিভাগের ওপর যতগুলো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্য থেকে পুনরাবৃত্তি পরিহার করে ২৫৫টি প্রতিবেদন অভিক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে থানা পুলিশ ৭৭.২৬% এবং তার পরেই ট্রাফিক পুলিশ, যার হার ১১.৩৭%। এছাড়া পুলিশ সুপারের দপ্তর (৩.৫৩%), র‍্যাব (৩.৫৩%), ডিবি পুলিশ (২.৭৫%), পুলিশের বিশেষ শাখা (০.৭৮%) ও সিআইডি (০.৬৮%)-এর উপর দুর্নীতির প্রতিবেদন অভিক্ষীত হয়েছে। পুলিশের দুর্নীতির মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে ঘুষ গ্রহণ যার হার ৩১.৭৬%। এছাড়া জোর করে অর্থ/সম্পদ আদায় (৩৩.৩%) ও ক্ষমতার অপব্যবহার (২৫.৮৮%), উল্লেখযোগ্য। পুলিশ খাতে প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন করণিক শ্রেণীর কর্মচারী যার হার ৩৬.০%। এছাড়া অধস্তন ৩২.০% নিম্নপদস্থ কর্মচারী ১৮.৬% ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত ছিলেন যথাক্রমে ২.০% ঘটনায়। আর ১১.৫% ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তার শ্রেণী জানা সম্ভব হয়নি।[৭৩]

পত্র-পত্রিকায় পুলিশ সম্পর্কিত তথ্য আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জরিপের ফলাফল দেখলে এটাই প্রমাণিত হয় পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ অংশ। TIB তথ্য ভাণ্ডার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০০ সালের বাহিনী শেষ ৬ মাসে ২১টি পত্রিকায় মোট ৩২০টি দুর্নীতি রিপোর্ট ছাপা হয়। আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনীর (পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও ভিডিপি) ওপর। এর মধ্যে ২৮৫টি রিপোর্ট পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতি বিষয়ক। ২৮৫টি রিপোর্টের মধ্যে ৫০.৯ শতাংশ ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত, ১৭.৫ শতাংশ ঘুষ সংক্রান্ত, ১৫.৮ শতাংশ দায়িত্বে অবহেলা সংক্রান্ত। রিপোর্টে বলা হচ্ছে– ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রধান কারণ হচ্ছে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের কৌশল হিসেবে পুলিশ আইনের ৫৪ ধারার যথেচ্ছ ব্যবহার পুলিশের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত নানা পর্যায়ে অর্থের একটি নির্দিষ্ট লেনদেন হয়ে থাকে এবং প্রথমেই পুলিশকে অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংকের কোটা বেঁধে দেয়া হয়। এই কোটা পূরনের জন্যে অনেক সময় নিরীহ জনসাধারণকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে অর্থ আদায় করা হয়।[৭৪]

---

৭৩. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশে, করাপশন ডাটাবেজ-২০০৪, পৃ ৩৮

৭৪. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশে, করাপশন ডাটাবেজ-২০০৫, পৃ ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে অভিযোগ আছে তারা ঘুষ নেয়, নিরীহ জনগণকে ধরে অত্যাচার করে, থানায় গেলে মামলা নেয়া হয় না। তাছাড়া সন্ত্রাসী, দুস্কৃতিকারী, চোরাকারবারী এবং মাদক পাচারকারীদের সাথে ঘনিষ্ট সংযোগ রক্ষা করে চলে।

কানিজ সিদ্দিকীর গবেষণায় ২৮১ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৮ শতাংশ পুলিশের কাছে গেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করতে। তার মধ্যে ৮৮ শতাংশকে ঘুষ দিতে হয়েছে বিভিন্ন সময়। পুলিশকে কেস ফাইল করার জন্যে গড়ে ৫৬৩.৩০ টাকা এবং কোর্টে না নিয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্যে গড়ে ৫৭৪০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশকে। আর্থিক মূল্যের বিষয়টি একটি ছকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতির আর্থিক মূল্য

ক্রমিক নং	আয় গ্রুপ	পুলিশ প্রশাসন অফিসে গেছে এরকম খানা	দুর্নীতির আর্থিক মূল্য
১	>১০০০	১৭	৩১,৮৪০.০৫
২	<৩০০০	২০২	১২৭,৫৩৫.৭২
৩	>৩০০০	৬২	৩২৩,৪৮৪.৮৪
৪	মোট	২৮১	৪৮১,৮৪৪.৬১

তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক অপরাধ চিত্র বিশেষ সংখ্যা ২০০৫।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। সাপ্তাহিক অপরাধ চিত্র ২০০৫-এর একটি সংখ্যা ২০০৩ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীরা সারা ঢাকা শহরে ভারতীয় শাড়ি সাপ্লাই দেয়। তাই বঙ্গবাজার থেকেই প্রতি মাসে পুলিশকে দেয়া হয় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। তারপরও তারা মাঝে মাঝে মার্কেট ঘেরাও করে বাড়তি টাকার জন্য নিয়ে যায় ভারতীয় শাড়ি। মিরপুর এলাকার একজন গার্মেন্টস মালিক বলেন, এই এলাকার থানার একজন ওসি শুধু গার্মেন্টস খাত থেকেই আয় করে মাসে তিন থেকে চার লক্ষ টাকা।

পুলিশ টাকা নেয় হকারদের কাছ থেকে। পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা দালালরা হকারদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। গুলিস্তান, রমনা ভবন, বঙ্গবন্ধু এ্যভিনিউ, বায়তুল মোকাররম প্রভৃতি এলাকার হকারদের কাছ থেকে প্রতি দোকান পিছু নেয়া হয় ৪০ থেকে ৭০ টাকা।

প্রতি ট্রাকে ৫ টন মাল বহনের কথা থাকলেও এর থেকে বেশি বহন করা হয়। এ বিষয়ে ট্রাক মালিক সমিতির বক্তব্য ঢাকা শহরের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ট্রাক পিছু পুলিশকে টাকা দিতে হয়। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই আমরা অতিরিক্ত মাল বহন করি। বেবি ও অটোরিক্সা সমিতির বক্তব্য, সমস্ত বৈধ কাগজপত্র থাকলেও পুলিশ এটা নেই ওটা নেই বলে ড্রাইভারদের হয়রানি করে। এর চেয়ে কাগজপত্র না রেখে পুলিশকে টাকা দিয়ে চললেই সুবিধা হয়।

ঢাকাসহ সারাদেশে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসাও চলে। পুলিশের অগোচরে অবশ্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের একজন প্রভাবশালী ক্যাডারের বক্তব্য, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্রের কোনো হিসেব দিতে পারবে না পুলিশ।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ বাহিনীর কোনো কোনো ক্ষেত্র থাকে যেটা ঘুষের জন্যে বিখ্যাত। এরকমই একটা জায়গা হচ্ছে ডিবি। ডিবি অফিসের ইন্সপেক্টর পর্যায় পর্যন্ত প্রায় সবারই ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি আছে। এসি, এডিসিরা সবাই কোটিপতি। বলা হয়ে থাকে এক বছর ডিসি ডিবি থাকলে তিনি কত টাকা আয় করেন সেটা তার নিজের পক্ষেই হিসাব রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অবৈধ অর্থের ডিপো ডিবি অফিসে আসতে হলে একজন কনস্টেবলকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এস.আই. এবং ওসিরা ১০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে ডিবি অফিসে পোস্টিং নেন।

পুলিশের অর্থ-সম্পদ ও গাড়ি-বাড়ির হিসাব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেক অফিসারদের সম্পত্তির হিসাব দিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে অনেক। পুলিশ প্রশাসনের বেশ কিছু ব্যক্তির এরকম দুর্নীতির সংবাদ পড়ে আমরা সাধারণ মানুষেরা হতবাক হয়েছি।

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রমনা থানায় একসময় কর্মরত একজন ওসির ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতকারে অবহিত হলাম, সে মগবাজারের যে বাসায় থাকতেন তার ভাড়া এবং সার্ভিস চার্জ ছিল মোট ১৯ হাজার টাকা। পূর্ব রামপুরায় তার দেড় কোটি মূল্যের একটি বাড়ি আছে। দুই ছেলে পড়াশুনা করে সিঙ্গাপুরে, তাদেরকে পাঠাতে হয় প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা। তিনি নিজে দু'টো গাড়ির মালিক। যার একটির দাম ৪০ লক্ষ টাকা, অন্যটির ৫৬ লক্ষ টাকা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পুলিশের লোকেরাই পকেটমার ও ছিনিতাইকারী আমদানি করে, এই অভিযোগ উঠেছে এক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে। বিসিএস পরীক্ষার 'Police Verification' এ পুলিশের টাকা নেয়াটা তো এখন একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

কাস্টমস এবং পুলিশের সমন্বয়েই স্বর্ণের চালান প্রবেশ করে বাংলাদেশে। পরবর্তীতে এদের সহযোগিতাই স্বর্ণ সীমান্ত পার হয়ে চলে যায় ভারতে। এছাড়া বিভিন্ন সময় ধরা পড়ে যাওয়া হেরোইন, সাপের বিষ এবং ফেন্সিডিল গায়েব হয়ে যায় থানা থেকে। তার পরে থানায় জমাকৃত হেরোইনের পরিবর্তে ময়দা আর ইউরিয়া সারের মিশ্রণ দেখা যায়।

থানাগুলোতে টাকা না দিলে মামলা ফাইল করা হয় না এবং অনেক সময় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেয়া হয় না। আবার সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করেও রাজনীতিবীদদের চাপে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ মানুষকে আসামী হিসেবে ধরে নিয়ে চরম শারীরিক নির্যাতনের পর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। রুবেল হত্যা মামলা এর সাক্ষ্য বহন করে। পুলিশ এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে মিথ্যে ঘটনা সাজিয়ে ছিল। একই ব্যাপার ঘটেছিল ইয়াসমীন এবং সীমা ধর্ষণ-হত্যায়।

প্রতিবছর এবং বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলে। কিন্তু এ কাজে তারা ১০ ভাগও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুলিশসহ প্রায় সকল দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমান করা হয়, দেশে এখন বিভিন্ন ধরনের অবৈধ অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই লাখের মতো। অন্যদিকে বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। এর পেছনে কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে পুলিশের এসব অভিযানের খবর এক

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তা এবং সোর্সদের মাধ্যমে আগেই চলে যায় সন্ত্রাসীদের কাছে। জানা গেছে এক শ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তা নিয়মিত মাসোহারা পায় মুখচেনা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে।

এরশাদ শিকদারের গ্রেফতারের পর স্বরাষ্ট্র মান্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করে। কমিটি তাদের রিপোর্টের মূল অংশে এরশাদ শিকদারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণকারী বিভিন্ন পেশার ৩৫ জনের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে। এই ৩৫ জনের মধ্যে এডিশনাল আইজি থেকে ইন্সপেক্টর লেভেল পর্যন্ত ১৯ জন পুলিশ কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নিম্নপদস্থ কিছু সদস্যের নাম মূল তদন্ত রিপোর্টের বাইরে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের আওতাধীন এরশাদ শিকদারের সাথে অন্য কোন অভিযুক্ত পুলিশকে ফাঁসি দেয়া হয়নি।

২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২০,০০০ (বিশ হাজার) এর বেশি পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যন্ত রয়েছেন। তবে বেশির ভাগ শাস্তি পেয়েছে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে বিরাট অংশকে চাকরি থেকে হয় বরখাস্ত না করে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশের দুর্নীতি কমেনি।"[৭৫]

বর্তমানে পুলিশের কতিপয় সদস্যের সর্বগ্রাসী মনোভাব দেখে ভগবত গীতার এই শ্লোকটির কথা উল্লেখ করা যায়- "This today I have gaind. This desire I shall obtain. This wealth is mine. That also woll be mind in future. This enemy has been shain, other also I shall slay. I am rich and will born. Who else is epual to me? I will sacrifice, I will give, I will rejoice. Thus deluded by ignorance, bewildered by many fancies, entagled by the meshes of delusion, addicted to the gratification. OJ lust, they fall down into a foul hell. "[৭৬]

"প্রাচীনকালে এ উপমহাদেশে আইন রক্ষাকারী সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। বাল্মিকী তার রামায়নে পাহারা দেয়া, নিরাপত্তা রক্ষা এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা বৃত্তি ইত্যাদির জন্যে একটি জনসংগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। Dharmasutra (৫০০-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) তে চোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রাম এবং শহরে শুদ্ধ এবং সত্যবাদী (pure and truthful) কিছু লোক নিয়োগের পরামর্শ দান করা হয়। ৩০০-২০০ খ্রীষ্টপূর্বে মৌর্য যুগের যে জটিল প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয় তাতে আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে এদের কার্যক্রম সংগঠন সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শাসনামলে কোতোয়াল নিযুক্ত করা হতো। মুলতঃ উপমহাদেশে পুলিশ বাহিনীর উৎপত্তি বৃটিশ শাসনামল থেকে । লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে (১৭৮৬-৯৩) প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশ বাহিনী আনুষ্ঠানিকরূপ লাভ করে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্টের মাধ্যমে। এ এ্যাক্টের সারমর্ম ছিল এ রকম যে, পুলিশ বাহিনী সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং তাদের সর্বোত ভাবে সহায়তা করবে। এই বৃটিশ পুলিশ বাহিনীর ত্রাসে কাঁপত তখন সাধারণ মানুষেরা। জুজুবুড়ির পরিবর্তে পুলিশের ভয় দেখানো যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রচলিত দণ্ডনীতিতে পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলন এরকম,

---

৭৫. রাশেদ খান মেনন, দুর্নীতি ও বাংলাদেশ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

৭৬. রাশেদ খান মেনন, দুর্নীতি ও বাংলাদেশ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেবেলায় পুলিশকে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন– স্বাভাবিক মানব জীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব- ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেই রকম।

বর্তমানেও পুলিশ সম্পর্কে একই ধরনের বিভীষিকা রয়েছে। প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে বাঘে ছুলে আঠারো ঘা আর পুলিশ ছুলে ছত্রিশ ঘা । পুলিশের ওপর সাধারণ এবং ভুক্তভোগী মানুষ আস্থাহীন। এ ধরনের একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে দুর্নীতির কারনেই। তবে দুর্নীতির শুরু আজকে নয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় দুর্নীতির অস্তিত্ব প্রাচীন কালেই দেখা গেছে। পুলিশ বিভাগে বিশেষ করে স্টেশন হাউস, অফিসারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ছিল ইন্ডিয়ান পুলিশ কমিশনও (২০০২-২০০৩)। তাদের একটি রিপোর্টে এ বিষয়টি পরিস্কার হবে,

The forms of this Corruption are very numerous. It menifests itself in every stage of the work of the police Station. The police officer may buy a fee of receive a present for every duty he performs. The complainant had often to pay a fee for having his complaint recorded. He has to give the investigating offiver a present to secure his prompt and earnest attention to the cause. More money is extortid as the investigation proceeds. " [৭৭]

রিপোর্টটি এখানেই শেষ নয়। এখানে বিস্তারিত বর্ণনা হয়েছে পুলিশের দুর্নীতির। ইংরেজ শাসনের পরেও পাকিস্তান আমলে পুলিশের এই একই রূপ আমরা দেখেছি। পরিবর্তনটা হয়েছে শুধু বাহ্যিক। হাফপ্যান্ট আর তিনহাত লম্বা লাঠির ফুলপ্যান্ট আর কাঁধে আট কেজি ওজনের ৩০৩ রাইফেল। বাংলাদেশের পুলিশও এই উত্তাধিকার বহন করে চলছে।

পরিশেষে বলা যায় মিশরীয় রাজা এমাসিস তার রাজ্যে দুর্নীতি দূর করার একটি প্রশংসনীয় প্রথা প্রবর্তন করেন। এই প্রথাটি, সম্পূর্নরূপে ধার করে নিয়ে এসে এথেন্সে চালু করেন। প্রথাটি এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে একবার করে প্রাদেশিক গভর্নরের সম্মুখে তার জীবিকার উৎস ঘোষণা করতে হবে; কেউ তা না পারলে কিংবা উৎসটি যে সৎ একথা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। বর্তমানে এই পদ্ধতি চালু করা না গেলেও দুর্নীতিবাজদের শাস্তির বিধান দুর্নীতিকে অনেকখানি কমিয়ে দিতে পারে। রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্টদের জীবিকার উৎসটি সৎ হয় তাহলে হয়ত দুর্নীতি অনেকখানি কমে যাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু অসৎ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ও কাঠামোগত দুর্বলতার কারনেই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা একটি দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকট নিরসনের জন্য স্বচ্ছতা ও জবাব দিহীতার কোনো বিকল্প নেই। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার স্বার্থেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার একটি অনিবার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র জনকল্যাণে নিয়োজিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ-ই পারে এ সংস্কারের কাজটিকে সম্পন্ন করতে।

"অর্থনীতিবিদ Gunnar Myrdal তাঁর Asian Drama-য় লিখেছেন "when considering the prospects of reform in countries where corruption is so embedded in institutional and attitudinal remnants of traditional society and

৭৭. শঙ্কর কুমার দে, পুলিশের আরও ছয় ক্রোড়পত্র, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

Where almost everything that happens increases incentives and opportunities for personal gain, the public outcry against corruption must be regarded as a constructive force. "[৭৮]

বলাবাহুল্য, জনস্বার্থে গঠনমূলক সংস্কারের জন্য চাই একটি সচেতন জনগোষ্ঠী। সেই মাত্রা নিরূপণ করে বলা যায়, এদেশে এখন জনগণের মধ্যে সচেতনতা এসেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই সৎ। কেবল উপরি কাঠামোর দুর্নীতির কারনে আজকে আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিসংখ্যানে পর পর পাঁচবার বাংলাদেশ সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত। যদিও বর্তমান বছরে এদেশ দূর্নীতির কাতারে দুরে সরে গেছে তবে তার সুদূর প্রসারী ফলাফল স্থায়ী হবে কিনা, তা চিন্তার ব্যপার। এই অবস্থার অবসান চান সবাই। তাই উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের কাছে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

(খ) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহত্তমখাত এবং স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেকাংশে এই খাতের ওপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় সরকার উপ-খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির চিত্র লক্ষ করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদের বিষয়টি যা ৩২.৬৭%। এ খাতের অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৬.৭৩%, ডিসি অফিস ৫.৫৮%, পৌরসভা ৯.৫৬%, ইউএনও অফিস ১১.১৬%, এবং পল্লী উন্নয়ন ৯.৫৬% উপ-খাতে প্রকাশিত দুর্নীতি-সংক্রান্ত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

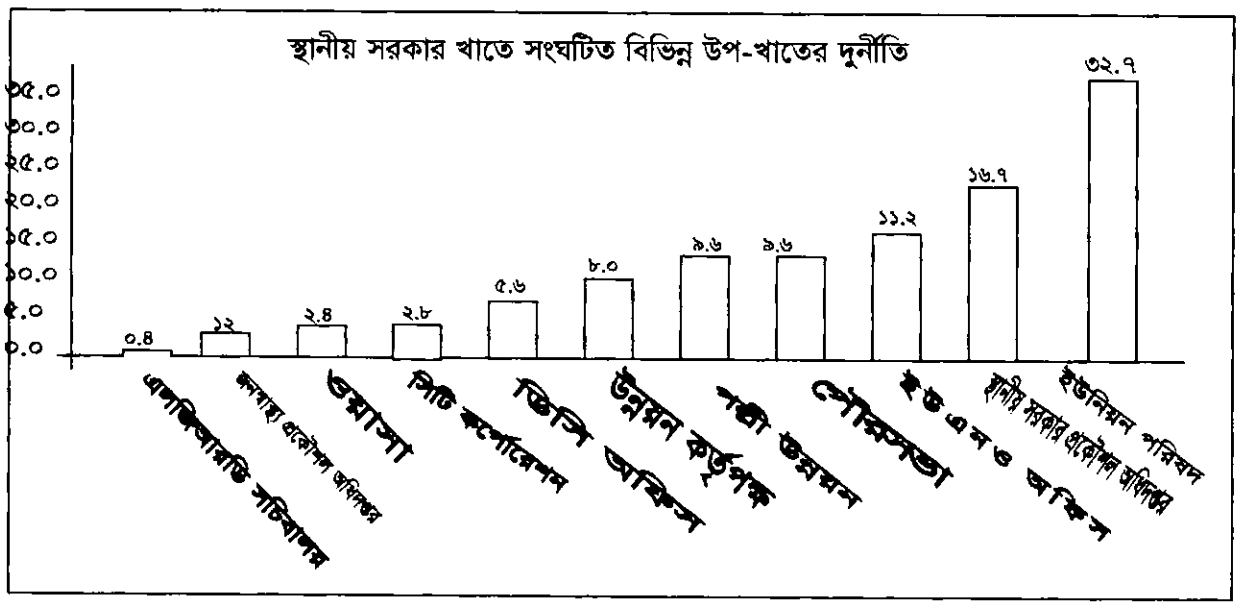

তথ্যসুত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

৭৮. জান্নাতুল ফেরদৌস সিদ্ধা, "দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন"। প্রকাশকাল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১। প্রকাশক ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যকরী একমাত্র স্থনীয় সরকার হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই পরিষদের পরিচিতি আছে গম আত্মসাতের জায়গা হিসেবে। অধিকাংশ ইউ,পি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মধ্যেও এ ধারণা প্রচলিত যে, তারা নিয়মিত গমের ভাগ পাবেন। তাদের আগ্রহ VGF, VGD, GR কার্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্যে যে অংকের টাকা ও গম বরাদ্ধ করা হয় তার অর্ধেকও কাজে লাগানো হয় না। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি অর্থ আত্মসাতের কারনে একে বারে তৃণমূল পর্যায়ে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া গম বিতরণ বা অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জায়গা নির্ধারনের ক্ষেত্রে চলে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি। এছাড়া স্থানীয় সরকারের অন্যান্য অংশগুলো যেমন সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা গুলোতে জন প্রতিনিধিরা তাদের ভোটের খরচ ওঠাতে সচেষ্ট থাকেন। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যেমন এল,জি,ই,ডি, ওয়াসা এবং ডি,পি,এইচ,ই এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তা দুর্নীতি করেন বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। ২০০৪ সালের শেষ ছয় মাসে ২১টি দৈনিকে স্থানীয় সরকারের দুর্নীতি বিষয়ে মোট ২১৯টি সংবাদ ছাপা হয়েছে।

(গ) শিক্ষাখাত

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষারজন্য দাতাগোষ্ঠী সহ বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রত্যেক বছরই সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে আসছে। কিন্তু জাতির চরম দুর্ভাগ্য, দুর্নীতির কারনে এই বিপুল বরাদ্ধের যে লক্ষ্য, তা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। উল্লেখ্য, দুর্নীতির কারনেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ইউনিসেফ বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কয়েক বছরে ৬০ কোটি টাকা ফেরত নিয়েছে।[৭৯]

শিক্ষাখাতে প্রকাশিত দুর্নীতির ধরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাত্রা সর্বাধিক, যার হার ৫৯.৬১%। এর পরেই রয়েছে ঘুষ গ্রহণ ৩০.৯৫%, প্রতারণা ৪.২৩% অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ ১.৯৫%, দায়িত্বে অবহেলা ১.৯৫%, জোর করে অর্থ আদায় ০.৯৮% এবং প্রভাব বিস্তার ০.৩৩%।

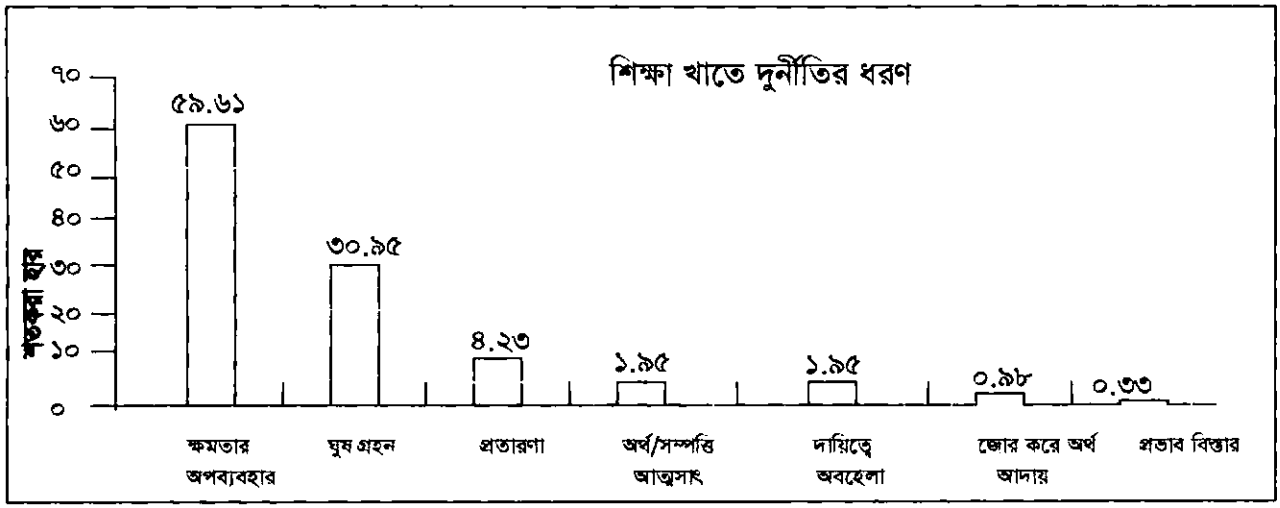

তথ্যসুত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-২০০৬।

৭৯. শাহনেওয়াজ,দৈনিক যুগান্তর, ৮ফেব্রুয়ারি ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫ সালে শিক্ষা খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির ঘটনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত, যার হার ৩৩.৫৫%। এর পরের অবস্থানেই রয়েছে মহাবিদ্যালয়, যার হার ১৫.৩১%। এছাড়া মাদ্রাসা ১৩.০৩%, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০.৪২%, শিক্ষা অফিস ৮.১৪%, বিশ্ববিদ্যালয় ৮.৮%, শিক্ষা বোর্ড ৫.২১%, দুর্নীতর ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাখাতে দুর্নীতির শুরুটা বেশ আগেই। শিক্ষার মহানব্রত নিয়ে শিক্ষকরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি স্বজনপ্রীতি, অর্থআত্মসাৎ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পরেন। জ্ঞানের আলোতে নিজেকে আলোকিত করতে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু অংশ নকলের আশ্রয় নেয়। আর শিক্ষা অফিসগুলো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অভিযোগ আছে যে, বাংলাদেশের মোট ১লাখ ৬৩ হাজার ২৪৭জন প্রাইমারী স্কুলে কর্মরত শিক্ষকের মধ্যে ২০,০০০ (বিশ) হাজার শিক্ষক স্কুলে না গিয়েও মাসের পর মাস বেতন তুলছেন।

থানা শিক্ষা অফিসের লোকজন ঘুষের বিনিময়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না । এছাড়া শিক্ষকরা অভিযোগ করেন যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করতে বাঁধাদেন কর্মচারীরা এবং তাদের কাছে টাকা দাবী করেন। আবার অধিদপ্তরে বহু শিক্ষকের ফাইল গোপন করা হয়। এভাবে ফাইল/ভাতা নিয়ে ঘাপলা হলেও ভুয়া স্কুল, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত ঘুষ দিয়ে টাকা পেয়ে যান নিয়মিত। আবার অনেক সময় ভুয়া স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করলে সৎ অফিসারদেরও হয়রানি করে এর সাথে সংশ্লিষ্টরা। কারণ ওপর মহলে তাদের যোগাযোগ আছে।

(ঘ) স্বাস্থ্য খাত

বিভিন্ন অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, ঘুষ, দায়িত্বে অবহেলা, স্বেচ্ছাচারিতা সহ জালিয়াতি গ্রাস করে ফেলছে স্বাস্থ্য খাতকে। যার ফলভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। গত বছর ২ নভেম্বর বিশ্ব ব্যাংক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি প্রকল্প (এইচপিএসপি) এবং জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি (এনএনপি) সহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের আরেকটি প্রকল্পে ক্রয় সংক্রান্ত কাজে দরপত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে প্রকল্পের সাহায্য বাতিল করে এবং প্রদত্ত অর্থ ফেরত চায়।

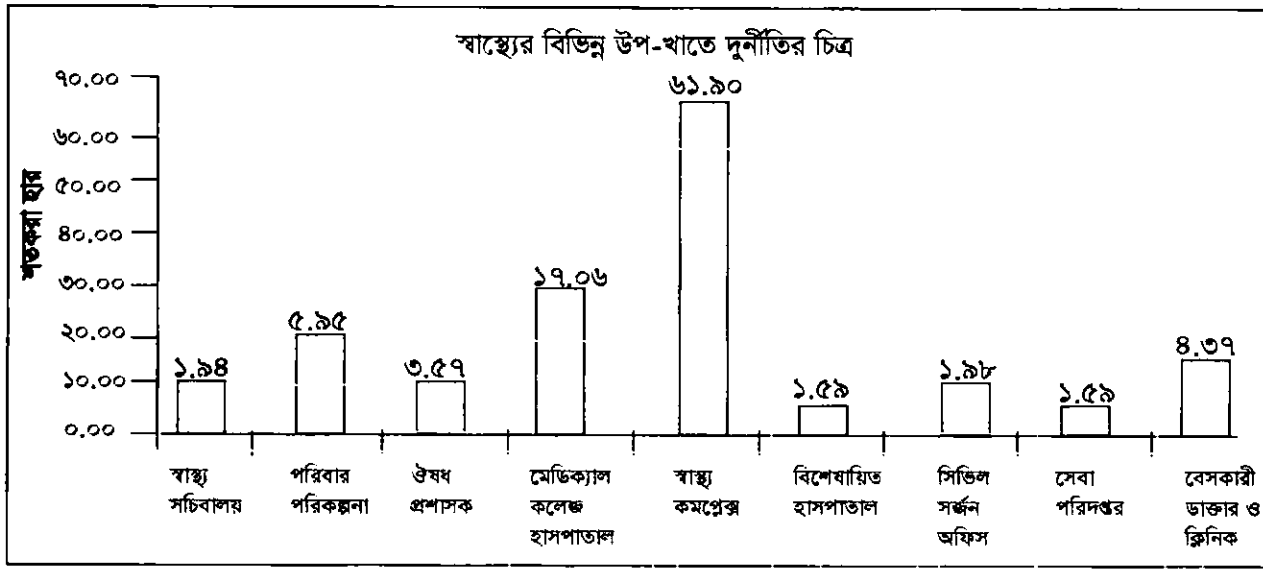

তথ্যসূত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫ সালে দেশের স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতির মধ্যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপ-খাতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি ঘটে যার হার ৬১.৯%। এছাড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ১৭.০৬%, পরিবার পরিকল্পনা ৫.৯৫%, সিভিল সার্জন অফিস ১.৯৮%, বিশেষায়িত হাসপাতাল ১.৫৯% ও বেসরকারি ক্লিনিক/ ডাক্তার ৪.৩৭% দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির মধ্যে আত্মসাৎ রয়েছে শীর্ষ পর্যায়ে (৪৩.৭%)। এছাড়া দায়িত্বে অবহেলা ৩১.৩%, ক্ষমতার অপব্যাবহার ১১.১%, ঘুষ গ্রহণ ৮.৭% ও প্রতারণা ২.৪% উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিতে জড়িত সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রেণী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উচ্চ পদস্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন সবচেয়ে বেশি, যার হার ৬২.৪%। এর পরেই দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন অর্ধস্তন, নিম্নপদস্থ ও করণিক শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারী যার হার যাথাক্রমে ৯.৫%,৬.৬%ও৫.৮%।৩.৭% ঘটনায় উর্ধ্বতন শ্রেণীর কর্মকর্তা দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন আর ১২.০% ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী জানা সম্ভব হয়নি।

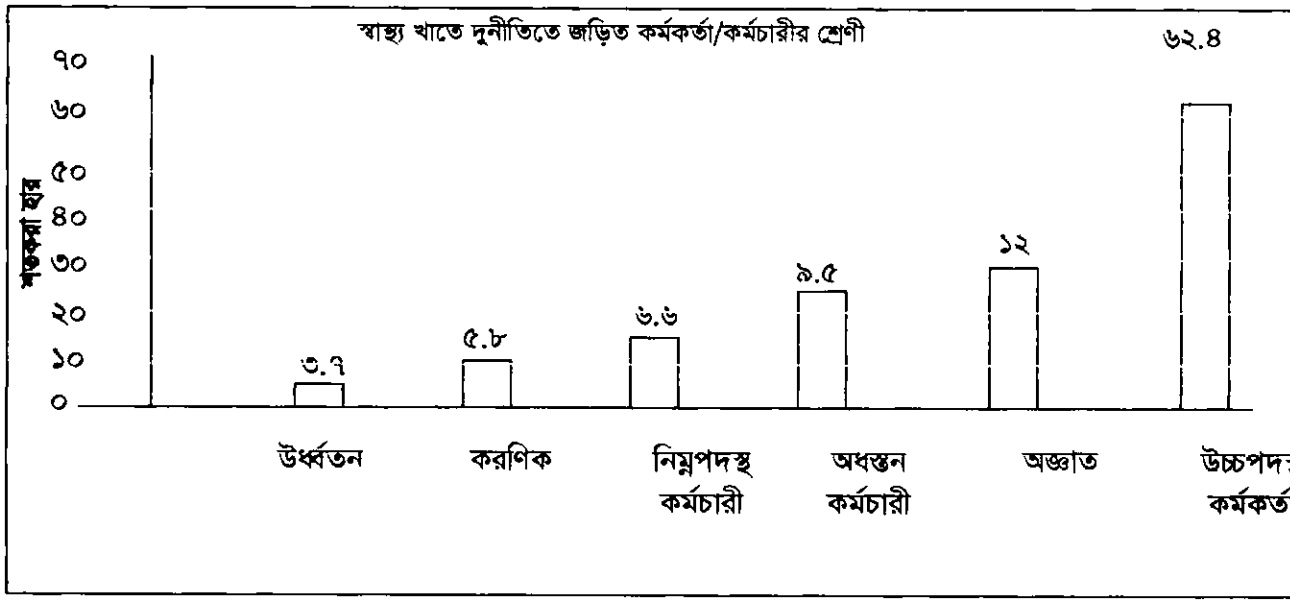

তথ্যসূত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

স্বাস্থ্যখাত সেবামূলক হলেও বর্তমানে এর বাস্তব চিত্র ভয়াবহ। হাসপাতালে পরিভ্রমন কালে দেখা যায় হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিম্মমানের খাবার, ঔষধের অপ্রতুলতা, হাসপাতালের চিকিৎসার জন্য যথাযথ যন্ত্রপাতির অভাব, কম সংখ্যক ডাক্তার-কর্মচারী, সরকারি ডাক্তারদের প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকরি। এক কথায় সরকারি হাসপাতাল থেকে কতজন মানুষ যে সু-চিকিৎসা পান সেটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এ ধরনের অব্যবস্থাপনার কারনে দেশের বহু রোগী পার্শ্ববর্তী দেশে কিংবা বিদেশে চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছেন। আরও ভয়াবহ চিত্র হচ্ছে অফিস চালাকালীন সময়ে ডাক্তরগণ চার্জ করে টাকা নিচ্ছে গ্রামের অসহায়, গরীব, দুঃস্থ, খেটে খাওয়া দিনমজুরদের কাছ থেকে। যদি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে ডাক্তারগণ রোগী দেখে অযত্ন, অবহেলা আর দুর্ব্যবহার এর সাথে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুর্দশার মূলে আছে দুর্নীতি। জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস এবং পরিবার কল্যাণসহ স্বাস্থ্য খাত আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বেশি ঘটে।

(ঙ) বেসরকারি খাত

বেসকারি খাতকে ঘিরে বিভিন্নসময় দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ ওঠে। টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণাতেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণার মাধ্যমেও এই খাতে বিদ্যমান দুর্নীতির একটি ধারণা দেওয়া হল।

বেসরকারি খাতে প্রতারণার মাধ্যমে দুর্নীতি হয় সবচাইতে বেশি, যার হার ৪৩.৪%। এর পরের অবস্থানেই যৌথভাবে রয়েছে আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সম্পদের অপচয়, যাদের হার যথাক্রমে ৩৫.৭%,৭.৮%ও৭.০%।

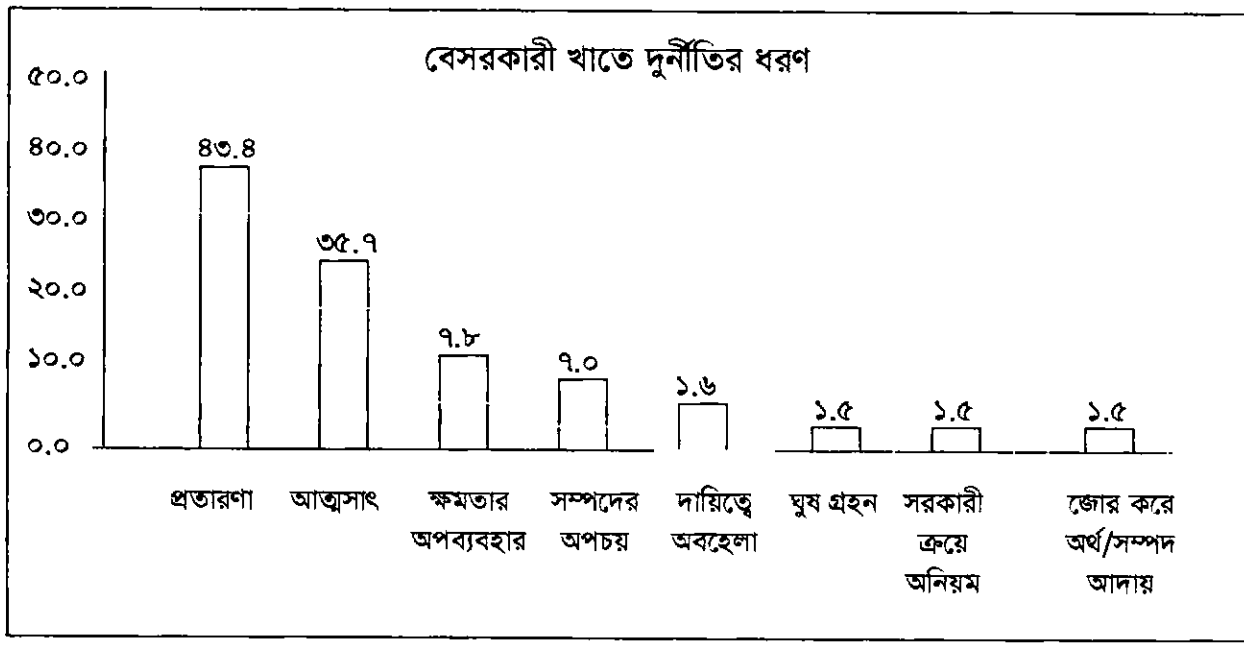

তথ্যসূত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

বেসরকারি খাতে দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের ২৪.০% এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। ৪৮.৯% ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ১৫,৬%, মামলা দায়ের ২৪.০% ও তদন্ত ৬.২% উল্লেখযোগ্য।

দুর্নীতির কারণ

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করা যায়। অদূরদর্শী রাজনীতি, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ঐক্যমতের অভাব, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, দুর্বল আমলাতন্ত্র,

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন মজুরী কাঠামো, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি, সুশাসন ও ন্যায়বিচারের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয় সহ তথ্যের সীমিত প্রবাহকে কেউ কেউ দুর্নীতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন"[৮০]। রবার্ট ক্লিটগার্ড বলেছেন, যদি মার্জিমাফিক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে দুর্নীতি বাড়বে।[৮১] অর্থাৎ একচ্ছত্র ক্ষমতা, মর্জিমাফিক ক্ষমতা, জবাবদিহিতার অভাবও দুর্নীতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে পদবী অনুসারে সরকার থেকে সুনির্দিষ্ট এবং আইনগত ক্ষমতা দেওয়া থাকে। ২০০৬ সালে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ সমূহের প্রকৃতি, স্বরুপ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত কারণগুলো এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) একচ্ছত্র ক্ষমতা

সরকারি প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র ক্ষমতা পরিমাপের জন্য একমাত্র নিয়ন্ত্রক, সরবারহকারী এবং তত্বাবধায়ক-কে সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কোন দুর্নীতি সংঘটনের পেছনে এটি একটি অন্যতম কারণ। শতকরা ৭০.৮% ঘটনায় একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল উচ্চ, ২৬.৭% ঘটনায় ছিল নিম্ন আর মাত্র ০.৫% ঘটনায় একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল অনুপস্থিত। শতকরা ২% ঘটনায় একচ্ছত্র ক্ষমতার মাত্রা জানা সম্ভব হয়নি।

(খ) মর্জিমাফিক ক্ষমতা

মর্জিমাফিক ক্ষমতা পরিমাপের জন্য অস্পষ্ট নীতিমালা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেহাই প্রদান, নীতিমালার অস্পষ্ট কিংবা ভুল ব্যাখ্যা করণ ও নীতিমালাকে নিজের পক্ষে সুবিধা জনকভাবে ব্যাখ্যা করাকে সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনার শতকরা ৮০.৭% ঘটনায়ই মর্জিমাফিক ক্ষমতা ছিল উচ্চ। ৪.২% ঘটনায় মর্জিমাফিক ক্ষমতা অনুপস্থিত ছিল, নিম্ন ছিল ১২.২% ঘটনায় আর ৩.০% ঘটনায় মর্জিমাফিক ক্ষমতার মাত্রা জানা সম্ভব হয়নি।

(গ) জবাবদিহিতার অভাব

যখন কোন ব্যক্তি জানতে পারে, তার কাজের জন্য কোনো জবাবদিহিতা করতে হবে না তখন সেইব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী কিংবা অন্যায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত হবে। দুর্নীতি সংঘটনের পেছনে জবাবদিহিতার অভাব একটি অন্যতম কারণ। জবাবদিহিতার অভাব পরিমাপের জন্য পরিদর্শন প্রক্রিয়া, রিপোর্টিং পদ্ধতি এবং জনসাধারণের নজরদারির অভাবকে সূচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৫ সালে দৈনিক খবরের কাগজ সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৬৫.২% ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল উচ্চ মাত্রার, ২০.১% ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল নিম্ন মাত্রার, অনুপস্থিতি ছিল ৭.৬% ঘটনায় আর ৭% ঘটনা থেকে জবাবদিহিতার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

(ঘ) দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা

দুর্নীতি বৃদ্ধির পেছনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা একটি অন্যতম কারণ। দুর্নীতি ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা যাবে। বদলি সাময়িক বরখাস্ত কিংবা ব্যধ্যতামূলক অবসর বস্তুত পক্ষে কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। ২০০৬ সনের সংবাদ পত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৩৮.১% দুনীতির বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাত্র ১৮.১% ঘটনার আলোকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

---

৮০. চৌধুরী ও মজুমদার : বাংলাদেশ- দুর্নীতির অবিমিশ্র অভয়াশ্রম;
Bangladesh Journal of Political Economy, Vol.17,No.2

৮১. Robert Klitgaard. "Corruption as a System" in the Next Stage of Anti-Corruption, Special Report, by Daniel Kaufmann

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে মামলা দায়ের ৬.৭% তদন্তাধীন ৫.৬% বরখাস্ত ২.১%, ক্লোজড ১.৫%, বদলি ০.৬%, স্ট্যান্ড রিলিজ ০.২% এবং অন্যান্য ১.৪%। ১৬.৩০% ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না তা জানা যায়নি। ১৯.১% দুর্নীতির ঘটনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জনগণ কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে। ৮.৪% দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ৩.৩% জড়িত ব্যক্তিদের কারণ দর্শানো/ তলব করা হয়েছে, ৬.১% ব্যক্তিদের বদলী, ৩.৯% জড়িত ব্যক্তিদের সাময়িক বরখাস্ত, ৫.৫% জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, ০.৬% দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্তনাধীন, আর অন্যান্য ১৯.৭% অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে "জড়িত ব্যক্তিকে সময় বেধে দেওয়া হয়েছে অর্থ ফেরত দিতে" কিংবা সমঝোতা কিংবা তদন্তের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন কোনো কোনো কর্মকর্তা। তবে ২০০৭ সনে দুদক কঠের হস্তে প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্বলতাকে সবল করার স্বার্থক প্রেসক্রিশন দিয়েছেন।

দুর্নীতির কয়েকটি প্রধান কারণ

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় আইনের ব্যবহার।

২. জনসাধারণের কাছে সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নেই বল্লেই চলে। সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনসাধারণের জানার অধিকার নেই। এমনকি এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসাধারনের মতামত নেয়া হয় না।

৩. শক্তিশালী ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাবে সরকার পরিচালিত।

৪. সরকার এমনকি জনগনের পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনহত উদ্যোগের অনীহা। প্রকৃতপক্ষে, সবাই এর সাথে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এটাকে স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ মনে করতে বাধ্য হচ্ছে।

৫. যথাযথ আইনগত কাঠামোর অভাব। এছাড়া আইনের ফাঁক-ফোকর এত বেশি যে দুর্নীতির হোতারা জানেন যে, যে কোনোভাবে তারা এর দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন বিনিময়ের মাধ্যমে।

৬. দুর্নীতির স্থায়ীচক্র অসাধু ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আমলারা মিলে এই চক্রটি তৈরি করেছেন। মূলতঃ রাজনীতিবীদরা দুর্নীতির প্রধান হোতা।

৭. বিদ্যমান রাজনৈতিক দুর্নীতি, যা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় বলে সকলের নিশ্চিত বিশ্বাস।

৮. রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকী করণের অভাব, সরকারি অফিসে স্বায়ত্তশাসন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধে বা পারস্পারিক সংহতির অভাব রয়েছে।

৯. আমাদের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক কম। আধুনিকায়নের সাথে সাথে জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে কিন্তু সে অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধার হার বাড়ে না।

১০. দুর্নীতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ক্ষমতা প্রয়োগ কারীদের। যারা বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা ভোগ করেন তারা তা ব্যবহার করে নিজেরা ফায়দা লুটেন। এক্ষেত্রে অন্য ক্ষমতাশীন ব্যক্তিরা তাকে Protection দেন।

১১. Special Anti-corruptionCourt নেই। কার্যকরী দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অভাব এবং ন্যায়পালের মত সাংবিধানিক পদ বাস্তবায়িত না করা।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সমাজে দুর্নীতির প্রভাব

দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে অনেক তত্ত্ববিদ ইতিবাচক প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেন। তাদের মতে 'Speed money, আমলাতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূরকরে। লাল ফিতার দৌরাত্ব কমিয়ে দেয়, স্থবির কাঠামোকে সচলতা দান করে। তাতে অর্থনৈতিক অবস্থা গতির মধ্যে ফিরে আসে এবং সামাজিক ভারসাম্য তৈরি হবে। যারা এই দৃষ্টি ভঙ্গির ধারক, তাদের যুক্তি হচ্ছে অনুন্নত রাষ্ট্র গুলোতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্থবিরতা তৈরি হয় তাদের অবকাঠামোগত কিছু সমস্যার জন্যে। এতে গোটা প্রক্রিয়াটি মার খেয়ে যায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যর্থ হতে বাধ্য হয় এ ধরনের স্থবিরতা দূর করতে। এরকম চরম পরিস্থিতিতে দুর্নীতির মাধ্যমে সচলতা ফিরিয়ে আনা যায় এবং আমলাতন্ত্রকে কর্মমুখী করা যায়। উদাহরণ হিসেবে Theobold প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শহরের Patronage system এর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা দুর্নীতির এ ধরনের Instrumenal advantage নিয়েছিল। অনেক তত্ত্ববিদের মতে, ঘুষ ব্যক্তি বিশেষের মূলধন গঠনে সাহায্য করে সত্য তবে তার দ্বারা পরবর্তীতে সমাজ বা রাষ্ট্র লাভবান হয়।

তত্ত্ববিদেরা মনে করেন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্নীতি নৈর্ব্যক্তিক স্থবির অবস্থানের পরিবর্তে অনেক বেশি ভালো আচরণ উপহার দেয়। এছারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জন্যে ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে এবং নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে ব্রাজিলের কথা বলা যেতে পারে। যেখানে কোন একটি Export licence পাওয়ার জন্যে ১৪৭০টি legal actions রয়েছে এবং ১৩টি সরকারি মন্ত্রনালয় এবং ৫০টি এজেন্সির কাছে গিয়ে ধর্ণা ধরতে হয়। এখানে একদল broker-রা কাজ করেণ মধ্যবর্তী লোক হিসেবে, যাদের কাজই হলো কারো কাছ থেকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা নিয়ে কাজ পাইয়ে বা করিয়ে দেয়া।

কিন্তু দুর্নীতির ইতিবাচক দিকটি সম্পর্কে যে ধরনের ব্যখ্যা দেয়া হয়, তা আদতে কতটুকু ইতিবাচক তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ যে প্রক্রিয়াটি প্রশাসনকে গতিশীল করবে তাই আবার প্রশাসনকে ঘুষ নির্ভর করে তুলছে। এই নির্ভরশীলতা এমনই যে, দুর্নীতি ছাড়া প্রশাসন আবার স্থবির হয়ে যাচ্ছে। তাছারা দুর্নীতি প্রশাসনকে সচল করলেও প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ হিসেবে তা অত্যন্ত নেতিবাচক। এবং এটি রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্যে কোন গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে না। বরং ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধা নেয়ার জন্যে ক্ষমতাশালীদের সুবিধা দানের মাধ্যমে প্ররোচনা করা, যা একই অবস্থানে চাকরিরত ব্যক্তিদের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। এটি এক ধরনের সামাজিক ভারসম্যহীনতাও সৃষ্টি করে। আর সরকারি কর্মকর্তারা যে ঘুষ নিচ্ছেন তার কোনো আয়কর দেননা। ফলে সরকার এ থেকে বঞ্চিত হয়।

আবার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে হলে বিভিন্ন স্থানে ঘুষ দিতে হয়। কাজেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায় এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ কমে যেতে থাকে। এবং একই সাথে বিদেশী বিনিয়োগ কমে যায়।

দুর্নীতির ফলে বিশেষ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ফলাফল পেলেও সরকারী সকল কাজ হয় বিলম্বিত এবং দরিদ্র জনসাধারণ সরকারী সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতির ফলে কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। জনগণের জন্যে গৃহীত প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন সুবিধাবাদীদের সুবিধা গ্রহণের প্রকল্প বলা যায়।

হটকারী রাজনীতি, বিচার বিভাগ, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দুর্নীতির কারণে দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয় মারাত্মকভাবে, ফলে সন্ত্রাসের সীমাহীন রাজত্ব কায়েম হয় যেটা অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

" World Bank এর মতে Another economic cost can be in the form of environmental degradation that can take place due to the presence of corruption and misgovernance.পরিবেশ আইন বাস্তবায়নের জন্যে দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষদিয়ে অপরিবেশবাদী শিল্পস্থাপন এবং অন্যায় কাজ করে থাকে অনেক দেশের শিল্পপতিরা। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক অস্থিরতা, হতাশা ছড়িয়ে পরে সবার মধ্যে যা উন্নয়নের অন্তরায়।"[৮২]

"দুর্নীতির প্রক্রিয়া মূলত দুটি। প্রথমত, সরকারী সম্পদ বা আয় আত্মসাৎ করা এবং দ্বিতীয়ত, সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয়া। প্রথমটি সমাজ বা রাষ্ট্রকে ক্রমাগত দরিদ্রে পরিণত করে এবং দ্বিতীয়তটি প্রবৃদ্ধিকে স্তিমিত করে দেয়। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ বা রাষ্ট্র একপা না এগিয়ে দুইপা করে পিছিয়ে যায়। Robert Klitgard দুর্নীতির সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে একটি সাধারণ সূত্র ব্যবহার করেছেন। সূত্রটি হলো-

C=M+D-A-S

এখানে C= corruption
M= Monopoly
C= Discretion
A= Accountability
S= Public Salaries

সুতরাং দুর্নীতি মানেই হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র আধিপত্য, মার্জিমাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একই সাথে জবাবদিহিতার শুন্যতা ও কর্মীদের নিম্নমানের বেতন প্রাপ্তি। আবার বিপরীত দিক থেকে যে সমাজে এই বৈশিষ্ট্য গুলো বিদ্যমান সেখানেই দুর্নীতি বেশি।"[৮৩]

৮২. দৈনিক জনকণ্ঠ ১২ এপ্রিল-২০০৬।
৮৩. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ১১ সেপ্টেম্বর-২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস

বাংলাদেশ সহ বর্তমান বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য ও জীবন মরণ সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস বা Terrorism। বহু আইন কানুন চেষ্টা প্রচেষ্টার পরেও সন্ত্রাস দমন সম্ভব হচ্চে না বরং উত্তরোত্তর বহু গুনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুগে যুগে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ধরন ও রূপ পরিবর্তন হয়েছে, সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি বরং সন্ত্রাসী তৎপরতার আধুনিকায়ন ঘটেছে। বিগত ১৭-০৮-২০০৫ তারিখে গোটা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার একই সাথে একই সময়ে সিরিজ বোমা হামলা বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলায় ২ দুইজন বিচারককে হত্যার মধ্য দিয়ে শায়খ আবদুর রহমান, ছিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাইদের নেতৃত্বে জে,এম,বি নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের ইতিহাস। এছাড়া গাজীপুর জেলার টঙ্গী এলাকার অত্যন্ত সুপরিচিত আইসানুলাহ মাষ্টারের হত্যার ইতিহাস, খুলনার কুখ্যাতসন্ত্রাসী এরশাদ সিকদার কর্তৃক অগণিত হত্যা বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ঘটেছে।

(ক) সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

সন্ত্রাসের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Violence ও Terrorism, এ শব্দটি ল্যাটিন Terror শব্দ থেকে সংকলিত- যার অর্থ আতংক সৃষ্টিকরা। 'সন্ত্রাস শব্দটির ভাষাগত বিশ্লেষণে (সম্+ত্রাস=সন্ত্রাস) এমন কোন কাজকে বুঝায় যার সাথে ভয় বা ত্রাসের সম্পর্ক আছে। 'সন্ত্রাস' বলতে অস্বাভাবিক অপরাধমূলক কার্যকলাপকে বুঝানো হয়। এক কথায় একে বিশেষ ধরনের অনাচার বলা হয়।

সাধারণত সন্ত্রাস বলতে ভয়ভীতি, নৈরাজ্য প্রবণতা, ত্রাস সৃষ্টি করা, হয়রানি, খুন খারাবী, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ইত্যাদিকে বুঝায়। পরিভাষায় সন্ত্রাস বলা হয় দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য বিস্তার করাকে। অন্য কথায় অন্যের হক বা অধিকার প্রত্যক্ষভাবে বিনষ্ট করাকে সন্ত্রাস বলে। আর ব্যাপক অর্থে বলা যায়- নানা রকম অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের যিম্মি করে রাখার নামই সন্ত্রাস।

বৃটেনের জৈনক মহিলা সাংবাদিক সন্ত্রাস শব্দের অর্থ এভাবে করেছেন- "কোন সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে আতংক ও অবরোধ সৃষ্টি করে বিপদগ্রস্ত করা"।[৮৪]

১৯৭৪ সালে বৃটিশ সরকার সন্ত্রাস শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করে এভাবে- "For the purpose to the legislation, terrorism the use of veolence for pllitical ends and includes any use of violence for the purposes of puttign the public, or any section of publice, in Fear."[৮৫]

আইনের চোখে সন্ত্রাসের অর্থ হলো-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কঠোরতা অবলম্বন করা যাতে জনগণের স্বার্থের ক্ষেত্রে আতংক ও ভয়-ভীতি সৃষ্টি করাও শামিল থাকে।

---

৮৪. মাওলানা আবু তৈয়ব আব্দুল্লাপুরী ,প্রসঙ্গ; সন্ত্রাস ও একটি সমীক্ষা, মাসিক মঈনুল ইসলাম, সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ.৩০
৮৫. মাওলানা আবু তৈয়ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালে আমেরিকার CIA সন্ত্রাস শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে, "The Tereat or use lf veolence for political purpouse by Individuals or groups, Whether to of in opposition to established government authority." কোন রাজনৈতিক দল বা সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আতংক সৃষ্টি করা কিংবা একনায়কতন্ত্র/ স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করা।[৮৬]

১৯৮৫ সালে পশ্চিম জার্মানী সরকার কর্তৃক সন্ত্রাস শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয় "রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ধ্বংসাত্মক আক্রমন করে জান মালের ক্ষতি সাধন করা।"[৮৭]

Oxford Advanced Learner's Dictionary- তে সন্ত্রাস সম্পর্কে বলা হয়- "The use of violent action in order to achieve political aim;s of to force a government to act; on act of Terrorism."[৮৮]

সন্ত্রাস সম্পর্কে Academic American Encyclopaedia- 1983 তে বলা হয়- "Terrorism is the calculated use of veolent acts, or the thrat of violent acts, to frighten people in to submission"[৮৯]

A.T DEV কর্তৃক সম্পাদিত "STUDENTS" Favowrite Dictionary-তে সন্ত্রাস বিষয়ক বলা হয়- "A Systematic intimidation ar a method of securing political inds"[৯০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতে, The term Terrorism makes premediated politically motivated perpetrated against noncombatant tergets by sub national or clandestine agents, usually intended to influence an audience."[৯১]

In Webster's collegiate Dictionary সন্ত্রাসের সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে- "Terrorism has been define as the use of physical force in a coordinate manner by an organized group or groups so as injury others."[৯২]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় Terrorism কে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে- Terrorism the systematic use of terror (such as bombing, killing and kidnappings) as a means of forcing some political objective, when used by goverment, it may signal efforts to stifle dissent."[৯৩]

---

৮৬. মাওলানা আবু তৈয়ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০।

৮৭. মাওলানা আবু তৈয়ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০।

৮৮. Oxford Advance Learners Dictionary, Sixth Edition, p. 1342

৮৯. সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ন্যায়বিচার, প্রকাশনায় কিবরিয়া পরিবার, প্রকাশকাল আগষ্ট ২০০৬, পৃ. ৪১।

৯০. Ashu tosh day, student favourite Dictionary, New Edition: September 2003, p. 813.

৯১. প্রফেসর'স বি. সি.এস. স্পেশাল ডাইজেষ্ট, সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৯৮।

৯২. প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, এপ্রিল ২০০৪, পৃ.৬৮।

৯৩. মাওলানা আবু তৈয়ব, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবার, International Policy Institute for Counter Terrorism প্রশ্ন তুলছে Is One mans terrorist another man's freedom fighter?একজনের চোখে সন্ত্রাসী অন্য জনের চোখে মুক্তিযোদ্ধা?[৯৪]

সন্ত্রাস সম্পর্কে বলা হয়-

The statement, "One man's terrorist is another man's freedom fighter," has become not only a cliche, but also one of the most difficult obstacles in coping with terrorism. the matter of definition and conceptualization is usually a purely theoretical issue-a mechanism for scholars to work out the appropriate set of parameters for the reserch they intend to undertake. However, when dealing with terrorism and guerrilla warfare, implications of defining our terms tend to transcend the boundaries of theoretical discussions. In the struggle against terrorism, the problem of definition is a crucial element in the attempt to coordinate international collaboration, based on the currently accepted rules of traditional walfare.[৯৫]

"তবে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেটা জানা আবশ্যক। বর্তমানে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আর অন্যান্য রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে পার্থক্য ও সীমানা নির্ধারণ;
২. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর গণপ্রতিরোধ একই মানদন্ডে বিচার করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা;
৩. 'সন্ত্রাস'-কে অপরাধমূলক সন্ত্রাস বা ক্রিমিনাল কর্মকান্ড থেকে আলাদা করার প্রশ্ন;
৪. সন্ত্রাস বলপ্রয়োগ, সহিংসতা, ক্ষমতা প্রয়োগ, বা প্রভাব খাটানো থেকে কি আলাদা? নাকি সন্ত্রাস এদেরই একটা সাব-ক্যাটাগরি বা আরেকটি ধরন মাত্র।
৫. সন্ত্রাসের বৈধতা বা সন্ত্রাস আদৌ বৈধ হতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন;
৬. গেরিলা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য।"[৯৬]

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট টেররিজমের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, "premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience." জনগণকে প্রভাবিত করবার জন্য কোন দল বা গোষ্ঠী যদি পরিকল্পিতভাবে বেসামরিক টার্গেটের ওপর সহিংস হামলা চালায় তাহলে সেটা টেররিজম"।[৯৭]

"পল পিলার (Paul Pillar) একসময় যিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই-এর কাউন্টার টেররিস্ট সেন্টারের ডেপুটি প্রধান ছিলেন তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন।

---

৯৪. ফরহাদ মজহার 'সন্ত্রাস আইন ও ইনসাফ' প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত, সাপ্তাহিক ২০০০, ১৪ই অক্টোবর ২০০৫, সংখ্যা ২৩ পৃ. ১৫৮।
৯৫. ফরহাদ মজহার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮।
৯৬. ফরহাদ মজহার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩।
৯৭. ফরহাদ মজহার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

এটা পূর্ব পরিকল্পিত কাজ হতে হবে, হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া সহিংসতা সন্ত্রাস নয় বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে তাকে আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। আবেগের বশে বা হঠাৎ উত্তেজনাকর সহিংসতা ঘটে কিন্তু সেই সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নয়। কারণ তা পূর্বপরিকল্পিত নয়।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মাত্রই রাজনৈতিক, মাফিয়া গোষ্ঠীর বা অপরাধী গোষ্ঠীর সন্ত্রাস আর যে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস' ব্যবহার করে তার মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সন্ত্রাস মাত্রই রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে সহিংসতা তাকেই সন্ত্রাস বলা হয়। অপরাধমূলক সহিংসতা সন্ত্রাস নয়।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের টার্গেট বেসামরিক নাগরিক,যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনী নয়। একটি দেশের সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড সন্ত্রাস নয়, সন্ত্রাস শব্দটি সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এই কর্মকান্ডের হোতা একটি দেশের অভ্যন্তরে কোন দল বা গোষ্ঠী (subnational groups) ।"[৯৮]

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সন্ত্রাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত হবে। তার মানে, যে-সন্ত্রাসের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই সেটা নিছকই অপরাধমূলক সহিংসতা, সেটা টেররিজম নয়। দ্বিতীয়ত, টেররিজমের টার্গেট সামরিক প্রতিষ্ঠান নয়, বেসামরিক লক্ষ্যস্থল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি দ্বিমুখী। যেমন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন যদি ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে তাহলে সেটা কি সন্ত্রাস হবে? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অভিমত হচ্ছে সেটা সন্ত্রাস হবে। কিন্তু পাশাপাশি ইসরাইলি সেনাবাহিনী যদি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে আক্রমন করে তবে সেটা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হবে না।

কাজেই এটা পরিস্কার যে, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন জাতির মুক্ত সংগ্রামের লড়াকুদের আক্রমণ 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে না, কিন্তু মার্কিন তাবেদারীর বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণ সন্ত্রাসী হামলা বলেই গণ্য হব। সন্ত্রাস সম্পর্কে এ হলো আমেরিকার এক চোখা নীতি।
"গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইন, ১৯৯২এ সন্ত্রাসমূলক অপরাধ অর্থে বলা হয়েছে-

ক. কোন প্রকার ভয় ভীতি প্রদর্শন করে বা বে-আইনী বল প্রয়োগ করে-

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করা।

(২) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশ পথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা কোন যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা।

খ. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যানবাহনের ক্ষতি সাধন করা।

গ. ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সকারের নিয়ন্ত্রনাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, আইনের অধীন গঠিত,স্থাপিত বা সৃষ্ট কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোন কোম্পানী, ফার্ম বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির স্থাবর- অস্থাবর যেকোন সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা।

---

৯৮. ফরহাদ মজহার, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিসপত্র বা অন্য কোন বস্তু বা যানবাহন ছিনতাই করা বা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া।

ঙ. রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশে পাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন বালিকা, কিশোরী ও তরুণীসহ যেকোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে অশ্লীল ভাবে উত্যক্ত বা হয়রানি করা।

চ. কোন স্থানে, বাড়ীতে, দোকানে, হাট-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিত ভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধ ভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন করে ভয়-ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বিশৃংখলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

ছ. কোন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়ে, গ্রহণে বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাহারও দরপত্র গ্রহণে বিধি বহির্ভূতভাবে বাধ্য করা।"[৯৯]

সন্ত্রাস শব্দটি সম্পর্কে বাংলাদেশের সামান্যতম সচেতন মানুষটিও ধারণা রাখেন। অথচ মাত্র দু'দশক আগেও শব্দটির এত ব্যাপক প্রচলন ছিল না। প্রচলন না থাকার কারণ থেকেই বোঝা যায় ঐ সময়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপও এত ব্যাপক হারে ছিলনা। বর্তমানে এমন একটি দিনও নেই যে দিন দেশে অন্ততঃ কয়েকটি গুরুতর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত না হয়।

বর্তমানে সন্ত্রাস দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। সরকারের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী দপ্তর, বেসরকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক সংস্থা, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত বাহিনী, গ্রাম-গঞ্জ, প্রত্যন্ত অঞ্চল, রাস্তা-ঘাট, সড়ক, নৌ ও আকাশ পরিবহণ, গহীন অরণ্য, মধ্য সমুদ্র সর্বত্রই সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ। মূলতঃ স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাশীল প্রভাবশালী শ্রেণীবিশেষের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আবার সন্ত্রাসী বলতে আমরা তাকেই বুঝে থাকি, যে বিশেষ ধরনের অনাচারের সাথে জড়িত। একজন সন্ত্রাসী একই সাথে কয়েক ধরনের অনাচার সংঘটিত করে থাকে। প্রথমতঃ সে আইন ভঙ্গকারী, দ্বিতীয়তঃ সে অন্য মানুষের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার হরণকারী, তৃতীয়তঃ তার কাছে সাধারণ মানুষের জান-মাল নিরাপদ নয়। চতুর্থতঃ অনাচার সংঘটনে সে বেপরোয়া। এছাড়া আরো অনেক খারাপ বৈশিষ্ট্য একজন সন্ত্রাসীর মধ্যে বিদ্যমান। ক্ষমতা ও প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী সন্ত্রাসী পরিচয়ধারী এই ঘৃণীত শ্রেণীটি অবৈধ অস্ত্র ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সমাজে ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হয়। আইন ও প্রশাসনের ব্যাপক দুর্বলতার কারনেই সমাজে এ জাতীয় কার্যকলাপ হচ্ছে বলে মনে হয়।

সবশেষে বলা যায়- সমাজের সর্বত্রই সন্ত্রাসের কাল থাবা বিস্তৃত। সন্ত্রাসের দরুণ জনজীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসের কবলে মানুষ আজ অসহায়। এহেন পরিস্থিতি থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চায়। চায় স্বস্তির নিঃশ্বাস।

---

৯৯. মোঃ আবদুল কাদের মিয়া 'সন্ত্রাস ও অপরাধ প্রতিরোধ বিধান' এ. কে. প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৯৩ পৃ.৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার সৌধকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। সমাজ ও সভ্যতার ক্যান্সার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে সন্ত্রাস। সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্য আজ সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সন্ত্রাসের মূল কারণ চিহ্নিকরণ, দমন প্রক্রিয়া ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা আজ সময়ের বড় দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে সন্ত্রাসকে নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

ক. রাজনৈতিক সন্ত্রাস

"সাধারণত রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের প্রয়াসেই এ ধরনের সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। উদ্দেশ্য, তৎপরতা ও স্বার্থসাধন প্রণালীর দিক থেকে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের নমুনা নিম্নরুপঃ যেমন- অনেক সময় দেখা যায় কোন দেশে সরকার তার নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করার বা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সন্ত্রাসী কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এ ধরনের সন্ত্রাসকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কিংবা সরকার সৃষ্ট সন্ত্রাস বলা হয়। সত্তর ও আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন দেশে এক নায়কগণ রাজনৈতিকভাবে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে গুম বা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসের নজির স্থাপন করে। অনেক সময় ধর্মীয় মতবাদও এ ধরনের সন্ত্রাসের কারণ হতে পারে।"[১০০]

খ. অপরাধীচক্র চালিত সন্ত্রাস

"সাধারণত সকল সন্ত্রাসী কার্যই অপরাধের আওতায় পড়ে। তবে যখন কোন অপরাধী গোষ্ঠি বিশেষ কোন সুবিধা বিশেষতঃ আর্থিক সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় সন্ত্রাসী কর্ম তৎপরতা চালায়, তখন তাকে অপরাধী চক্র চালিত সন্ত্রাস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সন্ত্রাসীরা তাদের এ ধরনের তৎপরতাকে অনেক সময় খোঁড়া যুক্তির বেড়াজালে ন্যায়সঙ্গত সন্ত্রাস হিসেবে বিবেচনা করতে প্রয়াসী হয়। বাংলাদেশে মুক্তিপণ আদায় আগ্রহীদের অপহরণমূলক কর্মকান্ডকে এ ধরনের সন্ত্রাসের আওতায় অনায়াসেই আনা যায়। তা ছাড়া আর্থিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশে বাস-ট্রাক ও ট্রেন চলাচলের পথে সংঘটিত সন্ত্রাসী তৎপরতাকেও এ শ্রেণীর সন্ত্রাসের আওতাভূক্ত করা যায়।"[১০১]

গ. আনবিক সন্ত্রাস

"আধুনিক বিশ্বে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে আনবিক সন্ত্রাসকে এক নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের প্রসারের সংগে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিকাশ ও প্রয়োগের ফলে একদিকে যেমন অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে এর ফলেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীচক্র আনবিক বিস্ফোরনের ফলে সম্ভ্যাব্য ধ্বংস যজ্ঞের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। তাদের দাবী পুরণ না করলে পূর্বাঞ্চলের একটি বড় নগরীতে আনবিক বিষ্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেয়।"[১০২]

---

১০০. ম. আবু তাহের, অধ্যাপক সমাজ কল্যান ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটি মতামত পর্যালোচনা" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা যুক্ত সংখ্যা ৫৬,৫৭.৫৮ অক্টোবর ১৯৯৬, জুন ১৯৯৭, পৃ. ২২৬।

১০১. ম. আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

২০২. ম. আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটি অতি সাম্প্রতিক অনাচার। সম্ভবতঃ বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের এমন নিরবচ্ছিন্ন ও অনভিপ্রেত ঘটনার নজির নেই। তবে বাংলাদেশের শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক পেক্ষাপট বিবেচনার জন্য একটু নিকট অতীতে গিয়ে এর প্রাসঙ্গিক দৃশ্যপট তুলে ধরা প্রয়োজন।

এ শতাব্দীরই ষাট দশকের গোড়ার দিকে এদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারী শিক্ষকগণের উপর এন. এস.এফ নামক ছাত্র সংগঠনের হস্তক্ষেপ ও নগ্ন হামলাকে এদেশে শিক্ষাঙ্গনে সরকারী মদদ-পুষ্ট প্রকাশ্য সন্ত্রাসের নজির হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। "সরকারী মদদ-পুষ্ট এন.এস.এফ নামে এই পেশাদার বাহিনী আইয়ুব খান ও তার সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এন. এস. এফ বাহীনির সন্ত্রাসী তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত নজির হিসেবে ১৯৬৪ সালের ২২শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান বর্জনের প্রয়াসে সক্রিয় সর্বদলীয় ছাত্র নেতাদের ওপর অনুষ্ঠানের আগের দিন অর্থাৎ ২১শে মার্চ ডাকসু অফিসে অতর্কিত কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পিত আক্রমনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার উল্লেখ করা যায় সন্ত্রাসী তৎপরতার পাশাপাশি সরকারী সমর্থনপুষ্ট এন.এস.এফ. বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা বানচাল করার প্রয়াসে ২২ দফা দাবিনামাও পেশ করে।"[১০৩]

ঙ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস

আমেরিকা-বৃটেন কর্তৃক ইরাক দখলের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসের কালথাবা গ্রাস করেছে। এ যাবৎ স্বীকৃত ও লালিত আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি মূল্যবোধকে, সভ্যতাকে পিছিয়ে নিয়ে গেছে আদিম বর্বরতার যুগে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলকে মদদ দেয়াই যথেষ্ট মনে না হওয়ায় তারা সরাসরি মিথ্যা অজুহাতে ইরাকদখল করে নিয়ে প্রমাণ করলো বিশ্ব বিবেক বলে কিছু নেই। ১১/০৯/০১ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের অজুহাতকে সামনে রেখে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে। নিশ্চিত হয়েছে ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং কুক্ষিগত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ। ইরাকের পরে এখন একে একে ইরান সিরিয়া ও অন্যান্য আরব দেশ দখলের পাঁয়তারা চলছে। আফগানিস্তান দখলের পর লাদেনকে খুঁজে বের করার ও ধরার তৎপরতা থেমে গেছে। কারণ, লাদেনকে ধরলে সন্ত্রাস দমনের অজুহাত দুর্বল হয়ে পড়বে , এসব দেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জোরদার হবে। তাই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে জীবিত রেখেই সন্ত্রাস দমন নামক বৃক্ষের বিষ ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী থেকে বিতাড়িত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইহুদীদের পূনর্বাসিত করার জন্য আমেরিকা ও বৃটেনের নেতৃত্বে আরব ভূমিতে ফিলিস্তিনীদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হলো ইসরাইল রাষ্ট্র । শুরু হলো বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস । নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনীরা সেই থেকে পিএলও, হামাস ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বে চালিয়ে আসছে মাতৃভুমি পূনরুদ্ধারের সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ। আমেরিকা-বৃটেনের দৃষ্টিতে এসব মুক্তিযোদ্ধারা সন্ত্রাসী, আর নির্বিচার গণহত্যার নায়ক শ্যারন হলেন শান্তিবাদী।

---

১০৩. এন এস এফ প্রচারপত্রঃ ঢাকা জানুয়ারী ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

সৌদি রাজতন্ত্রের বিরোধিতার জন্য আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ওসামা বিন লাদেনের উত্থান। পরে তাকে ব্যবহার করা হয় আফগানিস্তানে তালেবানদের সহযোগী হয়ে রুশদেরকে উৎখাত করতে। আফগানিস্তানে রুশদের পরাজয়ের পরে লাদেনের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল আমেরিকার কাছে। ততদিনে তালেবানদের সাথে থেকে লাদেন পেয়ে বসেছে ইসলামী জিহাদের দীক্ষা। ঠিক এমন মুহূর্তেই আক্রমণ করা হল টুইন টাওয়ার আর পেন্টাগনে। কোন প্রকার নিশ্চিত তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এর দায়ভার চাপানো হল লাদেনের উপর । এরই সুত্র ধরে আমেরিকা দখল করে নিল লাদেনের আশ্রয়স্থল আফগানিস্তান।

মুলতঃ ইসরাইলের নিরাপত্তা ও ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভান্ডারের হাতছানিতে আমেরিকা অজুহাত খুঁজতে থাকে ইরাক আক্রমনে। শেষ পর্যন্ত ভূয়া অজুহাতে ইরাক দখলও সম্পন্ন হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস আমেরিকা-বৃটেন চক্রেরই সৃষ্টি। সুদূর প্রসারী আগ্রাসনের নীল নকশার অংশ হিসেবেই বিশ্বে পরিকল্পিত সন্ত্রাস আমেরিকা-বৃটেন চক্রেরই সৃষ্টি। সুদূর প্রসারী আগ্রাসনের নীল নকশার অংশ হিসেবেই বিশ্বে পরিকল্পিত সন্ত্রাস সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

ছ. তথ্য সন্ত্রাস

আজকের দুনিয়ায় স্যাটেলাইট ও মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার, যাকে আমরা তথ্যসন্ত্রাস বলে থাকি, সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে মরাত্মক সন্ত্রাসী অস্ত্র। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রচার মাধ্যমে তথা মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবহারে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার ও বিশ্বাস করানোর এক মোক্ষম হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারে দোসর গোয়েবলস এটা প্রমাণ করেছিলেন। আরেক বার এর প্রমাণ পাওয়া গেল আমেরিকা ও বৃটেন কর্তৃক সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে ২০০১ সালে আফগানিস্তান দখল এবং ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ধূয়া তুলে ২০০৩ সালে ইরাক দখলের মাধ্যমে। সেই সাথে সমান তালে চলছে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ ও অপপ্রচার। যেহেতু বিশ্বে প্রায় সকল প্রচার মাধ্যম পরাশক্তিগুলোর দোসর ইহুদীদের করায়ত্তে, তাই এ অপপ্রাচারের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সীমিত। আর এ কারনেই ইসলামের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রের অব্যাহত প্রয়োগ হচ্ছে।

জ. চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস

"বাংলাদেশের বেশিরভাগ চলচ্চিত্রেই বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভিত্তিহীন এসব ছবিতে যে কাহিনী, চরিত্র, অভিনয়, সাজ-সজ্জা, নাচ-গান থাকে তা যেমনি উদ্ভট তেমনি যুক্তিহীন ও হাস্যকর। এসব ছবির পাত্র-পাত্রীরা কোন দেশের এবং কোন সময়ের তা বোঝা দুঃসাধ্য। বাংলাদেশী সিনেমায় প্রদর্শিত মারদাঙ্গা ও সন্ত্রাস দেখে অনাচারকারীরা যেমন রপ্ত করে অনাচার সংঘটনের নতুন নতুন পদ্ধতি তেমনি অধিকাংশ যুবক শ্রেণীর দর্শকই সিনেমায় প্রদর্শিত এসব সন্ত্রাস-সহিংসতা দেখে উৎসাহিত হয়ে লিপ্ত হয় বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে এবং সমাজের জন্যে বয়ে নিয়ে আসে ব্যাপক অবক্ষয়। এ ধরনের চলচ্চিত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসা। এ কারনেই এক ধরনের চিত্র নির্মাতা সবসময় এধরনের ছবি নির্মাণে আগ্রহী। মারপিট, উত্তেজক, অশ্লীল নাচগান ইত্যাদি স্কুল বিনোদনে ঠাসা থাকে এ ছবিগুলো। এসব ছবিতে থাকে না কোনো যুক্তি, বাস্তবতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলনও সামাজিক দায়বদ্ধতা। ছবিগুলোর নামের ক্ষেত্রেও থাকে ভয়াবহতা । যেমন- ধর, খাইছি তরে, ভয়ানক সংঘর্ষ খ্যাপা বাসু, আমি গুন্ডা আমি মাস্তান, মহাসংগ্রাম, আজকের ক্যাডার, বিদ্রোহী মাস্তান, ইত্যাদি"[১০৪]

---

১০৪. কামরুল হাসান মঞ্জু, গবেষণা প্রতিবেদন: 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশ কাল: জুলাই ২০০২ পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

২। সন্ত্রাস উৎপত্তির প্রেক্ষাপট

সন্ত্রাসের উৎপত্তির কারণ বিবেচনায় আমাদের অতীতের জুলুমবাজ শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক অদুরদর্শিতা ও সহিংসতা, অশিক্ষিত দুর্বল সামাজিক ভিত্তি এবং বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকেই বেশী দায়ীকরা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ বা অনাচার যেমন চুরি, ডাকাতি, খুন, ঝগড়া ইত্যাদির কারণ নির্ধারণ করলে যেসব বিষয় আসে তার সাথে সন্ত্রাসের খুব কমই সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ সন্ত্রাসকে আমরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট নতুন ধরনের অনাচার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি যা অতীত ক্রমবিকাশের পরিবর্তিত রূপ। তারপরও অতীতের যে সকল প্রেক্ষাপট সন্ত্রাসের উদ্ভবের জন্য দায়ী তা আলোচনা করা যায়।

ক. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

"বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশীয় ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় এই উপমহাদেশের লোকজন ছিল অনেকটাই সহজ সরল। এই সুযোগ নিয়ে দুর কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকার দস্যুরা এমনকি শাসকরাও এদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। বৃটিশ আমলে নীলচাষ এবং সাহেবদের অত্যাচার ছাড়াও প্রদেশীয় অত্যাচারী জমিদারদের কবলে মানুষ শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেকবার। এইসব অনৈতিক ও অমানবিক আচরণ এদেশে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছে তা পরবর্তীতে বিপথগামীদের অপশিক্ষা রুপে আকৃষ্ট করেছে যা, সমাজে 'সন্ত্রাসী'র মতো আদর্শবিচ্যুত শ্রেণী উদ্ভবের একটি অন্যতম কারণ।"[১০৫]

খ. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

"রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এদেশে সন্ত্রাস বিকাশের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সন্ত্রাসের একটি মূল লক্ষ্য মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত করা। রাজনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তাই সন্ত্রাসের ব্যবহার এত বেশী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তরুণ সমাজকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে ভূলপথে চালিত করে ব্যবহার করা। এটা আমাদের দেশে যেরকম নির্লজ্জভাবে করা হয়ে থাকে তার কোন জবাব নেই। বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোই সন্ত্রাসী পুষে থাকে। এসব দল সমূহের নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে। সাধারণতঃ এলাকার কুখ্যাত মাস্তান শেষ পর্যন্ত কোন একটি রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে এসে আরও বড় এবং জাতীয়ভাবে পরিচিত মাস্তানে পরিণত হয়। তারা ব্যবহৃত হয় ভোট কেন্দ্র দখল, প্রতিপক্ষের সভায় অস্ত্রসহ হামলা করা এসব কাজে। বিনিময়ে পায় অপরাধ কর্মের নিস্কণ্টক পরিবেশ ও অবাধ সুযোগ।"[১০৬]

আমাদের সমাজকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এর মধ্যে সন্ত্রাসের শেকড় খুঁজে পাবো। সন্ত্রাস একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। এটা সমাজের রুগ্নতা ও অসুস্থতাকেই নির্দেশ করে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাই এই ব্যাধির সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

সমাজের বেশীরভাগ লোক অশিক্ষিত, দুর্বল ও অভাবক্লিষ্ট হওয়ায় তারা একজন সন্ত্রাসীর প্রকৃত দুর্বলতা বা ক্ষমতা আঁচ করতে পারে না। সামাজিক ভিত্তি সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় নয় বলেই সন্ত্রাসীদের প্রতিবাদ করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। উপোরন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীরা সহজেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সৎকাজের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে থাকে।

---

১০৫. Student development training guide, publica tion: working for better life, p. 48

১০৬. Student development training guide, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮.

Dhaka University Institutional Repository

সর্বসাধারণের জন্য আইনের সহজ প্রয়োগ না থাকায় সর্ব স্তরের জনতা, ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবি, ব্যবসায়ী সহ সকল শ্রেণীর সার্বিক কর্মকান্ডের উপর সন্ত্রাসের কুপ্রভাব পড়ে থাকে। ফলে মুকিম গাজী, এরশাদ শিকদারের মত সন্ত্রাসীরা সমাজে অলিখিতভাবে একটি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারে। সাধারণ সমাজিক বাসিন্দাদের কেউ এদের অন্যায় প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

"সন্ত্রাসী শ্রেণীর উত্থানে দেখা গেছে, কখনো কখনো সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষ তাদের ক্রমাগত দুরাবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে বৈষম্যমূলক প্রশাসন ও আইনকে নিজ হাতে তুলে নেয়। ফলে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ শুরু হয়। দেখা দেয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা। নৈতিক শিক্ষার অভাবজনিত কারনে তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উচিত অনুচিত্যের পার্থক্য করতে পারে না। এভাবেই সমাজে সন্ত্রাসের উদ্ভব হয়। এই সব সন্ত্রাসীরা একসময় আইনের পাশ কাটিয়ে প্রভাবশালীদের স্বার্থ সংরক্ষনের চুক্তিতে তাদের নিকট আশ্রয় ও আনুকূল্য পায় এবং সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে।"[১০৭]

সমাজে সন্ত্রাস উৎপত্তির কারণ সমূহ

সমাজই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সন্ত্রাসকে লালন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। মোটকথা, সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণেই সন্ত্রাস হয়ে থাকে। যেমন-

(ক) ধনীক গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য

সমাজের এক শ্রেণীর অশুভ ধনীক গোষ্ঠী সদাচারনের উপর শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। এর ফলে তারা ব্যাপক সম্পদশালী হয়ে উঠে। কিন্তু এই পর্যায়ে পৌছানোর জন্য তাদের সমাজে অবৈধ আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজন পড়ে। এই কাজের জন্য একটা শ্রেণী সৃষ্টি করে যারা সাধারণের উপর ভীতি ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে শোষণ ও অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই মধ্যবর্তী শ্রেণীটিই নীতি ও মানবিকতা ভূলে গিয়ে উর্দ্ধতনের আদেশ বাস্তবায়ন করে থাকে। তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। বিনিময়ে তারা পায় সাময়িক নিরাপত্তা, আর্থিক সুবিধা ও অবৈধ কার্যকলাপের সুযোগ।

(খ) রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা এখন নৈমিত্তিক ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দুইভাবে সন্ত্রাসীদের মদদ যোগায়। এক. স্বাভাবিক মানুষ থেকে সন্ত্রাসী শ্রেণী সৃষ্টির মাধ্যমে। দুই কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের অনেক চাহিদা রয়েছে। মুলতঃ তাদের উপর নির্ভর করেই তারা ক্ষমতা ও নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। এজন্য ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও সন্ত্রাসীদের সমস্যা হয় না। কারণ তখন নতুন ক্ষমতাশীনদের নিকট থেকে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় ও মদদ পেয়ে থাকে। এভাবে সমাজে সন্ত্রাসীদের প্রভাব থেকেই যায়।

(গ) অবৈধ পথে ফায়দা গ্রহনের সুযোগ হিসেবে

সমাজের অধিকাংশ প্রভাবশালী ব্যক্তিই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বলে সন্ত্রাসীদের প্রয়োজন হয়। পাচার, চোরাকারবারী, অবৈধ ব্যবসা, অবৈধ উপার্জন যেমন, ঘুষ, দুর্নীতি, টেন্ডার, লাইসেন্স, পারমিট, জমি দখল, টার্মিনাল নিয়ন্ত্রন, ভেজাল ব্যবসা, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কাজে সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। তাই এসব কাজে সন্ত্রাসী ও অবৈধ প্রভাবশালীদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও চুক্তি থাকে। এসবের সাতে জড়িত থাকে দুর্নীতিবাজ প্রশাসন। কখনো সংবাদ সংস্থা বা মিডিয়ার লোকজনও এসব অপকর্ম থেকে ফায়দা লুটে পাশ কেটে যায়।

---

১০৭. Student development training guide, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮.

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সন্ত্রাসীদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার কারনে

সন্ত্রাসীদের সকল পথ নিষ্কণ্টক নয়। স্বার্থহানির কোন কারণ ঘটলেই প্রভাবশালীদের সাথে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সহিংসতা ঘটে থাকে। এর ফলে সন্ত্রাসীদের মধ্যে দেখা যায় আশ্রয় দাতাদের মধ্যে রদ বদল। আবার সন্ত্রাসীরা নিজেদের সুবিধার জন্য তৈরি করে বিভিন্ন গ্রুপ। এসব গ্রুপ অন্য সাধু কিংবা অসাধু প্রতিপক্ষের সাথে নানা সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে সন্ত্রাসীদের আন্তঃদলীয় কোন্দল ও বহির্দলীয় কোন্দলের কারনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এভাবে সমাজে সন্ত্রাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। খেসারত দিতে হয় সমাজের সাধারণ মানুষকে।

পরিশেষ বলা যায়, সন্ত্রাস একটা সামাজিক ব্যাধি। সমাজের নানা বিশৃঙ্খলা, বৈষম্য ও অনাচার থেকে এর উদ্ভব। এসব প্রয়োজনেই সমাজে অসাধু ব্যক্তিরা সন্ত্রাসকে লালন করে। অনেক সাধারণ মানুষ ও এখন সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে অপরাধ বৃদ্ধি করছে। বর্তমান সমাজের অনেক কিছুতেই সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চালালেও এখনো পুরোপুরি তাদের হাতে চলে যায়নি। সরকারের আইনী সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে খুব সহজেই সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব । তারা যাতে এই ইচ্ছা পোষণ করতে বাধ্য হয় এজন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। যতই বড় ক্ষমতাশীনদের ছত্র-ছায়ায় থাকুক না কেন তাদের সকল কিছুই অবৈধ। এদিক থেকে তাদের ভিত্তি কখনোই মজবুত হতে পারেনা। কাজেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করে সন্ত্রাসকে বিদুরিত করা মোটেই অসম্ভব নয়।

আইয়্যামে জাহেলিয়া যুগে সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে ইসলামের দিক নির্দেশনায় যে ভাবে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে বর্তমানে আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। তাহলে অবশ্যই সন্ত্রাস সহ সকল প্রকার অপরাধ দূর করা সম্ভব হবে। এই আত্মবিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ় করা উচিত।

চুরি-ডাকাতি

'সামাজিক অনাচার গুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন ঘৃণীত ও কঠিন অপমান জনক কার্যকলাপ হিসেবে চুরি ও ডাকাতি তৃতীয় বিশ্বের উল্লেখযোগ্য বিষয়। সমাজে পরস্পরের প্রতি যে অধিকার ও কর্তব্য আছে। এসব কর্তব্য পালন করাই হচ্ছে 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার অধিকার। আল্লাহর হক আদায় করতে কোন ত্রুটি হলে বান্দা ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে বা অধিকার হরন করলে আল্লাহতা ক্ষমা করবেন না। চুরি-ডাকাতি হল বান্দার হক নষ্ট করার অন্যতম উপকরণ। প্রায় প্রতিদিন পত্রিকার পাতা উল্টালে চুরি-ডাকাতির খবর চোখে পড়ে। চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে সমাজের সর্বত্রই। গরীব অভিজাত এলাকায় ভিক্ষুক ছদ্মবেশে বা কখনো কলিংবেল চিপে গৃহে প্রবেশ করে বাড়ীর সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বা কখনো কখনো হাত-পা বেধে সর্বস্ব লুট করার সংবাদ পত্রিকায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গৃহডাকাতির মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন বিশেষ করে লঞ্চ, বাসগাড়ী, ট্রেন, এমনকি বিমান ডাকাতির খবর যাত্রীদের সার্বক্ষণিক ভীতির মধ্যে রাখে।

(ক) সংজ্ঞা ও পরিচিতি

গোপন ভাবে অন্যকে না দেখিয়ে পরের ধন সম্পদ করায়ত্ব করাই হচ্ছে চুরি। অন্যদের কথা বার্তা তাদের অজ্ঞাতসারে শ্রবণ করাকেও বলা হয় চুরি করে শোনা। অন্যকে না জানিয়ে তাকে দেয়া হচ্ছে চুরি করে দেখা। সাধারণত ধারণা করা হয় মানুষ চুরি করে দারিদ্র্যের কারনে, ক্ষুধা নিবৃত্তির অবস্থা নেই বলে।

Dhaka University Institutional Repository

ডাকাতি মানে প্রকাশ্য দস্যু বৃত্তি। শক্তি বল ও অবৈধ সাহস খাটিয়ে প্রকাশ্যে ভীতি প্রদর্শন করে বা অস্ত্র দেখিয়ে কারো টাকা পয়সা সহায় সম্পদ জোরপূর্বক অপহরণ করাকে ডাকাতি বলে। যেসব লোক সশস্ত্র হয়ে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাড়ীতে, নদীতে, মরুভূমিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যভাবে জনগনের সম্মুখে জনগণের ধন-মাল হরন করে নিয়ে যায়, তারাই ডাকাত। কুরআন মাজীদে তাদেরকে বলা হয়েছে মুহারিব বা ডাকাত। যেসব লোক শহর, নগর, গ্রাম জনপদের মধ্যে সশস্ত্র লুণ্ঠন করে তাদেরকেও মুহারিব বলা হয়।

(খ) বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ডাকাতির চিত্রঃ

বিগত পাঁচ বছরে (২০০২-২০০৬)ইং সনে ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশে সর্বমোট ৬৬৭৫টি। ২০০৪ ১৩১৩টি, ২০০৫ সালে ১২৪৯টি এবং বিগত বছর (২০০৬ সালে) ডাকাতি হয়েছে মোট ১১৫৬টি।

মাস / বছর	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চঃ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ	মোট
২০০২	১১৮	১০৯	১০৬	৮৪	১৩৪	১২৭	১৩৫	৮৮	১২৭	১১৪	১৫৩	৮৬	১৩৮১
২০০৩	১৪৪	১৩৯	১৫৩	১১৯	১৫৯	১৪৮	১৩৮	১৪১	১৭১	৬৫	৯৩	১১৬	১৫৭৬
২০০৪	১১২	১০৮	১১৩	৮৫	৯৮	১২৫	১৩৪	৭৮	১২১	১২৫	১৪২	৭২	১৩১৩
২০০৫	৯৮	১০৫	১০২	৯৬	১০৫	১০৪	১২৮	৭১	১১৭	১২২	১০৮	৯৩	১২৪৯
২০০৬	৭৭	৯০	১০৯	১০২	১০৮	৯২	৮৮	৭৯	১২২	১৩৮	৭৪	৭৭	১১৫৬
মোট	৫৪৯	৫৪১	৫৮৩	৪৮৬	৬০৪	৫৯৬	৬২৩	৪৫৭	৬৫৮	৫৬৪	৫৭০	৪৪৪	৬৬৭৫

তথ্যসূত্রঃ আইজিপি কার্যালয়ের সংরক্ষিত তথ্য ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহ।

বিগত ০৫ (পাঁচ বছরে মাসভিত্তিক গড় হিসেবে লক্ষ্যণীয় যে জানুয়ারী মাসে ডাকাতি ঘটেছে ৫৪৯টি, ফেব্রুয়ারী মাসে ৫৪১টি, মার্চ মাসে ৫৮৩টি, এপ্রিল মাসে ৪৮৬ টি, মে সামে ৬০৪টি, জুন মাসে ৪৯৬টি, জুলাই মাসে ৬২৩টি, আগষ্ট মাসে ৪৫৭টি, সেপ্টেম্বর মাসে ৬৫৮টি, অক্টোবর ৫৬৪টি, নভেম্বর ৫৭০টি, এবং ডিসেম্বর ৫৪৪টি বিগত ৫ পাঁচ বছরে সবচেয়ে কম ডাকাটির ঘটনা ঘটেছে ডিসেম্বর মাসে ৪৪৪টি এবং সর্বোচ্চ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে সেপ্টেম্বর মাসে ৬৫৮ টি)।

বাংলাদেশে ছিনতাই এর ভয়াবহ চিত্র

ছিনতাই শব্দটি শুনলেই আমরা আতংকগ্রস্ত হই, ভীত সন্ত্রস্ত থাকি সবসময়ই। রাজধানী ঢাকাতেই প্রায়শঃ বড় ধরনের ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে থাকে। ঢাকার বাইরে চট্টগাম, রাজশাহী, খুলনা, মহানগরীসহ সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিনতাই এর সংবাদপত্র পত্রিকায় তূলনামূলক ভাবে বেশী লক্ষ্য করা যায়। তবে সংঘটিত ঘটনার খুব কম সংখ্যক খবরই পত্র পত্রিকায় আসে। ছিনতাই এ প্রধানতম শিকার হন নারীরা, ব্যবসায়ীরাও অনেক সময় ছিনতাই এর কবলে পড়েন। ছিনতাইকারীরা ব্যবসায়ীদের কিংবা ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনকারী, ব্যাংকে টাকা জমাদানকারীদের টার্গেট নিয়ে তাদের কাছ থেকে পরিকল্পিত ভাবে ছিনতাই করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ছিনতাই কি?

ছিনতাই মানে কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া, হরণ করা, অপরের জিনিষ অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বা জোর পূর্বক হরণ করাকে ছিনতাই বলে। এটি ডাকাতি ও রাহাজানিরই আধুনিক রূপ। ছিনতাই আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ। কোন বস্তু, জান-মাল, প্রাণী, যানবাহন প্রভৃতি জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়াকে ছিনতাই বলে। চুরি থেকে ছিনতাই আরো বড় ধরনের অনাচার। কেননা কেড়ে নেয়া, ছিনিয়ে নেয়া এবং আত্মসাৎ করণ ও গচ্ছিতধন অপহরণ, চুরি নয় বরং ছিনতাই। ইসলামে ছিনতাই কারীর শাস্তি সশস্ত্র ডাকাতির শাস্তির স্বরূপ।

(খ) সমাজে ছিনতাই এর প্রভাব

সমাজ জীবনে ছিনতাই একটি জঘন্য অনাচার। ছিনতাই এর প্রভাব পরে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সমাজে ছিনতাই রাহাজানি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সে সমাজে কারো সুখ শান্তি থাকে না। মানুষ শান্তি তে চলাফেরা করতে পারে না এমন কি সমাজের মানুষের নিদ্রাও ছিনতাই এর প্রভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ছিনতাই কারীরা সামাজিক শত্রু এবং হিংস্র বন্যপশু হায়নার চেয়েও মারাত্মক। ছিনতাইকারীদের নিজেদের যেমন- মানমর্যাদা নেই তেমনি গোটা সমাজের মানমর্যাদা তারা ভূলুণ্ঠিত করে। তাই সমাজের কোন সদস্যই তাদের সু-নজরে দেখেনা। ছিনতাই, হাইজ্যাক, রাহাজানি সমাজের সব ধরনের উন্নয়ন বাধা গ্রস্ত ও ব্যহত করে। ছিনতাই এর ফলে ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে, বিমানে, সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা চরম আকার ধারণ করেছে। জান-মাল, ধন-সম্পদ, মান- ইজ্জত সব কিছুতেই নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। ছিনতাই এর ভয়ে মানুষের নিরাপদে চলাফেরা দুস্কর হয়ে পরে। ছিনতাইকারীদের জান-মালের নিশ্চয়তা থাকেনা। ছিনতাইকারীরা প্রশাসন বা সাধারণ জনগনের হাতে ধরা পড়লে বিভিন্ন দুর্ঘটনা সহ অপমৃত্যুও ঘটে। তাই ছিনতাই কারীদের পরিবার পরিজন সামাজিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে সদস্যরা নোংরা কার্যকলাপসহ সামাজিক অনাচারের লিপ্ত হয়। ছিনতাই একটি সামাজিক অনাচার, আবার এ অনাচারের প্রভাবে আরও অন্যান্য সামাজিক অনাচার এর উদ্ভব ঘটে।

(গ) বিগত পাঁচ বছরের ছিনতাই এর চিত্র

(২০০০২-২০০৬ইং সনে) পাঁচ বছরে ঢাকা সহ গোটা বাংলাদেশে মোট ৩৩০৩টি ছিনতাই এর ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার শিকার হয় ৩৬০৫জন। ছিনতাই এর সময় নিহত হয় ২৩৮জন। গনপিটুনিতে নিহত হয় ১০৬ জন এবং ছিনতাই অনাচারে নির্যাতনের শিকার হয়ে আহত হয় ৮৪৫জন। ২০০২সালে ছিনতাই ঘটেছে ৮২৩টি, ২০০৩ সালে ছিনতাই ঘটেছে ৮৯৯টি, ২০০৪ সালে ৭৬৬টি, ২০০৫সালে ৪৩৪টি এবং ২০০৬সালে ছিনতাই এর ঘটনা ঘটেছে ৩৮৩টি।

এক নজরে বিগত (২০০২-২০০৬) ৫ বছরে ছিনতাইয়ের চিত্র।

মাস / বছর	জানুঃ	ফেব্রুঃ	মার্চঃ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেঃ	অক্টোঃ	নভেঃ	ডিসেঃ	মোট
২০০২	৬৭	৬৮	৬৫	৭৬	৮০	৬৬	৯০	৫৫	৭১	৬৩	৬৪	৫৬	৮২১
২০০৩	৫১	৪২	৬৯	৮৭	৮১	৮৫	৬৬	৭৪	৯১	৯৫	৭৭	৮১	৮৯৯
২০০৪	৩৮	১৭	৩২	৩৯	৪১	৪০	১১৪	১৪৫	৪৪	৯১	৩৪	১০১	৭৬৬
২০০৫	৪২	৩০	৪৬	৪৪	৩২	২৪	২৫	২৬	৪৯	২৬	৩৬	৫৪	৪৩৪
২০০৬	৪৯	২৮	৩৩	৫৮	২২	১৯	২৮	২১	৩৭	২৯	৩৭	২২	৩৮৩
মোট	২৪৭	১৮৫	২৪৫	৩০৪	২৫৬	২৩৪	৩৫৩	৩২১	২৯২	৩০৪	২৪৮	৩১৪	৩৩০৩

তথ্যসূত্রঃ আইজিপি কার্যালয়ের সংরক্ষিত তথ্য ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬সালে সবচেয়ে বেশী ছিনতাই এর ঘটনা ঘটেছে এপ্রিল মাসে ৫৮টি। সবচেয়ে কম ছিনতাইর ঘটনা ঘটেছে জুন মাসে ১৯টি। পাঁচ বছরের সকল মাস সমূহ সমন্বয় করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী ছিনতাইর ঘটনা ঘটেছে জুলাই মাসে ৩৫৩টি। আর কম ছিনতাই ঘটেছে ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮৫টি।

উপরোক্ত পাঁচ বছরের মধ্যে ২০০২ সালে সরাদেশ ছিনতাইকারীদের যেন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ছিনতাইকারীর এতবেশী তৎপরতা ছিল যে, তারা প্রকাশ্য দিবালোকে বীরদর্পে যত্রতত্র নির্বিঘ্নে ছিনতাই করে। ২০০২ সালের পরিসংখ্যানে মনে হয় তৎকালীন সময়ে ছিনতাই এর মহোৎসব চলছিল। ২০০২ সালে ছিনতাই এর ৮২১টি ঘটনার মধ্যে শিকার হয় ৯৭৫ জন। ছিনতাই ঘটনার উক্ত সময়ে নিহত হয় ৫৩ জন এবং গণপিটুনীতে নিহত হয় ১৮ জন। ছিনতাই কারী কর্তৃক সন্ত্রাসী নির্যাতনের শিকার হয়ে আহত হয় ২৯৩ জন।

সুদ ও সুদ প্রথা

মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম, আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবন ধারার সাথে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা উপহার প্রদান ইসলামী জীবন দশর্নের বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। অর্থ ছাড়া জীবন ধারণ সু-কঠিন, তাই বলে ইসলাম মানুষকে অর্থোপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয়নি। উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি না করে সম্পদ উপার্জন সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতাও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম সমর্থিত সমাজ ব্যবস্থা। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশী কঠোর। দরিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের জনসাধারণ নিত্য দিনের চাহিদা তার উপার্জনের চেয়ে কম হওয়ার ফলে সুদ নামক নীরব ঘাতকের হাতে শিকার হয়ে পরে অতি সহজেই। বাংলাদেশে তুলনামূলক স্বাবলম্বী শ্রেণী নিচু দরিদ্র শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের সুদ নামক মারণাস্ত্র দিয়ে তিলে তিলে ধ্বংস করে আর্থ-সামাজিক ভাবে। তাই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সুদ ও সুদপ্রথা অত্যন্ত পরিচিত বিষয়, যা লালন করছে স্বাচ্ছন্দে ও মহানন্দে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমাজের প্রায় অধিকাংশ জনগন।

(ক) সুদ প্রথা কি?

সুদ এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে বাড়তি, অতিরিক্ত বা বেশী। বিনিয়োগ কৃত বস্তু বা অর্থের রূপ পরিবর্তন না করে ন্যায্য প্রাপ্ত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করাকে সুদ বলা হয়ে থাকে। একই শ্রেণীর জিনিসের ক্ষেত্রে এই সুদ প্রযোজ্য এবং সুদ সাধারণত বাকী বিক্রয়ের বেলায়ই হয়ে থাকে। যেমন কেহ এক কেজি চালের বিনিময়ে এক কেজি চালই গ্রহণ করতে পারে। এর বেশী গ্রহণ করলে সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এক কেজি চালের বিনিময়ে এক কেজি চাল এবং এর অতিরিক্ত অন্য যে কোন জিনিস বা অর্থ গ্রহণ করলে সুদ গ্রহণ করা হয়। সুদের পরিচয় সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেন (স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময়ে লবন। একই প্রকার দ্রব্যের বিনিময়ে একই প্রকার দ্রব্য (নগদ আদান প্রদান) আর অতিরিক্ত হলেই সুদ, অর্থাৎ কেহ বেশী দিলে আর বেশী নিলে উভয়েই সুদে লিপ্ত হবে।[১০৮]

১০৮. মিশকাতুল মাছাবীহ্, কিতাবুজ যাকাত, হাদীস নং ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি

সুদ ব্যবস্থা মানব সভ্যতার ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন। মহাজন কিংবা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ অভাবী ঋণ-গ্রহীতাদের ওপর নির্যাতনমূলক এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলাম-পূর্ব বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন। আধুনিক কালের ন্যায় তৎকালেও সুদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল প্রধানত ৩টি কারনে। যথা–

ক. ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে।

খ. নৈতিক কারনে।

গ. অর্থনৈতিক কারনে।

❖ হিব্রু বা [১০৯] ইহুদী মতবাদে সুদ ও সুদপ্রথা

প্রাচীন ইহুদী মতবাদে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের ইহুদীগণ এ নীতির পরিবর্তন করেন। ইহুদীগণ শুধুমাত্র অ-ইহুদীদেরকে ঋণ দিয়ে সুদ দেয়া বৈধ মনে করে। তাই এক ইহুদী অন্য ইহুদীকে ঋণ দিয়ে সুদ নিতে পারত না।[১১০] Exodusএ বলা হয়েছে তোমরা যদি আমার কোন লোককে টাকা ধার দাও, যারা গরীব, তবে তোমরা তার উত্তম মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।[১১১]

অনুরূপভাবে Deuteronomy-এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ধার দেবে না অর্থের উপর সুদ, খাদ্য-সামগ্রীর উপর সুদ, এবং যে কোন জিনিস যা ধার দেয়া হয় তার উপর সুদ।[১১২]

❖ গ্রীক দার্শনিকদের মতে সুদ প্রথা

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টোটল সুদকে জালিয়াতি ও নির্যাতনমূলক ব্যবসা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরিষ্টোটল সুদের সমালোচনা করে বলেন– "একটি টাকা অন্য একটি টাকার জন্ম দিতে পারে না। কারণ ইহা বন্ধ্যা, জড় পদার্থ। নির্জীবধাতু আরেকটি ধাতুর জন্ম দিতে পারে না।"[১১৩]

---

১০৯. হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রবর্তিত আইনকে (Mosaic Laws) হিব্রু মতবাদ বা ইহুদী মতবাদ বলা হয়। বর্তমানে ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ) প্রবর্তিত নীতিকে পরিবর্তন করে নিজেদের মনগড়া নীতি দ্বারা সাজিয়েছে।

১১০. অধ্যাপক হেন ঃ History of economic thought (1964) পৃ. ৪১-৪২।

১১১. মোহাম্মাদ শরীফ হুসাইন ও শাহ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি কি ও কেন? (ঢাকা ঃ ই. বি.বি এল. ১৯৮৪) খ. ২, পৃ.৮৬।

১১২. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৫।

১১৩. The most hared sort, and with the greatest reason, is usury, wich makes again out money itself, and not from the natural object of it. For money was intended to be used in exchange, but not to increse at applied to the breeding of money, because theoffspring resembles tge parent, whwrefore of all modes of getting wealth this is the most unnatural. (Aristotals, Politics, p. 71-

Dhaka University Institutional Repository

❖ রোমান দার্শনিক ও আইনবেত্তাদের মতে সুদ

রোমান দার্শনিকগণ সুদকে মানুষ খুনের মতো পাপ কার্য বলে মনে করতেন।[১১৪] কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য যখন বিশাল হতে বিশালতর হতে থাকে এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পতে থাকে। তখন রোমান আইনবেত্তাগণ সুদ নেয়াকে সম্পূর্ণ নিষেধ না করে এর জন্যে নিম্নহার নির্ধারণ করেণ। অবশ্য পরবর্তীতে এ আইন বহুবার পরিবর্তিত হয়।[১১৫]

❖ খ্রীষ্ট ধর্ম মতে সুদ

হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রবর্তিত ধর্মে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।[১১৬] কিন্তু পরবর্তীতে পরিবেশ ও অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ করে ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারের ফলে এ নীতির পরিবর্তন ঘটে।[১১৭] সেন্ট টমাস একুইনাম ও তার অনুবর্তী লেখকগণ দুটিসূত্রে সুদ গ্রহনের স্বীকৃতিদেন। যথাঃ লগ্নিকারবার করে মহাজনের ক্ষতি হলে এবং খ. মহাজন যখন লাভজনক ব্যবসায় মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু অনেকেই তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি।

❖ হিন্দু ধর্ম মতে সুদ

হিন্দু ধর্মের নীতি নির্ধারক ব্রাহ্মণরাও সুদকে অত্যন্ত নিচু কাজ হিসেবে মনে করত। এজন্যে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে তৃতীয় শ্রেণীর (বৈশ্য) লোকদের পেশা হিসেবে নির্বাচিত করেন।

❖ বিংশ শতাব্দীর প্রখাত অর্থনীতিবীদদের মতে সুদ

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী অর্থনীতিবিদ লর্ডকীনস সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করে সুদের হারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহনের সুপারিশ করেন।[১১৮] তিনি এ আশাও ব্যক্ত করেন যে, সঠিকভাবে পরিচালিত সমাজের পক্ষে এক পুরুষ কালের মধ্যেই সুদেরহারকে শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব।

কীনস তাররচিত 'দি থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্ট এন্ড মানি' নামক গ্রন্থের 'অবজারবেশনস অন ন্যাচার অব ক্যাপিটাল' শীর্ষক আলোচনায় স্পষ্টত ইসলামের ব্যাংকিং ধারণাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং জনসাধারণকে সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনশীল উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের আহবান জানিয়েছেন।

---

১১৪. রোমান দার্শনিক সিসেরো সুদ সম্পর্কে কঠোর অভিমত ব্যক্ত করে বলেনঃ Usury i.c. Interest as bad as murder, Saying would you take Interest? Would you kill a man? Haney প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭ এবং Alexcander Gray: The Development of Economic Doctrine (Edn. 1965) p.24.

১১৫. শফিকুর রহমান, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ক্রমবিকাশ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ইং), পৃ.৬২-৬৩।

১১৬. খৃষ্টান ধর্মীয় নেতাগন বলেনঃ The Holy with forbide it : The mosaic law prohibits usury takingform a brother, Christ said, lend hoping for nothing again (Luke P.35) প্রাগুক্ত,পৃ. ১০১।

১১৭. অধ্যাপক এরিকরোল এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, Inspite of the more determined attitude of the church and its more sophisticated arguments, the practice of the taking interest grew with Economic Expansion. Eric Roll. A History of Economics thought (London: 1553), p. 49.

১১৮. I mean the doctrine that the rate of Interest is not self-adjusting at a level best suited to the Social advantage but constantly tends to rise too high. So that a wise government is Concerned to carb it by statute and custom and even by envoking the sanctions of the morad Law. J.M. Keyn's, the general Theory of Employment Interest and Money (New York: 1978), p. 351.

Dhaka University Institutional Repository

❖ বিভিন্ন মতবাদে সুদের স্থান

বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখো যায় যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুদের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। কেননা সেখানে সঞ্চয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করা হয়। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত পরিমাণ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বাদ দেয়ার পর বাকি অংশ উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বন্টন করা হয়।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার জন্মদাতা সুদকেই ধরা হয়। কেননা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি ও কর্পোরেশনের মালিক সুদের মাধ্যমে জনসাধারনের সঞ্চয়কে কুক্ষিগত করে সে সঞ্চয়কে নিজেদের সুবিধামত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে অধিক সম্পদের মালিক হয়। [১১৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমানিত যে, সুদ একটি অকল্যাণ ও শোষণমূলক ব্যবস্থা- এ সত্যটি যেমনিভাবে সকল ধর্মেই স্বীকৃত তেমনি অধিকাংশ মানব মতাদর্শের দ্বারাও স্বীকৃত। তবে যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে মানুষ তাদের ধর্মকে ইচ্ছেমত পরিবর্তন করে সাজিয়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার মৌলিক নীতিমালা শাশ্বত এবং কোন ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে এর কোনরুপ পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

৩। সামাজিক ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সুদের ক্ষতিকর দিক কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। সুদের এ মহাবিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাদবিগণ শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চস্বরে ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, একটি অতি ক্ষুদ্র দায়িত্বহীন স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে এধরনের বিপুল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যন্ত সমগ্র মানবিক কর্মকান্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, মানসিক কাঠিন্য ও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে।[১২০]

সুদের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, মানুষের স্বার্থপরতার কারনে সুদের প্রচলন হয়েছে। "সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সুদ খায়, তাদের মধ্যে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশলাভ করে যে, তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুন্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটাসমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সমাজে সুদ দিতে না পারলে মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্য জরুরী ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

---

১১৯. কিন্তু যাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা পুঁজিপতিরা অর্থ, বৈভব ও সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী সে সঞ্চয়কারীদেরকে সুদের মাধ্যমে মোট সৃষ্ট উদ্বৃত্তের অতি নগণ্য অংশ প্রদান করে।

১২০. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনু, আব্বাস আলীখান ও আব্দুল মন্নান তালিব (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী,১৯৭৯ইং) পৃ.৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী নিজের আপদকালে সুদ দিতে ব্যর্থ হয় বলে দেউলিয়া হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়।"[১২১] এক কথায় সুদী সমাজে সুদই যাবতীয় আর্থিক লেন-দেন ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। যারা সুদদিতে সক্ষম তাদের জন্য মহাজন এবং মহাজনদের দ্বারা গঠিত ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু যারা সুদ দিতে অক্ষম তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়াতো দূরের কথা, মৌখিক সহানুভূতিটুকু দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়। ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের ক্ষতিকর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "এ ধরনের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।"[১২২]

আফজালুর রহমান বলেন, "It inculcates habit of miserliness, selfishness, cruelty, love lf money, greed for accumulation of wealth etc. maong individuals it spreads class- struggle and class-hatred among people and checkst he growth of ideals of mutual help and co-operation."[১২৩]

সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপর্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। স্বল্পঋণ গ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবনযাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

সুদের কারনেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরো ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সে ঋণ উৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে 'করযে হাসানার' কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়, এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে ধনী আরো ধনী হয়। আর ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায় দরিদ্র।

সুদের কারনেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকের ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হতে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা তা বন্ধক রেখে সুদ-আসলসহ শুধতে হয় তা না হলে কি মহাজন কি ব্যাংক সকলকেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নয়।

---

১২১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

১২২. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, Islan and the Theory of Interest (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987),P.148

১২৩. Afzalur Rahman, Ibid, Vol---,P.127.

Dhaka University Institutional Repository

সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে। ঋণ গ্রহীতারা কঠোর পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করে তার সবটাই প্রায় মহাজনের সুদ পরিশোধ করার জন্য দিতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও ঋণের দায়ে সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা যখন মানুষের চরম বিপদ-আপদ ও সংকটকে চড়া সুদ আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তাদের অমানবিক আচরণের ফলে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সুদখোরদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের ফলে মানুষ তাদেরকে সমাজের বন্ধু ভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে। শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'- এ অঙ্কিত শাইলক-এর চরিত্রে মধ্যযুগ এবং সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকালে সুদখোর মহাজনদের রক্তশোষক চেহারা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি মহাজনের বিরুদ্ধে সমাজে সৃষ্ট ঘৃণা-বিদ্বেষের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত এ সময়ে সাধারণ মানুষ সুদখোর মহাজনের রক্ত শোষক নরপিশাচ হিসেবে গণ্য করত। এরা বাহ্যত সমাজে ও শিল্পখাতে কিছু পুঁজি সরবরাহ করত এবং পরে সর্বশেষ জীবনী শক্তিটুকু নিঃশেষে শোষণ করে নিত।

ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী বলেছেন, "The money lender continued to be feared and detested by all people in out of their clutches."[১২৪]

সুদী সমাজে সুদ ছাড়া ঋণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ফলে সে সমাজের দরিদ্র ও মাধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জরুরী প্রয়োজনে, বিপদ-আপদ ও দুর্বিপাকের চরম সংকটকালে সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়া ও চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়।

কালমার্ক্স বলেছেন, "The borrower has no occasion to borrow as a producer, When he does any borrowing of money he does it for securing personal necessities."[১২৫]

সমাজে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনের কর্মচারীগণ সর্বদা মহাজনের চাপের মুখে থাকে এবং তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জনটুকু মহাজনকে দেয়ার ফলে অর্থাভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দিতে পারেনা। ফলে এসব ছেলে-মেয়েরা সু-শিক্ষার অভাবে বিপথগামী হয়ে ওঠে। এতে অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং সামাজিক শান্তি-শৃংঙ্খলা নষ্ট হতে থাকে। সুদখোর মহাজনরা যেমনি অনাচারে লিপ্ত হয়। তেমনি শোষিত শ্রেণীর সন্তানেরা সবকিছু হারিয়ে বিভিন্ন রকম অনাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

ঘুষ, উৎকোচ ও উপঢৌকন

অন্যায়ভাবে অপরের ধন হস্তগত ভক্ষন করার একধরনের পদ্ধতি হচ্ছে ঘুষ বা উৎকোচ। স্বার্থ হাসিল বা কার্যসিদ্ধির জন্য সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, এমপি মন্ত্রীসহ দায়বদ্ধতার চাপে কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে প্রকাশ্যে মূল্যবান বস্তু দ্রব্য প্রদান করে তাদের মনোরঞ্জন লাভ করার প্রক্রিয়াকে উৎকোচ বা উপঢৌকন বলে। ঘুষ উৎকোচ ও উপঢৌকন আবহমান কাল থেকে সমাজে চলমান ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে এটা কঠিন সামাজিক অনাচার হিসেবে বিবেচিত। ঘুষের সাথে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই জড়িত। তবে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ ঘুষ উৎকোচের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বেশীর ভাগ শোষণ করে শোষক ঘুষ দাতা উভয়েই সমান ভাবে দোষী।

---

১২৪. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, Ibid, P.161.

১২৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

(ক) উৎকোচ বা ঘুষ কি?

স্বাভাবিক ও সঠিক প্রাপ্যের পরেও অসদুপায় অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। কোন কর্মকর্তা কর্মচারী অর্পিত কাজের জন্য নিয়মিত বেতন ভাতা পায়, কিন্তু সে কাজের জন্য বাড়তি কিছু গ্রহণ করাকে উৎকোচ বা ঘুষ বলে। ঘুষ দাতা কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই ঘুষ দিয়ে থাকে। তাছাড়া টাকা পয়সা ছাড়াও উপহারের নামে নানা সামগ্রী প্রদান করা হয়। যে নামেই হোক না কেন এ সবই ঘুষের অন্তর্ভূক্ত।

মহানবী (সঃ) বলেছেন আমরা যাকে যে পদে নিয়োগ করি এবং তাকে সে জন্য বেতন দেয়া হয়, এ বেতন ব্যতীত সে যা গ্রহণ করবে তা বিশ্বাস ঘাতকতা (আবু দাউদ) রাসূলে পাক (সাঃ) আরো বলেন যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল আর তার প্রতিদানে তাকে কিছু উপহার দেয়া হল সে যদি তা গ্রহণ করে তবে সে ঘুষের দরজাসমুহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হবে।"[১২৬]

ঘুষ বা উৎকোচ সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন।

"ঘুষের ব্যাপারে কঠোরতা ও তীব্রতার প্রচন্ডতা দেখে বলতে হয় যে, বিচারক, প্রশাসক কিংবা তাদের মত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত তাদের মা বাবার ঘরে বসে থাকা। তাদের পদচ্যুত করে দেয়ার পর তাদের মায়ের ঘরে থাকা অবস্থায় তাদের যদি হাদিয়া-তোহফা দেওয়া হয়, তাহলে পদে অভিষিক্ত থাকা অবস্থায়ও তা গ্রহণ করা তাদের জন্য জায়েয হতে পারে। আর সে সম্পর্কে জানতে পারবে যে, যা তার পদে অভিষিক্ত থাকার কারনেই দেয়া হয়েছে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। আর বন্ধু বান্ধবদের দেয়া হাদিয়া তোহফা যদি পদচ্যুত হওয়ার পরও দিত বলে জানা যায়, তাহলে তাতে সন্দেহ রয়েছে। কাজেই তা পরিহার করা কর্তব্য"[১২৭]

(খ) ঘুষের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি

ঘুষ সামাজিক অনাচারের চরম ক্ষতিগ্রস্ত দিক। ঘুষের প্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার ফলে কলুষিত সমাজের প্রায় সর্বস্তরের জনতাই কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেনী ঘুষের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ২০০৬সালের ঘুষ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঘুষের কারণে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সরাসরি শতকরা ৩৯.৯ভাগ। এছারা সরকার শতকরা ৩১.৮ভাগ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ৭.৭ভাগ, ব্যবসারী ৬.৭ ভাগ ছাত্র ৬.৩ ভাগ শিক্ষক ২.০ ভাগ, কৃষক ২.৫ ভাগ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ১.২ ভাগ এবং অনান্য ১.৮ ভাগ প্রাথমিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে।"[১২৮]

ধনী জনগণের তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশী ঘুষ প্রদান করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগণ (যাদের আয় বছরে ৭২ হাজার টাকার কম) ছয়টি সেবা প্রদানকারী খাতে সেবা নিতে বছরে গড়ে তাদের আয়ের ৯.৫% ঘুষ প্রদানে খরচ করে যেখানে উচ্চ আয়ের জনগণ (যাদের আয় বছরে ১,৪০০০০ টাকার চেয়ে বেশী) ঘুষ প্রদানে খরচ করে ২.৩%। ধনী জনগণের তুলনায় দুর্নীতির বোঝা গরীব জনগোষ্ঠীর উপর বেশি পড়ে কারণ তারা সরকারী সেবার উপর বেশিই নির্ভরশীল।[১২৯]

---

১২৬. 'আবু দাউদ কিতাবুল কাবায়ির' পৃ.৮৬।

১২৭. ইহয়া ইউলূম আলদ্বীন, ইমাম গাযালী (রহঃ),পৃ.১০৯

১২৮. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ ডাটাবেস-২০০৬,পৃ. ২৫

১২৯. Iftekharuzzaman, Corruption and Human Insecurity in Bangladesh, Paper presented at the seminar organized by Transparency International Bangladesh to mark the International Anti- Corruption Day on 9 December 2006.

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে ঘুষ প্রতিক্রিয়ার ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের ছক

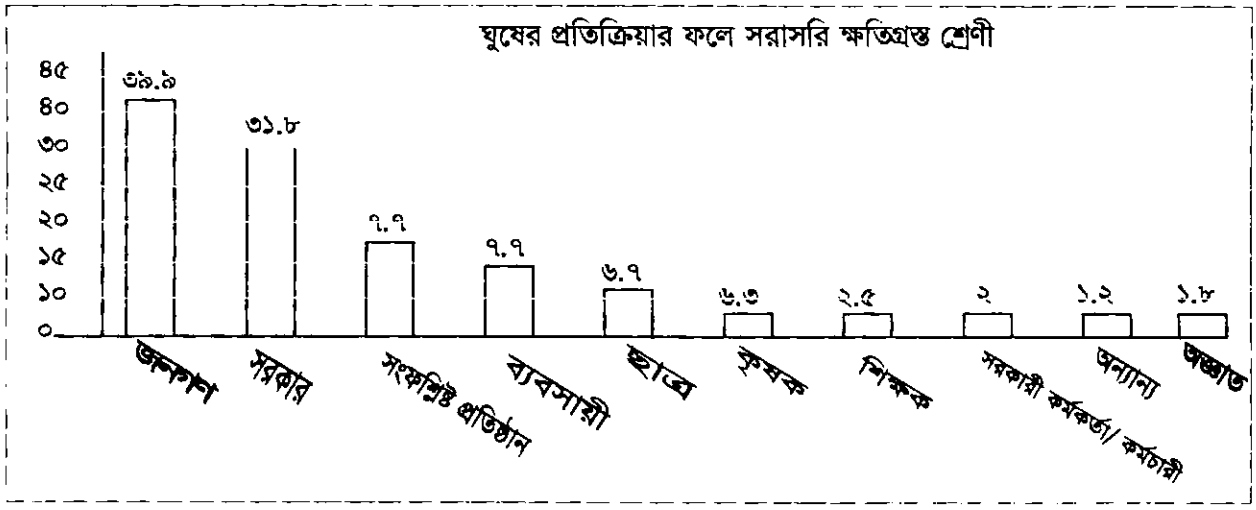

তথ্যসূত্রঃ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

(গ) ঘুষ কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে সরকারী পদক্ষেপ

ঘুষ উৎকোচ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সরকারী পদক্ষেপও একেবারে থেমে থাকেনি। আবার ঘুষ উৎকোচ কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পাশ কাটানো, স্বজনপ্রীতির ইতিহাস ও নতুন কিছু নয়। ঘুষ উৎকোচ জনিত ঘটনার ২৬.১% এর ব্যাপার কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। ৩৪.৮% ঘটনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রানালয়/বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(ঘ) ঘুষ, উৎকোচের সামাজিক অপকারিতা

ঘুষ ও উৎকোচ আদান প্রদানের মাধ্যমে একজনের হক অপরজনকে অন্যায়ভাবে প্রদান করা হয়। ঘুষ আদান প্রদান সংক্রান্ত অনাচারের কারনে অপরাপর অনাচারও সহজ, স্বাভাবিকতার রূপ নেয়, এবং সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহণকারী নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়। ঘুষের টাকা জোগাড় করতে না পেরে একদিকে ঘুষদাতা অপর পক্ষে বিনা শ্রমে গ্রহীতা অনেক টাকা পাওয়ার কারনে সমাজে আরও অনেক গর্হিত কাজে প্রলুব্ধ হয়। সমাজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঘুষখোর হওয়ার ফলে প্রশাসনিক কোন বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয় না। ঘুষ ছাড়া অফিস-আদালতের ফাইল টেবিল পরিবর্তন না হওয়ার কারনে অফিসিয়াল কাজে জটিলতা সৃষ্টি হয় মারাত্মক ভাবে। বন্দুক ঠেকিয়ে অর্থোপার্জনের চেয়ে ফাইল ঠেকিয়ে ঘুষ গ্রহনের বিষয়টি আরো জটিল। সমাজ ব্যবস্থার ঘুষের প্রচলন সমাজের নানা কু-কর্ম, পাপাচার অশ্লীলতা বৃদ্ধি করে সামাজিক, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা ব্যহত করে। এজন্য সমাজ থেকে ঘুষ নামক সামাজিক অনাচার চিরতরে নির্মূল করার অভিপ্রায়ে ঘুষ বিরোধী স্থায়ী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের একমাত্র দাবী।

Dhaka University Institutional Repository

অসুস্থ চলচ্চিত্র ও অশ্লীল প্রকাশনা

শিল্প সাহিত্যে অশ্লীলতা, চিত্রজগতের বেহায়াপনা ও সমাজের পর্নোগ্রাফিকে বিপণন যোগ্য পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অনাচারকে পাশ্চাত্যের চরম অশ্লীলতার দার প্রান্তে আরো একধাপ এগিয়ে দেয়া হয়েছে বর্তমানে শতাব্দীতে। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস সহ বিবিধ চিত্রকর্ম ভাস্কর্য নির্মাণে যৌন শুরশুরি দিয়ে যৌনচারের মত অশ্লীল আচরণের সহজ রাস্তা প্রর্দশন করানো হচ্ছে আবহমান কাল থেকে। অশ্লীল কাব্য সাহিত্য ও নোংড়া চলচ্চিত্র প্রকাশনা এক ধরনের পরোক্ষ অনাচার হলেও এগুলো সমাজের অনেক ঘৃণ্য কঠিন অনাচারের জনক। শিল্প সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রধান বাহক যৌনতা ও নগ্নতা। এজন্য সচেতন জনগোষ্ঠীর বর্তমানে একমাত্র উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে মানুষকে অনাচারের পথে আকৃষ্টি করার জন্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যৌনতা, নগ্রতা ও কু-রুচির আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি।

বাজার কাটতির লোভে শিল্প সম্মতির ব্যাপারে রেয়াত দিতে প্ররোচিত হতে পারে লেখক, যার ফলে সাহিত্যের বদলে পর্নোগ্রাফির দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে, চলচ্চিত্রের বদলে তৈরী হতে পারে নীল ছবি। তসলিমা নাসরিন, হুমায়ন আজাদ, শামসুর রহমান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি এইচ লরেন্স, মারিয়ো ভার্গাস ইয়োসা, মায়া নায়ার, বুদ্ধদেব বসুসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী কবি সাহিত্যিক ও লেখক লেখিকারা, ছবি নির্মাতাগণ সাহিত্য চলচ্চিত্র অঙ্গনে যুবক যুবতীর বেহায়াপনা বাজার চাঙ্গা করার জন্য যৌন উত্তেজক সাহিত্য ও ছবি নির্মান করে থাকেন যা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র অনাচার হিসেবেই সমাজে বিবেচিত।

"যৌনতা মানব জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক, যৌনতা নিয়ে গল্প উপন্যাস রচিত হয়েছে কিন্তু দক্ষ শিল্পির দায়িত্ব হল তাকে যৌন সাহিত্যে পর্যবসিত করতে না দেয়া"[১৩০]। মানব সমাজে অনাচার অপরাধ ও গর্হিত কার্য-কলাপের ফলে প্রতিযোগিতা প্রতিদন্দ্বিতা, বিদ্বেষী মনোভাব বিদ্যমান, সাহিত্য সমাজেরও আলাদা বিচরণ ক্ষেত্র আছে। "সাহিত্য সমাজ মানুষের আর পাঁচ রকম সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নয়। এ সমাজেও দলাদলি আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, জয় পরাজয় আছে। ইংরেজরা বলে Fight is the salt of Existence. সাহিত্যের হাটে এ নুনের কারবার আমরা সবাই করি"[১৩১]।

(ক) অশ্লীলতা কি?

অশ্লীলতার ইংরেজী প্রতিশব্দ "Obscence". "এরিক পার্ট্রিজ দেখিয়েছেন ইংরেজী অবসিন ফরাসী ভাষা থেকে এসেছে, যার উৎস পাওয়া যায় ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন Obscaena অথবা Ceanum শব্দ দুটিকে পার্ট্রিজ Obscence শব্দের সম্ভবপর বুৎপত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটি Obscaena অর্থ Offstage, অর্থাৎ যা মঞ্চে দেখানোর যোগ্য নয়। দ্বিতীয়টি Ceanum এর অর্থ হল পাক কিংবা নোংরা"[১৩২]। "প্রাচীন গ্রীকদের মতে মঞ্চে উপস্থাপনের অযোগ্য ছিল হত্যা, আত্মহত্যা কিংবা যুদ্ধ। পক্ষান্তরে নগ্ন নারী পুরুষের দেহ প্রদর্শন ছিল বাঞ্ছিত ও স্বাভাবিক।"[১৩৩] কাব্য সাহিত্যকে অলঙ্কারিক রূপ দেয়ার জন্যই লেখক লেখিকারা শ্লীল-অশ্লীল বিষয়টি আমলে না এনে অশ্লীলতা দ্বারা সাহিত্য অঙ্গণ কে অনাচারে জড়িয়ে ফেলেছে।

---

১৩০. ফয়জুল লতিফ চৌধুরি, 'শিল্প সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা' পৃ. ১২।

১৩১. ফয়জুল লতিফ চৌধুরি, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯.

১৩২. Eric Partridge; A short Etymotagical Dictionary of Modern English. Rout ledge & kegon Paul London. 1966. p.98.

১৩৩. বুদ্ধদেব বসু, চরম চিকিৎসা, কবিতার শত্রুমিত্র ১৯৭৪, পৃ.৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিবাহ প্রথার সামাজিক অনাচারের ছাপ বিভিন্ন গ্রন্থে এমনভাবে ঢালাও প্রকাশ পেয়েছে যা অতি সহজে অনাগত বা আগামী সমাজে অনাচার বৃদ্ধির সহায়ক। "যে বিবাহ ব্যবস্থায় একজন নারী একাধিক পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। তিব্বতে পিগামীদের মধ্যে এবং আফ্রিকার কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। এক্সিমো ও উত্তর আমেরিকার শোশনিয়ানদের মধ্যে একটি ভিন্ন অর্থে বহুপতিত্ব দেখা যায়। এক্সিমোরা অতিথিদের আনন্দ দিয়ে থাকে নিজের স্ত্রীকে অতিথির সাথে শয্যা গ্রহন এর ব্যাবস্থা করে দিয়ে। শোশনিয়ানদের মধ্যে স্বামীরা শিকারে গেলে স্ত্রীর সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যৌন সংসর্গ করার সামাজিক অনুমোদন আছে। অজাচার বিবাহ প্রথা অর্থাৎ মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা ভাই বোনে যে বিবাহ। প্রাচীন মিশর ও পেরুর রাজবংশে এ প্রথা বিদ্যমান ছিল।"[১৩৪]

বর্তমান সমাজে চলমান শিল্পকর্ম উপন্যাস, কবিতা, সঙ্গীত, চলচ্ছিত্র, নাটক, নৃত্য, চিত্রকলার অধিকাংশই ব্যক্তিও সমাজ জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার দরুন অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে। সাহিত্য শিল্পকলার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ নতুন কোন ঘটনা নয়। যুগে যুগে এ অশ্লীলতা সামাজিক ক্ষেত্রে অনাচার প্রবনতা বৃদ্ধি করে আসছে। "চিত্রাঙ্গদা নামক রচনাটি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। এছাড়া "ঘাই হরিনীর' মত অশালীন শব্দ (ক্যাম্পে কবিতায়) লিখে জীবনানন্দ দাশ চাকুরিচ্যুত হয়েছিল। আমেরিকাতে যখন "ট্রপিক অব ক্যান্সার" প্রথম প্রকাশিত হয় তখন জনৈক সমালোচক মন্তব্য করে ছিলেন, এই লেখককে গুলি করে হত্যা করা হোক। বাংলাদেশে পঞ্চাশের দশকে "হেলেনের স্তন আর প্রানচোষা ঠোট" নোংরা পংক্তি লিখেই সামসুর রহমান প্রায় সমাজচ্যুত হয়ে ছিলেন। অথচ আজ টিভি, রেডিও সহ মহাসড়কের মোরে মোরে বিশালাকার সাইনবোর্ডে জন্ম বিরতি করণ পিল আর কনডমের নগ্ন বিজ্ঞাপন জনিত অশ্লীলতা কারো মনে রেখাপাত করেনা।"[১৩৫]

শিল্প সাহিত্যে যৌনতার প্রকাশ সাম্প্রতিক কোন ঘটনা নয়। বিশ্বের শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যৌনতার প্রকাশ আবহমান কাল থেকেই সাহিত্যাঙ্গন দখল করেছিলো কঠিন ভাবে। "বিবাহ বহির্ভূত যৌন উপাখ্যান সমৃদ্ধ মহাভারত যৌন চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ কালিদাসের মেঘদূত"। প্রাচীন ভারত থেকে যদি দৃষ্টি গ্রিক পুরানে নিক্ষেপ করা যায় তা' হলে পাওয়া যাবে দেবতাদের লাম্পট্য, সমকামিতা ও ধর্ষকামের অজস্র উত্তেজক ঘটনার সমৃদ্ধ ভান্ডার। যৌনতার প্রসঙ্গে পূর্ণ আরিস্টোফানিস-এর 'লিসিসট্রাটা'। মধ্যযুগেই শুধুমাত্র যৌনগন্ধী শিল্পকলার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

রেনেসাঁ যুগে অনেক বিষয়ের মতো যৌনবিষয়ক রচনারও পুনর্জাগরণ সম্পন্ন হয়। এ যুগের যৌন বিষয় সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ পগিও-র 'ফেসেটিয়া' রিবেলস-এর 'গারগারটুয়া (১৫৩৪) ও 'পানটাগ্রুয়েল' (১৫৩২), সেলিনি-র 'মেমোয়ার্স' , আরেটিনো-র 'রাগিওনামেনটি' (১৬০০), ব্রানটোসে-র 'ভিস ডেস ডামেস গ্যালানতেস' (১৬৬৫-৬৬) এবং বেরলদে দ্য বাভিলে-র 'ল্য সয়ান দ্য পাভেনিয়' (১৬১০)। রেনেসাঁর বিকাশের পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকলায় যৌনতার উপাদান প্রচুর। এলিজাবেথীয় যুগের পরবর্তী জেকোবিয় যুগের নাটক এবং বিশেষত কবিতা অশ্লীল শব্দাবলীতে পূর্ণ ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এ যুগের প্রতিনিধি কবি স্কেলটন এর নাম। এর পরবর্তী যুগসমূহের ইতিহাস হলো যৌন বিষয়ের প্রসারবৈচিত্র্যের বিকাশের ইতহাস। আধুনিক শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম চলচ্চিত্র, উপন্যাস, চিত্রকলায় যৌনতার ব্যাপক বিস্তারের উল্লেখ রয়েছে।[১৩৬]

---

১৩৪. J. Manchip White, teach yourself Anthropology; p. 137.

১৩৫. ফয়জুল লতিফ চৌধুরি, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২.

১৩৬. ফয়জুল লতিফ চৌধুরি, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭.

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক কালে সাহিত্যে অশ্লীলতার অভিযোগে যারা চরমভাবে অতিষ্ঠ তাদের মধ্যে D.H.lawrence অন্যতম সাহিত্যিক। লরেন্সের অলজ্য ভাষা, প্রাণস্পর্শ যৌনাচার উন্মোচনের অভিনব কৌশল সমাজ দেহের স্বাধীনতা ও শ্লীলতাকে ধ্বংস করেছে। সমাজ ধ্বংস কারক সাহিত্য পিপাষু নামধারী আধুনিক পাঠকেরা সস্তা, উশৃঙ্খল যৌনাচার বিস্তারের এ ধরনের সাহিত্যকে বর্তমান সময়ের মহৎ শিল্পকর্ম হিসেবে ঘোষণা দিয়ে থাকেন।[১৩৭]

সাহিত্যের অশ্লীলতা সম্পর্কে লরেন্স বলেছেন; "Pornography is the attempt to insult sex, to do dirt on it. This is unpardonable. Take him very lowest instance, the picture-postcard sold underhand, by the underworld, in most cities. What I have seen them have been of an ugliness to make you cry. The insult to the human body, the insult to a vetal human relationship! Ugly and cheap they make the human nudity, ugtly and degraded they make the sexual act, trivial and cheap and nasty."[১৩৮]

D.H. লরেন্স এর 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' বাংলায় অনুবাদ করছেন বিশিষ্ট বাংলা ভাষাবিদ, প্রখ্যাত অনুবাদক সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ। তিনি তার বই এর ভূমিকাতেই লিখেছিলেন,

"বিশ্বসাহিত্যে আজ পর্যন্ত যত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভারে'র মত আর কোন উপন্যাস অশ্লীলতার পঙ্কতিলকে এমনভাবে পরিচিহ্নিত হয়নি। এক অন্তহীন বিতর্কের প্রবলতম ঝড়ের প্রহারে এমন করে জর্জরিত হয়নি আর কোন উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগের মূল কথা হলো এই যে লেখক এখানে নর-নারীর যৌনক্রিয়া ও কামকলা নৈপূণ্যের যে নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার ও চরিত্র-চিত্রনের সঙ্গে তার কোন প্রকরণগত সম্পর্ক নেই। যে যৌনসম্পর্ক কামনায় অত্যুগ্র, নিবিড়তায় সতত উত্তপ্ত, এক অন্তহীন তৃপ্তি লাভের চিরচঞ্চল লালসায় পঙ্কিল সে সম্পর্কের এমন বিচিত্র প্রকাশকলায় চিত্রিত করার কি প্রয়োজন ছিল এখানে?"[১৩৯]

এভাবে প্রাচীন, মধ্য এমনকি আধুনিক যুগের সাহিত্য, কাব্য-কবিতায় অশ্লীলতার বাধাহীন সমাহার সামাজিক 'অনাচার' বৃদ্ধিতে প্রায় সর্বস্তরের জনতাকে উৎসাহিত করে আসছে।

(খ) বাংলাদেশের অসুস্থ চলচ্চিত্রের করুণ অবস্থা

বাংলাদেশে অনেকগুলো বিনোদনের মধ্যে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমানে মানুষের ঘরে ঘরে ডিস এন্টেনা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আকাশ সংস্কৃতি পৌছে গেলেও এদেশের গ্রাম-শহর সব জায়গায় সাধারণ মানুষের কাছে, সব শ্রেণীর দর্শকের কাছে চলচ্চিত্র এখন ব্যাপক গ্রহণযোগ্য একটি গণমাধ্যম।

---

১৩৭. 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার নিয়ে মামলা' । প্রকাশক খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৬। পৃ.২৯

১৩৮. 'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার নিয়ে মামলা' প্রাগুক্ত পৃ. ৩০

১৩৯. ফয়জুল লতিফ চৌধুরি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বর্তমানকালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র নির্মাতারা এ শিল্পের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে বাণিজ্যিক দিকটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন বেশি। ফলে দর্শকের চাহিদার প্রেক্ষিতেই তারা চলচ্চিত্র গুলোতে যুক্ত করছেন সস্তা বিনোদন, অশ্লীল দৃশ্য, অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, অবিশ্বাস্য সব সংঘাতসহ বিভিন্ন অনাচারমূলক দৃশ্য। চলচ্চিত্র গুলোতে দেখানো হচ্ছে সামাজিক অনাচার সৃষ্টির নতুন নতুন সব পদ্ধতি, যেগুলো দেখে যুবক দর্শকরা সহজেই সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলোর অনুশীলনও তারা করছে। ফলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সামাজিক অনাচার এদেশে নবদিগন্তের সূচনা করছে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও চলচ্চিত্রে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনসহ বিভিন্ন অনাচার নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাদা করে কাজ বা লেখা লেখির পরিমান খুব কম। তাই একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের বর্তমান ধারায় কি পরিমাণে এবং কি ধরনের অনাচারমূলক কর্মকান্ড প্রদর্শিত হচ্ছে এবং প্রদর্শিত অনাচারগুলো বাংলাদেশের যুবসমাজের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে তা জানা আবশ্যক।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে যে সমস্ত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে তার ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে চলচ্চিত্রের ফ্রেম থেকে বিদায় নিতে থাকে দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা, জীবন ও মৌলিকত্ব। গ্রাস করে উদ্ভট, কাল্পনিক সংস্কৃতি, অশ্লীলতা, সন্ত্রাস ও হিংস্রতা। বর্তমান কালে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রে এগুলোর দাপট আরও ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মফস্বল শহরের রাস্তা দিয়ে হাটলে হঠাৎ কানে ভেসে আসে বীভৎস কিছু গালি-গালাজ, খিস্তি খেউর। থমকে পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় কোন ঝগড়া বিবাদ নয়, রিকশা বা ভ্যানে বাংলাদেশী সিনেমার পোষ্টার লাগিয়ে তার প্রচারণা চলছে। অবাক হবার কিছু নেই, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এখন এ ধরনের নোংড়া, বীভৎস, কুরুচিপূর্ণ ও শ্রবণ অযোগ্য গালি-গালাজপূর্ণ সংলাপগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে।[১৪০]

আদরের ছোট্ট ছেলেটির জন্য চকলেট না নিয়ে বাসায় ফিরলে সন্তানের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায় নতুন নতুন শব্দ, চকলেট আননি কেন, জবাই করে ফেলব, ভুড়ি নামিয়ে দেব ইত্যাদি। না এটি সিনেমার মতো কাল্পনিক কোন কাহিনী নয়। গবেষণার অংশ হিসেবে দলীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী বরিশালের একজন ছবির দর্শকের কাহিনী এটা, যিনি একদিন তার ছোট্ট ভাইপোকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেই সিনেমায় মানুষের শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবার একটি দৃশ্য ছিল, সিনেমা দেখার পরে বেশ কিছুদিন শিশুটি কিছু হলেই শুধু বলেছে কল্লা নামাইয়া দিমু (মাথা কেটে ফেলব)[১৪১]

ছোট বোনকে নিয়ে রাস্তায় বেড়োলে হঠাৎ রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে ৬-৭ জন আড্ডারত যুবক মন্তব্য করে বসে। ঐ দেখ---। অতিসহজে বাক্যগুলো হজম করে ধরে নিতে হবে এটি পাশের প্রেক্ষাগৃহে যে সিনেমাটি চলছে তার ভিলেনের উক্তি, যা উঠতি বয়সের যুবকরা ঐ সিনেমা দেখে রপ্ত করেছে।

---

১৪০. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০৪, প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃ.-১০

১৪১. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০৪' প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃ.-১০

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার পাতায় প্রায়ই যে খবরগুলো দেখা যায়, যেন ফিল্মি কায়দায় ডাকাতি, সিনেমা স্টাইলে খুন, ছিনতাই এসব মুলত আমাদের দেশীয় সিনেমার বর্তমান ধারা থেকেই প্রভাবিত হয়েছে।[১৪২]

এমন একটা সময় ছিল যখন সিনেমার পোষ্টার দেখেই দর্শকরা উদ্বুদ্ধ হতেন হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখার জন্য। কিন্তু বর্তমান কালের সিনেমার পোষ্টার দেখেই সচেতন ও রুচিশীল দর্শকরা সিনেমা বিমুখ হতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে প্রতিটি সিনেমার পোস্টারেই দেখা যায় নায়িকার অর্ধনগ্ন বৃষ্টিভেজা শরীর, খলনায়ক ও নায়কের ক্ষতবিক্ষত শরীর, বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি। বর্তমানকালে কেবল মাত্র লোক কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো ছাড়া এমন একটি সিনেমার পোস্টার খুঁজে পাওয়া যাবে না যেগুলোতে ব্যবহৃত হয়নি নায়ক খলনায়কের রক্তমাখা শরীর, চাকু, তলোয়ার, আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন সহিংসতার চিত্র। আর এগুলো দেখে সিনেমার ভেতরের সহিংসতাগুলো সহজেই অনুমান করা যায়।[১৪৩]

বর্তমানকালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উদ্ভট, অবাস্তব ও অলৌকিক কাহিনীর সিনেমা, স্থুলতা, রুচিহীনতা, অশ্লীলতা, দাপটের সাথে বিরাজ করছে। নির্মাতারা বন্দী হয়ে আছেন প্রায় একই বৃত্তে। তথাকথিত বিনোদনের রাসায়নিক ফর্মূলা অনুযায়ী নির্মাতারা হন্যে হয়ে ছুটেছেন মোক্ষম বিষয়ের পেছনে। এজন্যে তারা নির্লজ্জভাবে হুবহু নকল করেছেন বিদেশী ছবির নাচ, গান, সুর, অভিনয় এমনকি সাজ পোশাকও। তারা দর্শক মনোরঞ্জনের নামে জুড়ে দিচ্ছেন অশ্লীল যৌন উত্তেজক নাচ, গান। সংযোজন করছেন সাপ, ব্যাঙ, দৈত্য-দানব, জ্বীন-পরী, তন্ত্র-মন্ত্র, অস্ত্রবাজি-বোমাবাজি-মারপিট। ছবির নামটি বাদ দিয়ে মনে হয় ঘুরে-ফিরে সেই একই কাহিনী, একই দৃশ্য। দর্শকেরাও জানেন খলনায়করা সিনেমায় ভন্ডামি, ষড়যন্ত্র করবেন এবং শেষ পর্যন্ত নায়কের কাছে পরাজিত হবেন।[১৪৪]

চলচ্চিত্র অনাচার সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা যায় কিছু কিছু প্রযোজক, পরিচালকের ব্যবসায়ী মনোভাব সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাবের কারনে চলচ্চিত্রকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছে। এবং তাদের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। মূলতঃ চলচ্চিত্র নির্মানে নীতিমালা অনুসরণ না করা, সেন্সর বোর্ডের অবহেলার সুযোগ ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ব্যবসায়িক মানসিকতার কারনে চলচ্চিত্রে সামাজিক অনাচার মূলক দৃশ্যাবলীর ব্যপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটেছে। পাশাপাশি যুবসমাজে পর্যাপ্ত বিনোদনের অভাব, নৈতিক অধোপতন, অভিভাবকদের অসচেতনতা, সমাজের অনাচারমূলক কর্মকান্ড এদেশের যুব সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষকে অনাচারে লিপ্ত হওয়ার নতুন নতুন কৌশল শেখাচ্ছে।

আমি বলব, ইরান দেশের সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বর্তমান বিশ্বে সুস্থ সংস্কৃতির জনক। ইরান শ্লীল সাহিত্য, মার্জিত চলচ্চিত্রের দিক থেকে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা আমাদের অনুস্মরণ করা উচিত।

---

১৪২. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০৪' প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃ.-১০-১১

১৪৩. সৌমেন দাস, 'চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ' প্রকাশকাল জুলাই ২০০৪' প্রকাশনা ম্যাস লাইন মিডিয়পা সেন্টার। পৃ.-১১

১৪৪. দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার বিনোদন পাতা, ১২ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

'সামাজিক অনাচার' সম্পর্কিত ইসলামী দন্ডবিধি ও বিচার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধজনিত কার্যক্রম, অশোভনীয় ও গর্হিত আচরণ সমাজের সর্বস্তরের জনতার নীতিভ্রষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়বস্তুর অর্ন্তভুক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজে সংঘটিত সকল অপরাধ অনাচার এর বিরুদ্ধে আইন প্রনয়ণ ও দন্ডাদেশ প্রদানের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকলেও আন্তর্জাতিক অনাচারের খতিয়ানে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক প্রশস্ত এবং ব্যাপক। এদেশের অন্যায় অবিচার ও অনাচারের ইতিহাস খুবই প্রাচীন, তেমনি এগুলি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারেও যুগে যুগে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সুশীল সমাজ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ শাস্তি বিধান ও বিচার ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। মানব রচিত এই বিচার পদ্ধতি, দন্ডাদেশ যথার্ত ও ফলপ্রসূ নহে। মানবতার অন্যতম গাইড বুক, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের দন্ডবিধি ও বিচারব্যবস্থা মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে সফল ভাবেই বলবৎ ছিল, বর্তমানে আছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কাজেই সমস্যা ও সমাধান, অনাচার ও সুবিচার পরস্পর সমান্তরাল গতিতে সমাজে চলমান থাকে। অনাচারের গতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে ইসলামের বিধান ও বিচার ব্যবস্থার গবেষণামূলক প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ- অনুকরণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অনাচার দমনে ইসলামী দন্ডবিধি

আরব সমাজে যখন ইসলাম প্রচার শুরু হয়, তখন যিনা ব্যভিচার এর চিত্র ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত। সেদিকে লক্ষ্য রেখে হঠাৎ করে তার শাস্তি বিধিবদ্ধ হওয়ার নীতি অবলম্বিত হয়নি। তা ক্রমশ ও পর্যায় ক্রমে বিধিবদ্ধ হয়েছে, যেন সমাজকে সংশোধন করার কাজ সফল হতে পারে, জনগণের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ হয়। এ কারনে এ পর্যায়ের সর্ব প্রথম যে বিধান নাযিল হয়, তা হচ্ছে সুরা আন-নিসা'র এই আয়াত-

"তোমাদের যেসব স্ত্রীলোক নির্লজ্জতার কাজ (যিনা) করবে, তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী পেশ কর। তারা সে কাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ, যতক্ষণ না-মৃত্যু তাদের জীবন সাঙ্গ করে অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন উপায় বের করেন।"[১]

"আর তোমাদের যে দুইজন পুরুষ-নারী এই নির্লজ্জতার কাজ করে, তাদের কষ্ট দাও। তবে যদি তারা তওবা করেও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তা'হলে তাদের আর কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহ্ তো নিঃসন্দেহে তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়াবান"[২]।

এ আয়াত অনুযায়ী প্রথম দিকে বিবাহিতের যিনার শাস্তি ছিল কয়েদ। আর অবিবাহিতের ছিল কথা ও ভীতির সাহায্যে কষ্টদান।

যে নারী বা পুরুষ বিবাহিত নয়, সে যদি যেনা করে, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে একশ'টি দোররা । কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

"ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারী-এদের প্রত্যেককে একশ'টি করে দোররা"।[৩]

-এ বিষয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই, এ ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ন একমত ।

---

১. আল কুরআন, সুরা আন নিসা, আয়াত নং-১৫।

২. আল কুরআন, সুরা আন নিসা, আয়াত নং-১৬।

৩. ইমাম আবু হায়ান লিখেছেন 'আঝঝানিয়াতু' 'অঝঝানি' এই শব্দদ্বয়ের শুরুতে আলিফ ও লাম রয়েছে তা নির্দিষ্টকারী যদিও এই দু'টি অক্ষর সাধারণত অনির্দিষ্টকারী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তিনি লিখেছেনঃ এখানে এই আলিফ ও লাম অক্ষর দুইটি নির্দিষ্টকারীরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ বর্ণিত শাস্তিটা শুধু দুই অবিবাহিতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিবাহিতের ক্ষেত্রে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যভিচারী পুরুষ হোক কি নারী, একশ'টি দোররা মারার পর-ও তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। তা করা ওয়াজিব। জমহুর আলিমগণ এই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ। তারা তাদের এই মতের সমর্থনে তিনটি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম হচ্ছে হযরত উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

"তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ওদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অবিবাহিত-অবিবাহিতার যিনার একশ' দোররা এবং এক বছরের নির্বাসন দন্ড দিতে হবে"[৪]।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও যায়দ ইবনে খালিদ (রাঃ) বলেছেন, এক বেদুইন রাসুলে করীম (সঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। তখন অপর পক্ষ বলে উঠল, আপনি আমাদের দুইজনের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ঘটনা বলার অনুমতি দিন। রাসুলে করীম (সঃ) বললেন হ্যা, বল। তখন সে বলল আমার পুত্র এই ব্যক্তির ঘরে মজুর হিসেবে কাজে নিয়োজিত ছিল। পরে সে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত যিনা করেছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, এই অপরাধের দরুণ আমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে রজম'। তখন আমি এই শাস্তির বিনিময়ে এই লোকটিকে একশ'টি ছাগল ও একটি বাচ্চা দিয়েছি। পরে আমি শরীয়ত বিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের শাস্তির একশ'টি দোররা ও এক বছরের নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম এর শাস্তি।

এই কথা শ্রবণের পর নবী করীম (সঃ) বললেন হ্যা, আল্লাহর কসম-যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমাদের দুই জনের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করব। তোমার ছাগল ও বাচ্চা তোমাকে ফেরত দেয়া হলো । তোমার পুত্রের শাস্তি হচ্ছে একশ'টি দোররা ও এক বছর কালের জন্য নির্বাসন। আর হে উনাইস, তুমি কাল সকালেই এই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যিনার অপরাধ করলে তাকে রজম করবে।

স্ত্রীলোকটি অপরাধ স্বীকার করলে রাসুলে করীম (সঃ) তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। পরে তাকে রজম করা হলো।[৫]

এই হাদীসদ্বয় থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দোররার পরও এক বছর কালের নির্বাসন দেয়া তখনকার সমাজে সর্বজনবিদিত শাস্তি ছিল এবং রাসুলে করীম (সঃ) এর নিজের বিচারেও তা ছিল অবিবাহিতের যিনার শাস্তির অংশ।

---

৪. মুসলিম, তিরমিযী, জামিউল উসূল.

৫. হাদীসটি প্রায় সব কয়খানি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, জামিউল উসূল, পৃ.৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) দোররা মারার সাথে সাথে মদীনা থেকে সিরিয়ায় নির্বাসনের দন্ডও দিয়েছেন। কখনও কখনও অপরাধীকে দোররা মেরে ফিদাক এর দিকেও নির্বাসিত করছেন।

অতএব এসব হাদীসের আলোকে বলা হয়, শুধু দোররাই নয় সেই সাথে নির্বাসনের দন্ডও কার্যকর করতে হবে অবিবাহিত যিনাকারীর উপর।

দোররার সাথে নির্বাসনের দন্ড দিতে হবে কেবল পুরুষ যিনাকারীকে, স্ত্রীলোককে নয়। ইমাম মালিক ও ইমাম আওযাঈ এই মত দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে স্ত্রীলোককে বিদেশে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোথায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন প্রশ্ন বা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। আর শরীয়তের বিধান মতে নির্বাসন দেয়া হলে একজন মুহরীম পুরুষ তার সঙ্গে দিতে হবে। তা না হলে কোন অ-মুহরীম পুরুষের সঙ্গেই তাকে পাঠাতে হবে। তাকে একাকিনী পাঠানোর তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

আর অ-মুহরীম পুরুষের সঙ্গে নির্বাসন করা হলে সে স্ত্রীলোকটিকে তো চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলে দেয়া হবে, কার্যত তাকে ধ্বংসই করা হবে। আর কোন মুহরীম পুরুষকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে অপরাধী নয় এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী।

যদি কাউকে এভাবে অকারনে শাস্তি প্রদান করা হয় মজুরী বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তা'হলেও তা হবে একটা দায়িত্ব চাপানো, যার সমর্থনে শরীয়তের কোন ভূমিকা নেই। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হাদীস সমূহ থেকে জানা যায় যে, বিদেশে নির্বাসনের দন্ড কেবলমাত্র পুরুষকেই দেয়া যেতে পারে, কোন মেয়েলোককে নয়।

নির্বাসনের দন্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বিচারক যদি তা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তা দিতে সমস্যা নেই। এবস্থায় নির্বাসনটা হতে হবে তাযীরী, কোন হদ্দ নয় এর ব্যতিক্রম জায়েয নয়।

বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য একটি মাত্র দন্ড, আর তা হচ্ছে 'রজম'। এ বিষয়ে সকলেই একমত। এ ছাড়া তাকে দোররার শাস্তি দেয়া হবে না। কেননা বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম ছাড়াও দোররা শাস্তি অতিরিক্ত দেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। ইমাম আবু হানীফা, কাযী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এই মত। ইসলামী আইনে ধর্ষণকারী যেনার শাস্তি ভোগ করবে এবং যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে সে শাস্তিযোগ্য হবে না যদি এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়। আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে নির্দোষী পক্ষ ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।[৬]

---

৬. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৫ইং) খ. ১, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় নারীদেরকে যিনায় বাধ্য করতে নিষেধ করে দিয়েছে এবং কোন নারীকে এরূপ কাজে বাধ্য করা হলে উক্ত নারীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে । এরশাদ হচ্ছে- তোমাদের দাসীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭]

মহানবী (সাঃ) এর সময়ে এক মহিলা অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য বের হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলে এবং জোরপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। মহিলার চিৎকারে চারিদিক থেকে লোকজন জড়ো হয় এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলে। মহানবী (সাঃ) ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে বললেন তুমি চলে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৮]

একটি ক্রীতদাস একটি ক্রীতদাসকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করলে হযরত উমর (রাঃ) ক্রীতদাসের উপর হদ্দ জারি করেন। কিন্তু ক্রীত দাসীকে শাস্তি দেননি। কারণ তাকে জোরপূর্ব ধর্ষণ করা হয়েছিল। সহীহ বুখারী শরীফে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।[৯]

মাদকাসক্তের শাস্তি ও পরিণাম

মদপান ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পাপ এবং ফৌজদারী দন্ড হিসেবে গণ্য। এজন্য শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তিদান একান্তই কর্তব্য। কিন্তু আল-কুরআনে এর কোন শাস্তি উল্লেখ নেই। হাদীস শরীফেও কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই। ইহা অবস্থাভেদে সামান্য ভর্ৎসনা হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। হযরত হযরত উমর (রাঃ)-এর রাজত্বকালে মদপানের শাস্তি ৪০ হতে ৮০ বেত্রাঘাত পর্যন্ত ছিল। এ শাস্তি দিতে হলে দু'জন স্বাক্ষী বা স্বীয় স্বীকারোক্তি দরকার। মদপানের শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে কয়েকখানা হাদীস তুলে ধরা হল-

- ❖ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- নবী করীম (সাঃ) মদ পানের জন্য লাঠি এবং জুতা দ্বারা প্রহার করতেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ৪০ বেত দিতেন" অন্য বর্ণনায় মহানবী (সাঃ) মদ পানের জন্য লাঠি এবং জুতা দ্বারা প্রহারসহ ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন।[১০]

- ❖ হযরত যাবির ইব্ন ইয়াজিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত "রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)- এর খিলাফতের শুরুতে মদ্যপায়ীকে আমরা ধরে আনতাম। অতঃপর তাকে আমাদের হাত দিয়ে, আমাদের জুতা দিয়ে ও আমাদের চাদর দিয়ে মারতাম । হযরত উমর (রাঃ)- এর শাসনামলের শেষদিকে ৪০টি দোররা মারা হত। এমনকি যদি তারা অবাধ্যতা দেখাত ও সীমালঙ্ঘন করে যেত, তা হলে ৮০টি দোররা মারা হত।[১১]

---

৭. আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪ঃ৩৩।
৮. তিরমিযী, কিতাবুল হুদুদ,হাদীস নং -১২৭৩।
৯. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ, হাদীস নং ৮৪৩।
১০. বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ৬২৭৫।
১১. সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং-৩৮৯০।

Dhaka University Institutional Repository

❖ হযরত যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি সে চতুর্থবার ইহা পান করে, তাকে হত্য কর।"[১২]

❖ হযরত ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত- মহানবী (সাঃ) বলেছেন- প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই মদ এবং প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে মদ পান করে এবং তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, সে পরকালে পানীয় পান করতে পারবে না।"[১৩]

❖ মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম-মদখোর, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এবং অসতর্ক গৃহস্বামী, যে তার পরিবারের ভিতরে অশ্লীলতা স্থাপন করে।[১৪]

❖ মহানবী (সাঃ) বলেছেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্তহয়, তখন তার ঈমান থাকেনা। চোর যখন চুরি করে, তখন তার ঈমান থাকেনা, আর মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে, তখন তার ঈমান থাকে না।[১৫]

❖ একবার মদ পান করলে ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন না।[১৬]

চুরির শাস্তি

চুরির শাস্তি হচ্ছে ডান হাত কাটা- যেমন পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ও অকাট্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলের সুন্নাত এবং সকল ফিকাহবিদ ইমামের ঐকমত্য থেকেই তা-ই প্রমাণিত। নবী করিম (সঃ) বলেছেন- 'এক দীনার' এর এক-চতুর্থাংশ বা তার উর্ধ্ব পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে তার শাস্তি স্বরূপ হাত কাটা যাবে। তিনি আরও বলেছেন

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে এ জন্য যে, তাদের সমাজের ভদ্রব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত, আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। মোট কথা চোরের হাত কাটা দন্ড সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম উম্মতই সম্পূর্ণ একমত। এ হচ্ছে প্রথমবারে চুরি করার অপরাধের শাস্তি। দ্বিতীয়বারে চুরি করলে তার বাম পা কেটে ফেলতে হবে। আর তৃতীয় বারে চুরি করলে কি শাস্তি দেয়া হবে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীন থেকে সে বিষয়ে দুইটি মত পাওয়া গেছে।

---

১২. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং-১৩৬৪।
১৩. সহীহু লি মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৩৭৩৩।
১৪. সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস নং-৫৫৭৭।
১৫. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাজালেম ওয়াল গসব, হাদীস নং- ২২৯৫।
১৬. সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল আশারিবা, হাদিস নং-৫৫৭০।

Dhaka University Institutional Repository

একটি মত হচ্ছে, তৃতীয় বারের চুরির শাস্তি স্বরূপ তার বাম হাত কাটার পরে কাটা হবে ডান পা। আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে, দ্বিতীয়বারের পরবর্তী চুরিতে তাকে আটক করে রাখতে হবে। তবে সেজন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে, যেগুলির অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরই সে দন্ড কার্যকর করা যেতে পারে।

তবে সেই শর্তগুলির মধ্যে কয়েকটির ব্যপারে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে এবং কয়েকটির ব্যপারে রয়েছে মতপার্থক্য।

এই শর্তগুলির একটি হচ্ছে, চোরকে 'পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ও শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার যোগ্য হতে হবে। চুরিকৃত মাল-সম্পদের কারুর মালিকানাধীন সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় চুরি হতে হবে। আর চুরিকৃত ধন-মালের মূল্য পরিমাণ হতে হবে তিন দিরহাম কিংবা এক দীনারের এক-তৃতীয়াংশ বা তদূর্দ্ধ। এইসব কয়েকটি শর্ত একসাথে পূর্ণ না হলে 'হদ্দ' দন্ড জারী হতে পারবে না। তখন 'তা'যীর' হিসেবে শাস্তি নির্ধারনের প্রয়োজন হবে।

যেসব লোক সশস্ত্র হয়ে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাড়িতে, নদীতে-মরুভূমিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যভাবে জনগণের সম্মুখে জনগনের ধন-মাল হরণ করে নিয়ে যায়, কুরআন মজীদের আয়াতে তাদেরই বলা হয়েছে 'মুহারীবুন'।

যেসব লোক শহর-নগর-গ্রাম-জনপদের মধ্যে সশস্ত্র লুন্ঠন করে, তাদের 'মুহারিব' বলা যায়, কি যায় না, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-এর মতে এরা 'মুহারীব' নয়। তারা 'গচ্ছিত ধন অপহরণকারী বা আত্মসাতকারীর মত। কেননা যারা জনপদের অধিবাসী, তারা আক্রমণকালে প্রায়শই চিৎকার করতে পারে। চিৎকার শুনে খুব কাছাকাছি থেকে জনগণ এসে জড় হতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবে হামলাকারীদের দাপট খতম হয়ে যায়।

কিন্তু জমহুর আলেমগণ মনে করেন, জনপদ ও নদী-ভূমির নির্জন স্থানের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য কিছুই নেই। কেননা কুরআনের আয়াত সকল প্রকারের 'মুহারীব'-সশস্ত্র আক্রমনকারীকেই শামিল করেছে। দ্বিতীয়তঃ জনপদের মধ্যে এ ধরনের আক্রমন অধিক ভয়ের কারণ ও বেশি ক্ষতিকর দেখা দিতে পারে। কেননা জনপদ হচ্ছে শান্তি-নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার ক্ষেত্র। লোকদের সাহায্য সহযোগিতা চাওয়ার ও পাওয়ার পরিবেশ বিরাজমান। এরূপ স্থলে সশস্ত্র আক্রমন ব্যাপক প্রস্তুতিসহ এবং তীব্র ও প্রচন্ড হওয়াই স্বাভাবিক।

উপরন্তু তারা লোকদের ঘরে বা দোকানে আক্রমণ চালিয়ে যথাসর্বস্ব অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু নদীতে মরুভূমির নির্জন পরিবেশে আক্রমণ খুব প্রচন্ড হয় না, আর সর্বস্ব হারাবার ও ভয় থাকেনা। কেননা তথায় লোকেরা পথযাত্রী। আর পথযাত্রী অবস্থায় তার সাথে খুব সামান্য সম্পদ থাকাই কল্পনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়াতে 'ডাকাত' বা 'সশস্ত্র' আক্রমণকারীর জন্য চার পর্যায়ের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা হচ্ছে, হত্যা বা শূলবিদ্ধকরণ অথবা হাত ও পা বিপরীত পরস্পরায় কেটে ফেলা, কিংবা দেশ থেকে চির নির্বাসন।

এই পর্যায়ের মূল দলীল হচ্ছে এই আয়াত

যেসব লোক আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরূদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, এবং পৃথিবী- জনসমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা ও তৎপরতা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে- তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত বা পা বিপরীত পরস্পরায় কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই লাঞ্চনা ও অপমান তো তাদের জন্য এই দুনিয়ায়। আর পরকালে তাদের জন্য তা থেকেও অনেক বড় শাস্তি রয়েছে। [১৭]

আয়াতে চার প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছে সেসব লোকের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আয়াতে যে চারটি শাস্তির উল্লেখ হয়েছে, তা অপরাধ অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে, তা এই যে কোন একটা প্রয়োগ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, এই বিষয়ে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। জমহুর আলিমগণ মনে করেন, অপরাধ অনুপাতে এই শাস্তিসমুহের কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে। যে হত্যা করল, ধন-মাল অপহরণ করল, কিন্তু হত্যাকান্ড ঘটালো না, তার ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে। যে লোক হত্যাকান্ড ঘটালো ও ধন-মালও অপহরণ করলো, তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে, যেন সব লোক ভালোভাবে জানতে পারে। আর যে লোক শুধু ভয় প্রদর্শন করলো, কিন্তু হত্যা বা ধন-মাল অপহরণের কিছুই করল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে। [১৮]

কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান এ চারটি শাস্তির যে কোন একটি এই পর্যায়ের যে কোন অনাচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। তা নির্ণীত হবে কৃত অনাচারের মাপকাঠির দৃষ্টিতে। ইমাম মালেক (রহঃ) রায় দিয়েছেন, যে হত্যা করেছে, শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যাই করতে হবে। তার হাত-পা কাটা চলবে না, নির্বাসিতও করা যাবে না।

তবে তাকে হত্যা করা ও শূলে চড়ানোর মধ্যে কোন একটি করার এখতিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের রয়েছে। আর যদি শুধু ধন-মাল অপহরণ করে, হত্যা না করে, তাহলে তাকে নির্বাসিত করার এখতিয়ার নেই। তখন উক্ত চারটি দন্ডের মধ্যে যে কোন একটি প্রয়োগ করার এখতিয়ার থাকবে। তবে যদি শুধু ভয় প্রদর্শনের কাজ করে তাহলে তাকে হত্যা করা বা শূলবিদ্ধ করা; কিংবা হাত-পা কাটা বা নির্বাসিত করা-এর যেকোন একটি করার এখতিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের থাকবে। এই এখতিয়ার থাকার তাৎপর্য হচ্ছে, এই পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধান (আইন পরিষদ)- কে ইজতিহাদ করতে হবে।।

---

১৭. আল কুরআন সূরা মায়িদা আয়াত নং ৩৩।

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৫১-২৫২

Dhaka University Institutional Repository

'ডাকাত' ব্যক্তি যদি বিবেক-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনাযোগ্য সম্পন্ন হয়, তাহলে ইজতিহাদের লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দু হবে তাকে হত্যা করা কিংবা শূলবিদ্ধ করা। কেননা তার হাত ও পা কাটা হলে তার ক্ষতি নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আর লোকটি যদি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন না হয়, দৈহিক সু-স্বাস্থ্য ও শক্তি সম্পন্ন হয়, তাহলে বিপরীত পরম্পরায় তার হাত ও পা কাটা হবে। আর এই দুইটি বিশেষত্ত্বের কোন একটিও তার না থাকলে তার জন্য হালকা শাস্তি নির্ধারণ করা চলবে। যেমন- মারধর ও নির্বাসন।[১৯] আসলে আয়াতটি বর্ণনা পদ্ধতির কারণেই এই মত পার্থক্য। কাজেই ও পর্যায়ে ইজতিহাদ করার অবকাশ চিরন্তন।

আইন কার্যকরকরণ ও বিচার পদ্ধতি

জীবনে যে অনাচারই সংঘটিত হোক, তার প্রতিবিধান ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ত করেছে। কিভাবে কখন সেই প্রতিবিধান কার্যকর করতে হবে তা-ও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। অনাচার প্রমাণের উপায় ও পন্থা কি হতে পারে, সে বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের বক্তব্য সু-স্পষ্ট। এসব ব্যাপার লোকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং অনাচার প্রমাণের ব্যাপারটি কয়েকটি বিষয় ও আলামতের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। অতএব একজনকে অনাচারকারী হওয়ার ফয়সালা দেওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন তার অনাচার প্রমানের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস আয়ত্ত ও উপস্থাপিত হবে এবং সেসবের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, সে বাস্তবিকই অনাচারে জড়িত হয়েছে। কুরআন মজীদে এইসবের মূলনীতি বিবৃত এবং রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নত তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে।

এই পর্যায়ের আলোচনায় প্রথম বক্তব্য এই যে, অনাচার প্রমানের জন্য প্রয়োজন অকাট্য দলীল ও প্রমাণ। "নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন- লোকেরা যা দাবী করে তা-ই যদি তাদেরকে দেওয়া হতো, তাহলে লোকেরা নিশ্চয়ই অন্য লোকদের রক্ত ও ধন-মালের দাবি করে বসত। তাই যার যার উপর দাবি করা হয়েছে কিরা করার সুযোগ তাকে দিতে হবে"। [২০]।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বুখারী মুসলিম উভয়ই উদ্ধৃত করেছেন অপর একটি হাদীস। তার ভাষা হচ্ছে-

বিবাদীর কিরা-কসমের ভিত্তিতেও রাসূলে করীম (সাঃ) ফয়সালা ও বিচার করেছেন। বাদীর নিকট যদি কোন প্রমাণ না থাকে তার দাবির পক্ষে, তা'হলে বিবাদী বা অভিযুক্তকে নির্দোষিতার হলফ করে মুক্তি ও নিস্কৃতি দিতে হবে।

---

১৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২৪৪।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আল-বায়্যিনাহ' শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট প্রমান এবং এমন নিদর্শন বা চিহ্ন, যা লক্ষ্যের দিকে পথ নির্দেশ করে ও জানিয়ে দেয় যে, এটাই হচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছার পথ। তা যেমন বিবেক-বুদ্ধিসম্মত হতে পারে, অথবা হতে পারে অনুভবযোগ্য কিছু। এর নাম 'বায়্যিনাহ্' রাখার কারণ হচ্ছে, তা লক্ষ্য উদঘাটন ও প্রকাশ করে।

ফিকাহ্‌র দার্শনিকদের মত হচ্ছে- যাই-ই প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ ও প্রকট করবে, তা-ই 'বায়্যিনাহ্'। সত্যের এই প্রকাশ স্বরুপ হোক, লক্ষণাদির দ্বারা হোক, সাক্ষ্য-প্রমানের দ্বারা হোক, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হোক, কিংবা হোক কিরা-কসমের সাহায্যে, তাতে কোন পার্থক্য নেই। তা সবই 'বায়্যিনাহ্'।

এই 'বায়্যিনাহ্' বা অকাট্য প্রমাণ কখনও হতে পারে সাক্ষ্য, কখনও অভিযুক্তের স্বীকারোক্তিও হতে পারে। আবার কখনও বাদী অভিযোগকারীর কিরা-কসম এবং কখন অভিযুক্তের নিজের সাক্ষ্য হতে পারে'- যেমন স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার 'লেয়ান'। অবস্থার লক্ষণাদি এবং পরিস্থিতির রূপ দ্বারাও অনাচারের সহিত অভিযুক্তের সম্পর্ক বোঝা যেতে পারে। 'শাহাদাত' বা সাক্ষ্য বলতে বুঝায়, সাক্ষী যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছে, নিজ চোখে দেখতে পেয়েছে অথবা জানতে পেরেছে তার তা জানিয়ে দেয়া। এই সাক্ষ্য বলিষ্ঠ ও যথেষ্ট মাত্রার হলে দাবির বিষয়টি প্রমানিত হতে পারে। যেমন (দুই পক্ষের কোন একজনের স্বীকৃতি-স্বীকারোক্তি। সে যা করেছে সে বিষয়ে অথবা যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে, সেই বিষয়ে জানিয়ে দেয়া- তা সত্য কি অসত্য স্বীকারোক্তির সময়ের পূর্ববর্তী ব্যাপার প্রকাশ করা, তার অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়া।

'আল-য়ামীন' অর্থ হলফ বা শপথ করা, কিরা-কসম খাওয়া। 'য়ামীন' নাম রাখা হয়েছে এজন্য যে, দুইজন পরস্পর বিরোধী ব্যক্তির একজন তার ডান হাত অপরজনের ডান হাতের উপর লাগিয়ে তালি দিয়ে থাকে।

লক্ষণ বলতে চিহ্ন বা নিদর্শন বোঝায়, যা অভিযোগকারী বা বাদীর গোটা ব্যাপারের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে, তার দ্বারা বোঝা যায় প্রকৃত ঘটনা কি ছিল । এই লক্ষণের উপস্থিতি মূল ঘটনার বাস্তবতার প্রদর্শক।

মানুষের সমস্যাবলীর পরিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তা এই যে, শরীর মানুষের বিবেক- বুদ্ধিকে- মানুষের সুস্থ চেতনা অনুভূতিও সংবেদনশীলতাকে আহ্বান করে, উদ্বুদ্ধ করে। মন- মানসিকতাকে জাগ্রত করে এবং এই পৃথিবীর অনাচারের নির্ধারিত শাস্তির কথা জানিয়ে দিয়ে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত ও সচেতন করে। স্মরণ করিয়ে দেয় অনাচারের পরকালীন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দানের নিশ্চিত ব্যবস্থার কথা। ফলে কোন সুস্থ মানুষই পাপ বা অনাচারের দিকে অগ্রসর হতে সাহস পায় না। তেমন কোন ব্যাপার সম্মুখবর্তী হলে তার অন্তরে কম্পন শুরু হয়ে যায়, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরে, পরকালীন আযাবের কথা স্মরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ অবস্থায় কেউ যদি কারোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তা'হলে সে সাক্ষ্য দেবে কেবলমাত্র পরকালীন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলের ভয়ে। মানুষ তখন নিজের সম্পর্কে এমন কোন স্বীকারোক্তিও করে না, যার ফলে তাকে কঠিন শাস্তি ধ্বংসের পরিণতির লাভ করতে বাধ্য হতে হবে। সাক্ষ্যদাতাও কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দানে উদ্যত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সাক্ষ্যদাতা সত্যকে গোপন করারও সাহস পায় না। কেননা আল্লাহ্‌র ঘোষণানুযায়ী সাক্ষ্য গোপনকারী ও মিথ্যাবাদী গণ্য হবে। তাই তাকে সাক্ষ্য দিতে হবে ঠিক ততটুকু, যতটুকু সে নিজে জানে । না জেনেও কেউ সাক্ষ্য দিলে সে তো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সাক্ষীকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যার সে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কুরআন মজীদে তাই আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাহারা যাদের ডাকে, তারা শাফায়াত করার কোন ক্ষমতা রাখে না।
'তবে কেউ যদি জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়" [২১]।

এ আয়াতাংশ অনুযায়ী সাক্ষ্যদানের প্রথম শর্ত, তা সত্যের সাক্ষ্য এবং সত্যতা সহকারে হতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত, সে সাক্ষ্য হতে হবে জ্ঞানের ভিত্তিতে, জানা-শুনা বিষয়ের জন্য। না জানা বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার কারো নেই। আর শুধু জানলেই হবে না, জানা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে পরম সত্যতা ও সতর্কতা সহকারে। অপর একটি আয়াতের অংশ হচ্ছে- "যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি আমরা শুধু বর্ণনা করছি শুধু তারই সাক্ষ্য দিচ্ছি" [২২]।

এখানেও সাক্ষ্য দানের ব্যাপারটি জানা-শুনার আওতার মধ্যে সীমিত। শরীয়ত এই বিধানও দিয়েছে যে, যে লোক কোন গুনাহ্‌ বা অনাচার করবে সে প্রকাশ্যভাবে তা থেকে তওবা করবে-তওবা করেছে তা প্রকাশ্য ভাবে বলতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

যে লোক কোন খারাপ কাজ করবে কিংবা নিজের উপর যুলুম করবে, পরে সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান পাবে" [২৩]।

একটি স্ত্রীলোক যেনা করার পর সে তা স্বীকার করলে নবী করীম (সাঃ) তার এই স্বীকারোক্তির জন্য তার প্রশংসা করেছিলেন [২৪]। অনুরূপভাবে সাক্ষ্যদান ও সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহ দান করেছেন তিনি। কেননা সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান এবং সুস্থ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। তাকে হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য নিরপেক্ষ ও চারিত্রিক দোষে অভিযুক্তের উর্দ্ধে।

---

২১. আল কুরআন, সুরা যুখরুফ, আয়াত নং ৮৬।

২২. আল কুরআন, সুরা ইউসুফ, আয়াত নং ৮১।

২৩. আল কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত নং ১১০।

২৪. এই প্রশংসা শুধু স্বীকারোক্তির জন্য ছিল না, সে যে স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করেছে এবং শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি-প্রস্তর নিক্ষেপে প্রাণ সংহার গ্রহন করে পবিত্র হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হওয়ার সংকল্প করেছিল, প্রশংসা ছিল এই আত্মোৎসর্গী কৃত ঈমানের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফির ব্যক্তির সাক্ষ্য, বিবেকহীন এবং সাক্ষ্য বিষয়ে না জানা লোক এবং ফাসিক-সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে নিজের বা নিজের বংশধরদের বা পিতার জন্য ফায়দা পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না [২৫]। অবশ্য অমুসলিমদের জন্য অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে যদি অন্যান্য শর্ত পুরাপুরি পাওয়া যায়। বালকদের সাক্ষ্য ও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তা তাদের পারস্পরিক আঘাত যখম ইত্যাদির ব্যাপারে, যতক্ষণ তাদের সাথে তাদের বড়রা মিলিত না হচ্ছে এবং স্বতন্ত্রভাবে থাকা অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কেননা বড়রা তাদেরকে আসল ঘটনা থেকে ভিন্নতর কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে পারে।

প্রমাণিত হওয়া ও সাক্ষ্য গ্রহণের দিক দিয়ে অনাচারসমূহ পারস্পরিক বিভিন্ন। কোন কোন অনাচার প্রমাণের জন্য মাত্র করে দুইজন স্বাক্ষী-ই যথেষ্ট হতে পারে। আবার কোন অনাচারে স্বাক্ষীদের সংখ্যা চার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন যিনা, ব্যভিচার ও লাওয়াতাত (পুং মৈথুন) অনাচার প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের নিম্নতম সংখ্যা চার। তবে শেষোক্ত অনাচার প্রমানেও চারজন সাক্ষীর প্রয়োজনের বেলা শরীয়ত-অভিজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে সেজন্য দুজন সাক্ষী-ই যথেষ্ট। কেননা সে অনাচারটি ঠিক যেনার মত নয়। কেউ কেউ মনে করেন, সে অনাচারের শাস্তিও ঠিক তাই, যা যিনার শাস্তি। ফলে তাঁরা যিনা প্রমানের যে শর্ত, লাওয়াতাত প্রমাণেও সেই শর্তই আরোপ করেছেন। কোন কোন অনাচারের প্রমাণ শুধু কিরা-কসম, যেমন হত্যা।

কোন কোন অনাচার প্রমানিত হয়ে শুধু বাদীর সাক্ষ্যে। 'লেয়ান' হচ্ছে সেই অনাচার। স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের ব্যপারে অভিযুক্ত করে এবং সেখানে অন্য সাক্ষী কেউ না থাকে, তবে এই সাক্ষ্যটা উপস্থাপনে বেশ কয়টি শর্ত রয়েছে । সাক্ষীকে পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। তাকে পর পর চারবার সাক্ষ্য দিতে হবে যে, স্ত্রী যিনা করেছে এবং পঞ্চমবারে বলতে হবে, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তা'হলে তার উপর যেন খেদার লা'নত বর্ষিত হয়। কুরআন মজীদের আয়াতে এই কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।

"যেসব স্বামী নিজেদের স্ত্রীদের যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাদের নিকট নিজে ছাড়া আর কোন সাক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের এক একজন চার-চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী"।[২৬]

কোন কোন অনাচার স্বভাবতই ব্যক্তির স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এই স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে স্বীকারোক্তিকারীর যোগ্যতা। তা থাকলেই সে স্বীকারোক্তির গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অবশ্য স্বীকারোক্তি অনাচার প্রমাণের লক্ষ্যে সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

---

২৫. কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কাফিরের সাক্ষ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে । কুরআনে বলা হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ তোমাদের কারুর সত্য উপস্থিত হলে তখন যেন অছীয়ত করা হয়।

২৬. আল কুরআন, সুরা নূর আয়াত নং-৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা তাকে কেউ মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে তার কোন আশংকা থাকে না উপরন্তু কোন সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক কোন মিথ্যা অভিযোগ স্বীকার করে নিজের ক্ষতি সাধন করতে প্রস্তুত হবে এমন কথাও চিন্তা করা যায় না। তাই সেই সাথে এই শর্তও রয়েছে যে, স্বীকারোক্তিটা মিথ্যা প্রমাণিত হবার আশংকা থেকে মুক্ত হতে হবে।

ঘটনা বা অনাচার সংশ্লিষ্ট লক্ষণাদিও যে প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে এবং তা অনাচার সংঘটিত হওয়ার সত্যমিথ্যা প্রমাণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে পারে, কুরআন মজীদে উদ্ধৃত ইউসুফ (আঃ) সংক্রান্ত কিসসা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । হযরত ইউসুফ যার ঘরে অবস্থান করতেন, সেই মহিলা-ই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন ও তার ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চান। এই সময় সেই মহিলা তাঁকে ধরে ফেলে জামার কোণ ধরে টান দেয়। তাতে পিছন দিক থেকে জামা ছিঁড়ে যায়। ঠিক এই সময়ই ঘরের কর্তা দরজার মুখে উপস্থিত হয়, আর অমনি মহিলাটি বলতে শুরু করে, আমার কোন দোষ নেই, ও-ই আমার প্রতি খারাপ ইচ্ছা নিয়ে এসেছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তার প্রতিবাদ করে বক্তব্যের মধ্যে কোনটি সত্য, তা প্রমাণের জন্য মহিলার ঘরেরই একজন লোক লক্ষনাদিকে ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক সাক্ষ্য দিল। বলল, ইউসুফের জামা সম্মুখের দিক দিয়ে ছেঁড়া হলে বুঝতে হবে মহিলা সত্য বলছে, আর পিছন দিকে থেকে ছেড়া হলে ইউসুফ-ই সত্যবাদী হবে। এই ফর্মূলার ভিত্তিতে যখন তদন্ত করা হলো, তখন ইউসুফেরই সত্যতা প্রমাণিত হলো এবং মহিলাই যে এই অনাচারের জন্য দায়ী তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো।

এই দীর্ঘ কাহিনী জানিয়ে দিচ্ছে যে, অবস্থার লক্ষনাদিও সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং সে লক্ষনাদি থেকেই প্রকৃত সত্য জানা যেতে পারে, প্রমাণিত হতে পারে আসল অনাচারকারী কে বা কার দোষ কতটুকু। কাজেই অবস্থা সংশ্লিষ্ট লক্ষনাদি উপেক্ষা করা ঠিক হবেনা এবং সাক্ষী নেই বলে অনাচারের বিচার হবে না, অনাচারকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে না- তা হতেই পারে না। বিশেষতঃ এজন্য যে, অনাচারের প্রত্যক্ষদর্শী বা স্বাক্ষী সর্বক্ষেত্রে থাকতেই হবে, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। অনাচারকারীরা যথাসম্ভব লুকিয়ে ও লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই অপরাধ মূলক কাজে লিপ্ত হয়। কাউকে দেখিয়ে অনাচারটি করার ব্যাপার চিন্তনীয় নয়।

বহু সংখ্যক অনাচার প্রমাণে ঘটনার লক্ষনাদির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে, তা রাসুলের সুন্নাত থেকেও প্রমানিত । কেননা ঘটনার লক্ষনাদি ও তার আশ-পাশ বা পার্শ্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে এবং সে সবের প্রেক্ষিতে প্রকৃত ঘটনার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করা না হলে কঠিন ও ব্যাপক বিপর্যয় এবং মারাত্মক ক্ষতি ও বিপদের সৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অথচ মহান সুদৃঢ় শরীয়ত সর্বপ্রকার বিপদ ক্ষতি, অন্যায় ও পির্যয়ের পথ সমূলে রুদ্ধ ও মূলোৎপাটিত করার জন্যই এসেছে । আর শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার প্রতিবিধান এবং তার সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জনগণেকে সাহায্য দান। মুসলিম উম্মতের আবহমানকালীন নেতৃবৃন্দ ও অবস্থার লক্ষনাদির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন-বিশেষত বিচারের ক্ষেত্রে ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের কথা যাঁরা জানে না অতীতে যারা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং জনগণ তাঁদেরই নেতৃত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তাঁরাই তো এই উম্মতের জন্য হিদায়েতের জ্বল-জ্বল করা তারকা-নক্ষত্র এবং মুক্তাদীদের নেতা। তাদের রেখে যাওয়া জ্ঞানেও অবস্থার লক্ষণাদির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপের কথা জানা যায়।

হযরত সুলায়মান ও দাউদ (আঃ)- এর একটি ঘটনা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)– বর্ণনা করেছেন। তা হল দুইজন স্ত্রীলোক একটি বাচ্চাকে নিয়ে দাবি তুলেছে যে, এ আমার সন্তান। চূড়ান্ত বিচারের জন্য তারা হযরত দাউদের নিকট উপস্থিত হলো। তখন তিনি বাচ্চাটিকে বেশি বয়সের স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন। এই সময় সুলায়মান (আঃ) উপস্থিত হলেন, তিনি বললেন- আপনি একি বিচার করলেন? ব্যপারটি আমার কাছে ছেড়ে দিন, আমিই সঠিক বিচার করব। তখন সুলায়মান (আঃ) বললেন, তোমরা একটা ছুরি নিয়ে আস। বেশি বয়সের মেয়েলোকটি জিজ্ঞেস করল, কি জন্য? বললেন, আমি ছুরি দিয়ে বাচ্চাটিকে দু খন্ডে বিভক্ত করে তোমাদের দুই জনকে ভাগ করে দেব। সেই বেশি বয়সের স্ত্রীলোকটি খুব তাড়াহুড়া করে একটা ছুরি নিয়ে উপস্থিত হলো। এতেই হযরত সুলায়মান বুঝতে পাললেন যে এ বাচ্চা তার সন্তান নয়। কেননা কোন মা-ই তার সন্তানকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য নিজেই ছুরি এনে দিতে পারে না। তখন তিনি সন্তানটি ছোট বয়সের মেয়ে লোকটিকে দিয়ে দিলেন।

এই মেয়েলোকটিই যে বাচ্চাটির মা এবং বাচ্চাটির যে তারই সন্তান, বেশি বয়সের মেয়ে লোকটির সন্তান নয়, তা অবস্থার লক্ষণ থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এই ঘটনাও অবস্থার লক্ষনের ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যাপার জানার একটা পন্থা উদ্ভাবনে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত, যদিও খুব কম লোকই অবস্থার লক্ষণ থেকে এত বড় দিকদর্শন লাভ করতে পারে। এজন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অনুধাবন প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন। মনস্তত্ত্ববিদ্যা একজনকে এতটা দক্ষ বানাতে পারে যে, সে একজনের প্রতি তাকিয়ে তার ভিতরে-মনে-কি আছে তা বলে দিতে পারবে। আরও অনেক ব্যাপারে তা থেকে অনেক প্রকারের কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। ইসলামী আদালতে বিচারের ক্ষেত্রেও প্রকৃত ব্যাপার জানার পর এবং আসল অনাচারকারীকে চিহ্নিত বা পাকড়াও করার জন্য এই পন্থা ব্যবহৃত হতে পারে। তবে ব্যাপারটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, সব বিচারকই তা করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি-ই অনাচার প্রতিরোধের একমাত্র অবলম্বন নয়

সমাজ সমষ্টিকে অনাচারমুক্ত করার জন্য ইসলাম নিছক বৈষয়িক বা পরকালীন শাস্তিরই ব্যবস্থা করেনি। ইসলামী শরীয়ত ও তার শিক্ষা যে লোকই অনুধাবন করবে, সে-ই উপরোক্ত কথার যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ইসলাম অনাচার সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে ইচ্ছুক। এ কারনে ইসলাম মুসলিম ব্যক্তির চর্তুদিকে এক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যা তাকে অন্যায়ের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে। নিম্নোদ্ধৃত দিকগুলো লক্ষ্যনীয় বা অনুকরণীয়।

ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তি সংশোধন, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মল লালন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামের উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত করতে সচেষ্ট । তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপণ করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অনাচার ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে দিতে চায়। আর প্রকৃত সঠিক ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়-ই হচ্ছে সু-দৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ, নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এক কঠিন প্রতিরোধ। কেননা সে নিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত। কারো কোন অনাচার লোকদের নিকট অজানা থাকলে আল্লাহ্র নিকট তো কিছুই গোপন থাকে না। এবং কেউ যদি অনাচার করে পৃথিবীর আযাব থেকে নিস্তার পেয়েও যায়, তবু পরকালীন আযাব থেকে সে কিছুতেই নিস্কৃতি পেতে পারে না। ঈমান-ই যে বড় বড় অনাচার প্রতিরোধক, তা রাসূলে করীমের এই হাদীসটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

তিনি বলেছেন- যিনাকারী যখন যিনা করে তখন ঈমানদার থাকে না, শরাব পান কালেও পানকারী ঈমানদার থাকে না এবং যখন লুটপাট করার সময় নিরবে অন্যরা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তখন সেও ঈমানদার নয়।[২৭] স্পষ্ট বোঝা গেল এ হাদীস অনুযায়ী কোন ঈমানদার ব্যক্তিই ব্যভিচার করতে পারেনা, মদপান করতে পারেনা। মদপান করলে সে আর ঈমানদার থাকেনা কাজেই যার নিকট ঈমান জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে এসব অনাচার থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে।

হারাম কাজ করা থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য অত্যন্ত খারাপ পরিনতির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। সে খারাপ পরিনতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করে পেশ করা হয়েছে। সে ভয়াবহ পরিনতি স্বভাবতই মানব মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস পেতে পারে না।

যেসব লোক মুরতাদ হয়ে আল্লাহর সাথে সীমালঙ্ঘন করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

---

২৭. লুটপাট সংঘটিত হতে নীরবে দেখার কারণ, তা বন্ধ করার দায়িত্ব সচেতনতার অভাব কিংবা লুটপাটকারী লোকদের আক্রমণের ভয়।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক মুরতাদ হবে এবং কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, এ জাতীয় লোকদের যাবতীয় নেক আমল ইহ ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা হবে জাহান্নামী। সেখানেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে।[২৮] মানুষ হত্যার বীভৎসতা ও জঘণ্য অনাচার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন- যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তিকে সংকল্প করে হত্যা করবে, তার প্রতিফলন হচ্ছে জাহান্নাম। চিরকাল থাকবে তথায়। আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্য খুব কঠিন আযাব নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করে রেখেছেন।[২৯]

"তোমরা যেনার নিকটেও যাবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও (যৌন লালসা পূরনের) খুবেই খারাপ পথ"।[৩০]

যেসব লোক আল্লাহর সহিত অপর কোন ইলাহকে শরীক করে না, মানুষকে কিসাসের জন্য ছাড়া হত্যা করাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তা সে হত্যা করে না, ব্যভিচার করে না, যে লোক তা করবে, সে বড় পাপের সম্মুখীন হবে, কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুন করা হবে, তাতে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরদিন থাকবে- তবে তওবা করবে (সে তা থেকে রক্ষা পাবে)।[৩১]

যিনার মিথ্যা দোষারোপ পর্যায় বলা হয়েছে

যেসব লোক ঈমানদার লোকদের সমাজে নির্লজ্জতাকে ব্যাপক প্রচার করতে ভালোবাসে ও পছন্দ করে তাদের জন্য তীব্র পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই।[৩২]

আরও বহু ধরনের অনাচারকে হারাম ঘোষণাসহ বহু আয়াত কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহর কাছে সুস্পষ্ট আছে। তবে উপরোদ্ধৃত আয়াত কয়টি থেকেই মুরতাদ বা মুসলমানের ইসলামের প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলা ও সেই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, ইচ্ছা ও সংকল্প করে মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যেনা করা বা যিনার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা- তার কারণ উদ্ভাবন এবং কারোর উপর যেনার মিথ্যা দোষারোপ করাও মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা। জঘন্য চরিত্রের কাজ কর্মের ব্যাপক বিস্তার করা যে কোন ঈমানদার লোকদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়- তা করলে আর সে ঈমানদার থাকে না, তা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

---

২৮. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত নং-২১৭।

২৯. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত নং- ৯৩।

৩০. আল কুরআন, সূরা ইসরা, আয়াত নং- ৩২।

৩১. আল কুরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত নং- ৬৮-৭০।

৩২. আল কুরআন, সুরা নূর, আয়াত নং- ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরীয়ত সকল ভালো পূণ্যময় আল্লাহভীরুতামূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সত্যের উপদেশ, ধৈর্য অবলম্বনের নসীহত এবং সকল পাপ, সীমালংঘন মূলক কাজ, অন্যায়, যুলুম ও বিপর্যয় প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছে, বলা হয়েছে-

কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। শুধু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পারস্পরিক সত্য কাজের ওসিয়ত করেছে এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ধারনের।[৩৩]

তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর সকল প্রকার কল্যাণময় ও তাক্ওয়াপূর্ণ কাজে এবং কোনরূপ সহযোগিতা করবে না পাপ গুনাহ্ ও সীমালংঘন মূলক কাজে।[৩৪]

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন

তোমাদের মধ্যে যে লোকই কোন অন্যায় ও পাপ-ঘৃণ্য কাজ হতে দখবে, সে যেন তা নিজ হস্তে ও শক্তির বলে ক্রমশঃ পরিবর্তন করে দেয়। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন মুখে তার প্রতিবাদ করে এবং তাও করতে সামর্থ না হলে অন্তর দিয়ে তাকে খারাপ জানবে। আর এই শেষোক্ত অবস্থা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।[৩৫]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন- 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালিম হোক কি মযলুম'।[৩৬] আমি বললাম, হে রাসূল! মযলুম ভাইর সাহায্য করার নির্দেশের তাৎপর্য তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু যালিমের সাহায্য বিভাবে করব, তা বুঝতে পারলাম না। উত্তরে আল্লাহর রাসুল বলেনঃ "তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, তা হলেই তাকে সাহায্য করা হবে"।[৩৭]

"যে লোক বিদ'য়াত ও অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেবে, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন"।[৩৮]

"দীন হচ্ছে সম্পূর্ণ কল্যাণ কামনা"[৩৯]।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এই কল্যাণ কামনা কার জন্য? রাসুলেপাক (সাঃ) বললেনঃ এই কল্যাণ কামনা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং সমস্ত মুসলিম জন-নেতাদের জন্য।[৪০]

---

৩৩. আল কুরআন , সুরা আস্র, ।
৩৪. আল কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ২
৩৫. সূনানু আবী দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং-১৭৮৪।
৩৬. সহীহুল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ হাদীস নং-৪৭০৫।
৩৭. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ১০০৮।
৩৮. সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৫ইং)খ ২, পৃ. ২৫।
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদীসের এসব আদেশ ও বিধানের কারনে ইসলামী সমাজে অন্যায় বিরোধী চেষ্টা সাধনায় পারস্পরিক সাহায্য ব্যাপক রূপ লাভ করে। সকলেই তার প্রতিরোধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে অন্যায় অনাচারকারী কোথাও একবিন্দু আশ্রয় পায়না। কেউ তাকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য বা সহযোগিতা করেনা। ফলে ইসলামী সমাজে অন্যায়, যুলুম বা পাপ বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না, দুর্বল ও ক্ষীন হয়ে থাকে, সংকুচিত ও নির্মূল হয়ে যায় এবং ন্যায়, কল্যাণময় ও ভালো-ভালো কাজ ব্যাপক ও বিস্তার লাভ করে।

এই দৃষ্টিতে যে লোক চোরকে, হত্যাকারীকে, ব্যভিচারীকে এবং এই ধরনের অনাচারকারীকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিবে- যার উপর কোন হদ্দ্ বা আল্লাহ্ কিংবা বান্দার হক্ ধার্য হয়েছে- বুঝতে হবে সে লোকও অনাচারকারীর সহিত সমান ভাবে শরীক রয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত যখন কোন কাজকে হারাম ঘোষণা করে, তখন সেই কাজের সুযোগ করে দেয়া বা অনিবার্য করে তোলে যে সব পথ, তাও সঙ্গে বন্ধ করে দেয়, সেই উপায় পথ ও পন্থাকেও হারাম ঘোষণা করে। যেসব প্রাথমিক অবস্থা ও কার্যাবলী সেসব হারাম কাজকে সহজ করে দেয়, সেগুলিও সাথে সাথে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন ইসলামে ব্যভিচার হারাম ঘোষিত হয়েছে । ফলে যেসব কাজ মানুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, নারী-পুরুষের যৌন মিলন ঘটায় বা ঘটানোকে সহজ করে দেয়, তা-ও ঘোষিত হয়েছে।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, একজন যুবক একজন যুবতীর নিভৃত নির্জনে একত্রিত হওয়াকে হারাম করা হয়েছে। কেননা এ কাজের পরিনামে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া এক অনিবার্য ও অবধারিত ব্যাপার। কুরআন মজীদে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় ও স্বভাব-প্রকৃতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, যেসব কাজ বা অনুষ্ঠান, তা বন্ধ করার একটা স্থায়ী নিয়ম ঘোষিত হয়েছে।

ঠিক এ কারনেই মুহরিম সঙ্গী ব্যতীত কোন মহিলার পক্ষে একদিন এক রাত্রির দূরত্বের পথে সফরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা তা করা হলে তথায় ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার আশংকা স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হয়ে দেখা দেয়। এজন্যেই নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর থেকে দৃষ্টি বিরত ও নত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা দৃষ্টি বিনিময়ই অবৈধ যৌন মিলনের পথ উন্মুক্ত করে, প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। আল্লাহ বলেন-

মু'মিনদের বল, তারা যেন, তাদের (কোন কোন) দৃষ্টি নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। এই নীতি তাদের জন্য অতীব পবিত্র। তারা যা কিছু করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে পূর্ণ অবহিত।[৪১]

৪১. আল কুরআন, সূরা নূর, আয়াত নং- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক আয়াতে মহিলাদের ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে দৃষ্টি নিচু রাখার জন্য। তারও উদ্দেশ্য তাই-ই যা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। সেই সাথে মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছে ভিন্ পুরুষদের সহিত কথোপকথন করতে, কথায় মিষ্ট, বিনম্র ও লালিত্যময় সুর মিশ্রিত করতে। কেননা তা করা হলে অসুস্থ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মনে কামনা জেগে উঠে ও তার বাস্তবায়ন সহজ ও সম্ভব বলে মনে করতে শুরু করে।

ইসলাম মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছে। সেই সাথে নিষিদ্ধ করেছে তার ব্যবসা, তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করাকেও। কেননা তাতে মদের সাথে একটা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। মনে জাগে তার প্রতি একটা প্রীতি ও ভালবাসার ভাব । তাই তার উৎপাদনকারী, ক্রয়-বিক্রয় কারীর ও তার বহনকারী, আমদানীকারীর উপরও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ইসলামী শরীয়তে । কেননা এসব কাজের মাধ্যমে মদ্যপানের মত একটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের সহিত সহযোগিতাই করা হয়।

আল্লাহ যখন কোন জিনিস বা কাজ হারাম করে দেন, তখন তদস্থলে একটা হালাল কাজের পন্থা বৈধ করে দেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ হারাম কাজটি পরিহার করে হালাল কাজটির দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করবে। যেমন ইসলামে যেনা হারাম করে দেয়া হয়েছে কিন্তু বিয়ে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে।
নবী করীম (সা) বলেছেন

"হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে লোকই বিয়ের বোঝা বহনে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা এই বিয়ে দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করবে। আর যে তা করতে সক্ষম হবে না, তার উচিত রোযা রাখা। এই রোযা তার জন্য ঢাল হয়ে দেখা দিবে।"[৪২]

লোকদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকে, যার জন্য একজন মাত্র স্ত্রী যথেষ্ট হয় না, তার জন্য শরীয়তে দুই বা তিন কিংবা চারজন স্ত্রী এক সাথে গ্রহনের ও রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যেনার পথে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অনুমতি কখনই দেয়া হয়নি ।

ইসলামে চুরি হারাম ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু অভাব-অনটন, দারিদ্র্যই চৌর্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হবার প্রধান কারণ বিবেচিত হওয়ায়, তা স্থায়ীভাবে দুর করার লক্ষ্যে ইসলামী সমাজে যাকাত ফরয করে দেয়া হয়েছে। যাকাত হচ্ছে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সেই সাথে ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব-মিসকীনদের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার রয়েছে বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

"আর সেসব লোক, যাদের ধন-মালে সুনির্দিষ্ট ও জ্ঞাত হক্ রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের"।[৪৩]

---

৪২. সহীহ্ লি মুসলিম, কিতাবুল বিররে, হাদীস নং-৪৭৬৭।
৪৩. আল কুরআন, সূরা মা' আরিজ, আয়াত নং- ২৪, ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদ যদি দরিদ্রদের অভাব মোচনে যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের অভাব দূর করার জন্য গোটা সমাজই দায়ী হবে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক স্থানের ধনী লোকদের দায়িত্ব হবে স্থানীয়ভাবে সমস্ত দরিদ্র জনতার অভাব দুর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকার তা করার জন্য তাদের বাধ্য করবে। সর্বশেষ অবস্থায় যাকাত ও ধনীদের দেয়া দান-সাদকাতে ও যদি অভাব পুরাপুরি না মেটে, তাহলে ধনীদের কর্তব্য হবে, নিজেদের সম্পদ দিয়ে দরিদ্রদের প্রাণ বাঁচানোর পরিমাণ খাদ্য, শীত গ্রীষ্মের প্রয়োজনীয় পোশাক, বৃষ্টি, রৌদ্রের তাপ ও পথ যাত্রীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে অনাচার প্রতিরোধে শুধুমাত্র শাস্তি বা দন্ডবিধির প্রাধান্য প্রয়োজন হয় না। এই কথার দলীল হচ্ছে কুরআন মজীদের এই আয়াত-

"এবং দাও নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের হক"।[৪৪]

এবং পিতা-মাতার সহিত অতীব উত্তম ব্যবহার করতে হবে, করতে হবে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সঙ্গী, নিঃস্ব পথিক এবং তোমাদের দক্ষিন হস্তের মালিকানাধীন দাস-দাসীর সাথেও।[৪৫]

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, দাস-দাসী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের সহিত আন্তরিক ব্যবহার এবং সর্বপ্রকার কষ্টকর অবস্থা থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করার অবশ্য পালনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, জাহান্নামে তোমাদের নিয়ে গেল কোন জিনিস? বলবে, আমরা তো মুসল্লী ছিলাম না এবং আমরা মিসকীনদের খাবারও খাওয়াতাম না। এ আয়াতে সালাত রীতিমত আদায় করা ও মিসকীনকে খাবার দেওয়া মুসলিম মাত্রের জন্যই কর্তব্য ঘোষিত হয়েছে। উপরন্তু মিসকীনকে খাবার দেওয়ার গুরুত্ব সালাত আদায় করার সমান বলেও প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ দুইটি কাজ না হলে যে জাহান্নামে যেতে হবে তা-ও স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৪৬]

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁর খিলাফত আমলের দুর্ভিক্ষকালে চোরের হাতকাটা আইন মুলতবি ঘোষণা করেছিলেন। তার কারণ ছিল, দুর্ভিক্ষ ও প্রচন্ড অভাব অনটন কালে কে অভাব গ্রস্ত তার দরুন, আর কে কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই চুরির কাজ করেছে তা নিরূপণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। এরূপ সংশয়জনক অবস্থায় হাত কাটার নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভব হতে পারেনা।

---

৪৪. আল-কুরআন, সুরা ইসরা আয়াত নং-২৬।

৪৫. আল-কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত নং-৩৬

৪৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত হাতিব ইবনে আবু বলতায়া (রাঃ)-এর ক্রীতদাসরা মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছিল। পরে তাদের হযরত উমরের নিকট উপস্থিত করা হয় এবং তারা এই অপরাধ স্বীকার করে। হাতিব পুত্র আবদুর রহমানকে ডেকে এনে তাকে বলা হয়, হাতিবের ক্রীতদাসরা মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তির উট চুরি করেছিল, তারা তা স্বীকারও করেছে। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'হে কাসীর ইবনুসসালত। তুমি এদের হাত কেটে দাও।' কিন্তু পরে যখন তিনি তাদের এই চুরির মূল কারণ জানতে পারলেন, তখন বললেন-

আল্লাহর কসম! আমি কেন পূর্বে জানতে পারিনি, তোমরা এই ক্রীতদাসদের দ্বারা কাজ করাতে কিন্তু তাদের খাবার না দিয়ে ক্ষুধায় কষ্ট দিতে। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ হারাম করা জিনিসও যদি তারা খাবার হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তাদের জন্য তা হালাল হয়ে যায়।

পরে তিনি মুযায়নাদের উটের দ্বিগুন মূল্য দিয়ে তাদের বিদায় করে দেন।[৪৭]

আল্লাহ্ তা'আলা যে সব ইবাদত ফরয করেছেন, মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদের পাপ ও নাফরমানীর কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তা বিরাট ও ব্যাপক প্রভাবশালী। যেমন সালাত মু'মিনকে সকল প্রকার নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে যদি তা গভীর মনোযোগ, ভয়াশংকা মিশ্রিত আনুগত্য ও সজাগ মনে রীতিমত আদায় করা হয়। আর এই সালাত তরক করা হলে তার পরিনতি সু-স্পষ্ট গুমরাহী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রোযাও রোযাদারকে সকল প্রকার লালসাও ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করে।

ইসলামের সংশোধন ও পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার পূর্ণ প্রয়োগ ও কার্যকরী মহা গ্রন্থের শিক্ষাও যদি এই পর্যায়ে সুফল দিতে ব্যর্থ হয়ে যায়, কারো আকীদা-বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, মনে আল্লাহ্র ভয় না থাকে এবং সেই কারনে নির্লজ্জতা ও পাপের কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করে অনাচারে জড়ানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও, যদি সে অনাচার মূলক কাজ করে তা'হলে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দন্ডে দন্ডিত করতে হবে। এরূপ অবস্থায় অনাচারের শাস্তি একান্তই অপরিহার্য ।

নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ অপরাধ প্রতিরোধক (Restraint)। আল্লাহ্ তা'আলা তা বিধিবদ্ধ করেছেন আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করা ও আদিষ্ট কাজ না করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে। কেননা মানুষের প্রকৃতিতে নগদ স্বাদ আস্বাদনের লোভে পরকালীন আযাবের প্রচন্ড ঘোষণা থেকে গাফিলকারী কামনা বাসনা ও লালসা নিহিত রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত এসব শাস্তি অচেতন লোকদিগকেও শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত করে তোলে। অপমান-লাঞ্ছনা পীড়নের ভয়ে ভীত ও সতর্ক করে দেয়। ইহারই ফলে আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী নিষিদ্ধই থেকে যায় এবং যেসব ফরয করেছেন, তা ফরয হিসেবেই পালিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে।

---

৪৭. সহীহ্ লি মুসলিম, কিতাবুন বিররে, হাদীস নং-৪৭৭১।

Dhaka University Institutional Repository

আর তা হলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, তা ফরয হিসাবেই পালিত বাস্তবায়িত হতে পারে। আর তা হলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ব্যাপকভাবে কার্যকর হয় এবং শরীয়ত পুরোপুরিভাবে পালিত হতে পারে। হে নবী! আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন মানুষকে জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করা, পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে হিদায়তের পথে পরিচালিত করা, সকল প্রকার নাফরমানী ও পাপ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা এবং ইতিবাচক ভাবে আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্য ও বাস্তব অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার বিরাট দায়িত্ব সহকারে।[৪৮]

তাই আল্লাহ্, রাসুল ও পরকালের প্রতি যার ঈমান আছে, তার পক্ষে আল্লাহর শরীয়ত ও রাসুলের দেয়া হালাল-হারাম বিধান লংঘন করা কখনই সম্ভব হয় না। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, ইসলামী শরীয়তের বিধানের প্রতি অকৃত্রিম ঈমান ও তার পুরাপুরী অনুস্বরণ সহ সকল প্রকার পাপ ও অনাচারের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। কারণসমূহ দূর করে এবং যেসব Factor মানব মনে তা করার প্রেরণা জাগায় তা নির্মূল করে দেয়।

দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজের তুলনায় ইসলামী সমাজে অনাচারের মাত্রা ও পরিমাণ নিতান্তই কম হওয়ার মূলে নিহিত প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে এভাবেই উদ্‌ঘাটিত ও সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। দন্ড, শাস্তি ও কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেদ করেও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহে অনাচারের অবাধ বিচরণ উপস্থিতি দিবালোকের ন্যায় সু-স্পষ্ট। শাস্তিকে অনাচার প্রতিরোধের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গণ্য না করে, আল্লাহ রাসুলের সামাজিক দর্শন অনুসরনের মধ্য দিয়ে সামাজিক অনাচার দমন করা সম্ভব।

---

৪৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের 'সামাজিক অনাচার'এর কারণসমূহ

বাস্তবে সামাজিক অনাচার এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, অনাচার সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, জৈবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ জড়িত থাকে। সমাজবিজ্ঞানী সি. এম. কেস তাই সামাজিক অনাচার সৃষ্টির জন্য দায়ী কারণসমূহ উদ্‌ঘাটনের চেয়ে কারণসমুহের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উৎসর কথা উল্লেখ করেন। উৎসগুলো হলেঃ

- ❖ বাহ্যিক পরিবেশে প্রতিকুল অবস্থা
- ❖ জনসংখ্যা প্রকৃতির ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা
- ❖ ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিন্যাস
- ❖ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ আদর্শ ও মূল্যবোধের তারতম্য [৪৯]।

বস্তুত প্রত্যেক সামাজিক অনাচার এর সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে একাধিক কারণ জড়িত থাকে এবং জড়িত হওয়ার এ ব্যাপারটি এতই জটিল যে, স্থান-কাল পাত্র বিবেচনা না করে নির্দিষ্ট অনাচার এর জন্য নির্দিষ্ট কোন কারণকে দায়ী করা যায় না। ফলে, সামাজিক অনাচার এর কারণ উদ্ঘাটনে একক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার হয়ে পরে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক অনাচার সৃষ্টির জন্য বহুবিধ কারণকে দায়ী করা হয়।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র-ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল অনাচার এর সমাধান ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান। মানুষের সামাজিক অনাচার এর কারণ চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানেও ইসলামের রয়েছে এক অনুপম ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার এর কারণসমূহ তুলে ধরা হল-

(ক) অর্থনৈতিক কারণ

১. যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
২. সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা।
৩. ঘুষ-দুর্নীতি।
৪. সরকারী সম্পদের অপচয় ও লুণ্ঠন।
৫. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের অভাব।
৬. অধিক মৌল মানবীয় চাহিদা।
৭. সম্পদের সুষম বন্টনের অভাব।
৮. অনুন্নত ও অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।
৯. প্রযুক্তির প্রয়োগ ও শিল্পায়ন।
১০. মাথাপিছু স্বল্পআয় ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. C.M. Case. Aanlysing social problems. (Nwe York: The Drydin Press, 1950), P.364.

(খ) মানসিক কারণ

১. মানসিক সংকীর্ণতা।
২. দানশীল ও উদার মনোভাবের অভাব ।
৩. ক্ষমাশীল, ধৈর্যপ্রিয় মনের অভাব।
৪. রুক্ষ, উচ্ছৃংখল ও অহংকারী যৌবন।
৫. দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকীকরণে ত্রুটি।
৬. অনুকরণ প্রবৃত্তি।
৭. উদ্বেগ ও উত্তেজনা।
৮ মানসিক বঞ্চনা ও পীড়ন।
৯. হতাশা ও নেশাগ্রস্ততা, ইত্যাদি।

(গ) শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কারণ

১. বিজ্ঞানভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।
২. আদর্শিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও পরিচর্যার অভাব।
৩. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও আদর্শহীনতা।
৪. মুল্যবোধের অবক্ষয়।
৫. সাংস্কৃতিক শূন্যতা।
৬. সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ।
৭. অসম সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক সংঘাত ।
৮. অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, ইত্যাদি।

(ঘ) প্রাকৃতিক কারণ

১. বন্যা
২. মহামারী
৩. নদীর ভাঙ্গন
৪. অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এবং
৫. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, ইত্যাদি।

(ঙ) ধর্মীয় কারণ

১. প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্ব-স্ব ধর্ম শিক্ষা দানের অভাব,
২. রাষ্ট্রীয়ভাবে স্ব-স্ব ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে উৎসাহিতকরণ/বাধ্যকরণের অভাব,
৩. প্রতিটি মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও ভীতির অভাব,
৪. পরকালকেন্দ্রিক জীবন গঠনে অনীহা, ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) সামাজিক কারণ

১. সামাজিক অবক্ষয়,
২. সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে শৈথিল্য
৩. সামাজিকভাবে আদর্শ ও নৈতিকতার লালন ও পরিচর্যার অভাব।
৪. সামাজিকভাবে ভাল কাজকে উৎসাহিতকরণ
এবং খারাপ কাজকে বাধা প্রদান প্রক্রিয়ার অভাব।
৫. সামাজিক পরিবর্তন।
৬. অপরিকল্পিত নগরায়ন।
৭. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গঠনগত পরিবর্তন ও কার্যকারিতার শিথিলতা।
৮. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কবন্ধনের ভারসাম্যহীনতা।
৯. সামাজিক কল্যাণ ও মূল্যবোধ পরিপন্থী আচরণ।
১০. সামাজিক কুপ্রথা কুসংস্কার।
১১. সামাজিক সমস্যা ও অনাচারের পারস্পরিক নির্ভরশিলতা।
১২. ব্যক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা ও দুর্বল সামাজিক সম্পর্কবন্ধন।
১৩. সুবিধাভোগী কম জ্ঞান-দক্ষতার অধিকারী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্রমবৃদ্ধি।

(ছ) রাজনৈতিক কারণ

১. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব।
২. ইসলামী খেলাফতের অনুপস্থিতি।
৩. সুবিধাভোগী কম দক্ষতার অধিকারী ও দুশ্চরিত্রের মানুষ নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।
৪. ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও ন্যায়পরায়ণ বিচার ব্যবস্থা অনুপস্থিতি।
৫. সন্ত্রাসের লালন।
৬. দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন।
৭. দ্রুত ও ঘন-ঘন রাজনৈতিক পরিবর্তন।
৮. রাজনৈতিক অস্থিরতা।
৯. রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলার ক্রম- অবনতি।
১০. স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামোর অনুপস্থিতি।
১১. দুর্বল রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব ইত্যাদি।

এসব কারণ সমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় সমাজে অনাচার এর জগত ক্রমশঃই বিস্তৃত হচ্ছে। "আজ নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও মানসিক দিক দিয়ে বিকৃত যুব সমাজের একাংশ ক্রমে ক্রমে সামাজিক ভাবে অপরাধের সাথে মিশে যাচ্ছে"।[৫০]

---

৫০. মোহাম্মদ সাদেক ও আবদুল হালিম, বাংলাদেশের সমষ্টি উন্নয়ন ও পাত্রী পূণর্গঠন (ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৭৮) পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে অনাচারের তীব্রতা এককভাবে কোন কারনে বৃদ্ধি পায় না। ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন ত্রুটি ও সমস্যার উপস্থিতি থাকার দরুন অনাচার জনিত কর্মকান্ড সংঘটিত হাওয়ার কারণ সমূহ বহুমাত্রিক ও বহুরূপী। উদঘাটিত কারণ সমূহের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখেই এর যথার্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশের সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সুপারিশমালা

নারী শিশুদের পরিস্থিতি উত্তোরণ

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও শিশুদের করুণ পরিস্থিতি এক কঠিন সামাজিক অনাচার এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নির্যাতনের কালো ছোবল থেকে উত্তোরনের উপায় হিসেবে এ প্রস্তাব প্রদান করা যেতে পারে।

(১) নারী, শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়াবলী যেমনঃ- ধর্ষণ, ধর্ষণনজনিত হত্যা, অপহরণ-পাচার, পতিতাবৃত্তি, এসিড নিক্ষেপ, অবৈধ শিশু ও শ্রম, যৌতুকপ্রথা সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।

(২) অশ্লীল কাব্য সাহিত্য প্রণয়ন প্রচার বন্ধ করণসহ, প্রচার মাধ্যমকে রুচি সম্পন্ন ও মার্জিত সংলাপ, সংবাদ ও সব ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে।

(৩) নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত মামলা দ্রুত গ্রহণ করা এবং পুলিশ সদর দপ্তরে নারী ও শিশু পাঁচার রোধ কল্পে মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

(৪) নারী ও শিশু পাঁচার সংশ্লিষ্ট ভিকটিম উদ্ধার ও পূনর্বাসন করা।

(৫) বিবাহ পূর্ব প্রেম পরকীয়া প্রেম, বাজে আড্ডা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

(৬) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর মধ্যে পারিবারিক নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে অন্তর্ভূক্ত করা, এই আইনে ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সী স্ত্রীর সংঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন ধর্ষণ রূপে চিহ্নিত করতে হবে।

(৭) নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সমাজের পুরুষ সদস্যদের সামাজিক ও আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(৮) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে মানবাধিকার ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত ইস্যু অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(৯) কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি থেকে নারীদের রক্ষা করতে যৌন হয়রানি রোধ আইন বা আচরণ বিধি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। ঝুকিপূর্ণ কাজ-থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্মত মান বজায় রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) নারী পুরুষ শ্রমিকের জন্য সমান সুযোগ ও সমান মজুরী চালুকরণ।

(১১) ইতিপূর্বে চালুকরা বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম (পূণঃর্বাসন কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার) আরো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করণ।

(১২) পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে গনতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ পরিবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া।

(১৩) অবৈধ নারীবাদী সংগঠন সমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

(১৪) উগ্রবাদী লেখক লেখিকাদের জব্দকরণ তাদের লেখনী রাষ্ট্রীয়ভাবে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণাসহ প্রয়োজনে লেখক লেখিকাদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

(১৫) ইসলামে নারী মর্যাদা দেয়া হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এসকল সুপারিশমালা কাঙ্খিত পরিমন্ডলে বাস্তবায়ন করা হলে সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ হয়ে সামাজিক অনাচার এর উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের চির সমাধি রচনা করা সম্ভব।

সমাজ থেকে মাদক ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

সর্বনাশা মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্বসভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মাদকদ্রব্যের অত্যাধুনিক সংস্করণ ইয়াবা, মারিজুয়ানা, আফিম, কোকেন, এ্যালকোহল ক্যানাবিস, মদ, হেরোইন প্রভৃতি মাদকদ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজে কামানের ন্যায় কাজ করছে। ফলে দিনের পর দিন হত্যা ও ধর্ষণসহ নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ বর্তমানে মাদকের শিকার।[৫১]

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহনের পরিণামে। মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও আসক্তদের হাতে গত কয়েক বছর আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী সিনেটর লুইস কার্লোস গ্যালেন। তার আগে নিহত হন আরেক বিচারপতি।[৫২]

হত দরিদ্র আমাদের এই বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য সেবীর সংখ্যা ১৩ লক্ষাধিক। আর এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে অভিজাত মহলের লোক। ইনজেকশন জাতীয় মাদকদ্রব্যের সুবাদে অনেক কোটিপতিও প্যাথেড্রিন ইনজেকশন নিয়ে নেশা করছে। যুবসমাজ মাদক সেবন করে হচ্ছে নারী আসক্ত। খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, রাহাজানী, ছিনতাই ও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ এই মাদকাসক্তি। এর ফলে যেমন দুরারোগ্য ব্যাধির প্রসার ঘটছে তেমনি নৈতিক গুণাবলীও হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে।

---

৫১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা ঃ স্বরুপ ও সমাধান, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ ইং), পৃ. ২৬৬।

৫২. আবদুদ্দইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস, সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (ঢাকা ঃ মুক্তমন প্রকাশন ১৯৯৮ ইং), পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাদকদ্রব্য বা মাদকাসক্তি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বোধ, নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে, তা সমাজ জীবনের গতিশিলতাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য। মাদকদ্রব্যের সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করে একটি কল্যাণকর ও গতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সরকার, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং আগ্রহী গোষ্ঠীর সামনে আশু করণীয় কয়েকটি দিক।

১. মাদক দ্রব্যের ভয়াবহতা ও নেতিবাচক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ বেচা-কেনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। এ ক্ষেত্রে সকল গণমাধ্যম ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

২. মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ বেচা-কেনা প্রতিরোধের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে এর যোগান সীমিত করা। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং মাদকদ্রব্যের কাঁচামাল ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং নিষিদ্ধ মাদক উদ্ভিদের চাষ বন্ধ করে বিকল্প ফসল উৎপাদনের কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

৩. মাদকদ্রব্যের চোরাচালান দমন ও নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে হলে নিয়ন্ত্রণ কৌশলের উন্নয়ন অনিবার্য। এ ক্ষেত্রে বৈধ ও আইনগত আন্তঃসরকার সহযোগিতা গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এ লক্ষ্যে কতিপয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ঃ

ক. পাচারের জন্য দায়ী অপরাধীকে বিচারের জন্য বিদেশী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ,

খ. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ,

গ. গভীর সমুদ্রে জাহাজ ও আকাশপথে বিমানের উপর সতর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বভৌম দেশের সীমান্তের স্থল ও নৌপথে কড়াকড়ি আরোপ করা। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে কিশোর এবং যুবকদের সচেতন ও সতর্ক করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ছাড়া জাতীয় প্রচার মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের অতি উচ্চ মূল্য সম্পর্কে প্রচার বন্ধ করতে হবে, যাতে দেশের বেকার বা যুবসমাজ অর্থ লোভে মাদক দ্রব্য পাচারে উৎসাহিত হতে না পারে।"[৫৩]

যুবসমাজ নেশার জিনিসের কুফল সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে গিয়ে পাছে কাউকে নেশার প্রতি কৌতূহলী করে তোলা যাতে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বোপরি মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনগণের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি এবং পুলিশ, কাষ্টমস্, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থাকে সক্রিয়করণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

---

৫৩. মুহাম্মদ সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্তু, ড্রাগ ও নেশার নানা জিনিসের প্রতি নির্ভরশিলতা এইডস, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মত ভয়াবহ ব্যাধি বিশ্ব জুড়ে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে। এ অবস্থায় এ সবের উৎপাদন, প্রস্তুত ও ব্যবহারকে সীমিত করেই কেবল এর গতিরোধ করা সম্ভব নয়। এ সঙ্গে প্রয়োজন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করণ। কারণ, দেশে প্রচলিত আইনের ভয় ও অন্য কোন ভয়-ভীতির চেয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ই পারে একজন মানুষকে সুস্থ ও সংযত জীবন যাপনে অভ্যস্থ করে তুলতে। বিশ্বজুড়ে তরুণ যুবসমাজের একটা অংশের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এর জন্য সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনকে দায়ী করার অবকাশ আছে। ধর্মীয় মূল্যবোধই কেবল এ অবস্থার হাত থেকে তরুণ ও যুবসমাজকে রক্ষা করতে পারে। নেশামুক্ত, সুস্থ ও সুশৃংখল সমাজ গঠনে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা চির প্রমাণিত।

সমাজ থেকে সুদ প্রতিরোধের উদ্যোগ সমূহ

সুদ স্বমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

১. সুদ রহিত করনের অভিপ্রায়ে সরকারীভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যে আইনের মাধ্যমে সুদ ব্যবস্থা স্বীকৃত ঐ আইনকে বাতিল করে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২. যাকাত আদায় ও বন্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুদ ব্যবস্থার মূলে যে সকল যুক্তি দেখানো হয় তন্মধ্যে প্রধানতম কারণ হল অলস টাকাকে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। কিন্তু ইসলাম মানুষকে তাদের অর্থ-সম্পদকে অলস না রেখে বিনিয়োগ করে সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করতে বাধ্য করার জন্যে যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদশালী ব্যক্তিদের সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট হারে বছরান্তে যাকাত প্রদান করা আবশ্যক হওয়ায় কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তি তার সঞ্চিত অর্থকে অব্যবহৃত রাখে না; বরং সকলেই সচেষ্ট থাকে তার অর্থকে উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করার জন্যে।

৩. ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সুদকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্নমূল করতে হলে ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। অবশ্য ১৯৬৩ সালে মিসরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকের বিস্ময়কর সুফল, বিশ্বের সকল মুসলিম ও অমুসলিম দেশকে ইসলামী লেন-দেন ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। যার ফলশ্রুতিতে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ১৫৩ টি ব্যাংক এর দশ সহস্রাধিকের মতো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪. করজে হাসানা ও মুদারাবা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। সমাজের বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থান কিংবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা স্বরূপ তাদের জন্যে করজে হাসানা (শুধুমাত্র মূলধন ফেরৎ দেয়ার শর্তে ঋণ) এবং মুদারাবা পদ্ধতি চালু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা। বাস্তব জীবনে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতির উপর সম্যকজ্ঞান লাভের জন্য ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা, এবং পাঠ্য সূচীকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঐচ্ছিক হিসেবে নয়, বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা ।

৬. ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন শাখাকে সম্মান শ্রেণীর স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে ইসলামী অর্থনীতি বোঝার সুযোগ প্রদান করা।

৭. ইসলামী অর্থনীতির সুপ্ত বিষয়াবলীকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ করে দেয়া।

৮. গণসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

ক. প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে।

খ. লেখনীর মাধ্যমে।

গ. জুম'আর মসজিদে খতীবের মাধ্যমে।

ঘ. গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকগণের মাধ্যমে।

ঙ. সভা-সমাবেশের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতিতে পারদর্শী এমন ধর্মীয় এবং জনগণের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করে সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. গণপ্রতিরোধ ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমনঃ

ক. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে।

খ. সুদখোরদের বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ প্রয়োগের মাধ্যমে।

গ. সুদখোরদের নাগরিক মর্যাদা হ্রাস করার মাধ্যমে।

ঘ. সমাজবাসীদের থেকে সুদখোরদের সম্পর্ক উচ্ছেদ করার মাধ্যমে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধের সুপারিশ মালা

সন্ত্রাস যেহেতু সামাজিকভাবে সৃষ্ট একটি ব্যাধি, তাই সমাজেই এর প্রতিকার সম্ভব। এজন্য আমাদের যা কিছু করণীয় তা হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

ক) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অত্যাচার, নিপীড়ন ও লুটপাটসহ বিভিন্ন অনাচার আরব বেদুইনদের জাতীয় জীবনে ছিল নিত্যসঙ্গী। সে জাতিই পবিত্র কুরআনের পরশে এসে সন্ত্রাস লুট পাট, হানাহানি ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছে। কাজেই সন্ত্রাস সহ সকল অন্যায় দুর করতে হলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। কোন রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা, মুসলিম শাসক বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম বলে ঘোষণা করলেই তাতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় না। একটি রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য।

প্রথমতঃ সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা ও স্বীকৃতি।

দ্বিতীয়তঃ একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহকে রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস হিসেবে ঘোষণা করা।

এছাড়া সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চয়তা, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক নেতৃত্ব ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মমতের লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, ন্যায় বিচার, ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুবিচার, সুদ মুক্ত, যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বানিজ্য নীতির ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক লেন-দেন। নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী সরকার, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পুনর্গঠন হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের প্রধান কর্তব্য।

খ) নৈতিক অবক্ষয় রোধ

নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ও আত্মিক প্রশান্তি লাভের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমান, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রতি ভালোবাসা, তাকে ভয় করা, পরকালে জবাব দিহিতার ভয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উন্নত চরিত্র, খোদাভীরু নেতৃত্বের অনুস্বরণ, সামাজিক উন্নতির জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো। আত্মিক অশান্তি দূরীকরনে ইসলাম আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য শাস্তির বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করেছে। চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারী নারী-পুরুষের উপর বেত মারা বা পাথর নিক্ষেপ। হত্যা, মদ, জুয়া, হাউজি ইত্যাদির ব্যপারে পদক্ষেপ নেয়া, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা তা নিষিদ্ধ করে যুগোপযোগী, বাস্তবমূখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করেছে।

যুদ্ধ নয় শান্তি, ক্ষমা, বদান্যতা, উদারতা, দানশীলতা, কলাণ কামিতা ইত্যাদি গুণের উন্মেষ ঘটিয়েছে ইসলাম। তাই প্রথম শতাব্দীতেই ইসলাম সমগ্র বিশ্বে তার স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. সমাজে প্রতিবাদের ক্ষেত্র তোলা

সমাজে সন্ত্রাসের প্রতিবাদের ক্ষেত্র নেই। এর অন্যতম কারণ প্রশাসন ও আইন সর্বসাধারনের জন্য সহজ নয় এবং সামাজিক ঐক্য নেই। সমাজে প্রতিবাদের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে উপরের দুটি দিকেই সচেতন হওয়া আবশ্যক। সমাজের বৃহত্তর ঐক্যের জন্য ধর্ম, সম্প্রদায়, রাজনীতিসহ ছোট-খাট সমস্যাগুলো পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে মিটিয়ে ফেলতে হবে। তারপর সন্ত্রাসের মতো বড় অনাচার মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করেতে হবে।

ঘ. পরিবার থেকে প্রতিবাদের ক্ষেত্র তৈরী করা

প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের উচিত তাদের পরিবারের কেউ যাতে এসব কার্যকলাপের সাথে জড়িত না হয়ে পড়ে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। কিন্তু কেউ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করলে ঐ পরিবার থেকেই তার প্রতিবাদ করা উচিত। বলা বাহুল্য নিজ পরিবার থেকে যদি ভুল বুঝিয়ে দেবার মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হতে বিরত করা সম্ভব হয় তা যতটা সহজ হবে অন্য কোন উপায়ে ততটা সহজ হবে না। তাই পরিবারের সকল সদস্যদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষার জন্য ঘর থেকেই প্রথম প্রতিবাদ করা উচিত।

ঙ. সন্ত্রাসীকে স্বভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ

সন্ত্রাসী একজন মানুষ। পারিপার্শ্বিক কারনে তার বিবেক ও চেতনা সাময়িকভাবে ভিন্নখাতে প্রলুব্ধ হলেও অন্যের মানবিক গুনাবলীর মাধ্যমে তার ভুল শোধরানো সম্ভব। এজন্য সমাজের মানুষের উচিত এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। মানুষকে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবর্তন করার অনেক দৃষ্টান্ত সমাজে রয়েছে। একজন সন্ত্রাসীকে প্রথম থেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

চ. প্রশাসনকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট করা

কলুষিত প্রশাসনকে পরিস্থিতি বিদুরিত করতে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করতে হবে। ব্যাপক গণআন্দোলন ব্যতীত বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রতিকার সম্ভব নয়। এজন্য নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলনের বিকল্প নেই।

দুর্নীতি দমনে কিছু সুপারিশমালা

* দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে সবচাইতে প্রথমে যেটি করা দরকার তা হলো প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষত্রে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।
* দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো কার্যকর করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় অবশ্যই নির্বাচিত সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সিভিল সোসাইটিকেও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* দুর্নীতির কারণ, গতি-প্রকৃতি, পরিধি, প্রকার, ও প্রতিকারের ওপর ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এসব গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
* সরকারী ও বিরোধী দলকে নিশ্চিত করতে হবে তাদের দলে দুর্নীতির অতীত ইতিহাস আছে এমন কেউ যেন স্থান না পায়।
* জনপ্রশাসনে দুর্নীতি কমাতে দ্রুততার সাথে এর সংস্কার সাধন করা জরুরী।
* সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং এর জন্য অবশ্যই নিয়োগ এবং পদোন্নতি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও যৌক্তিক হওয়া প্রয়োজন।
* দুর্নীতি মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে দুর্নীতির মামলাগুলো অতি দ্রুততার সাথে সুরাহা করা যায়।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করে নতুন নতুন আইন পাশ করতে হবে এবং নতুন আইনগুলোকে বাস্তবে কার্যকর করতে হবে, যাতে যে কেউ আইনের ভয়ে দুর্নীতি করা থেকে বিরত থাকেন।
* আমাদের দেশে দুর্নীতির শাস্তি হিসেবে ক্লোজ, বদলি, বরখাস্ত, স্ট্যান্ড রিলিজ ও ও,এস,ডি করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দেখা যায় যে বদলীপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা টাকার বিনিময়ে কিংবা প্রশাসনিক তদবিরের মাধ্যমে চাকরিতে পূনর্বহাল হন। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি পরায়ণদের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
* জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে।
* সরকারি অফিসে বিভিন্ন ফাইল ও দলিলপত্রে 'একান্ত গোপনীয়', 'সাধারণ ভাবে গোপনীয় 'সংরক্ষিত গোপনীয়' লেখার সংস্কৃতি বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেক্টস অ্যাক্ট সংশোধন করতে হবে।
* স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা এবং সততা বিষয়ক শিক্ষা যুক্ত করে দুর্নীতি-বিরোধী চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলা প্রয়োজন।
* দ্রব্য মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ।
* কর্মকর্তা নিয়োগের সময় বাসস্থান এবং যানবহনের নিশ্চয়তা প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্লীল চলচ্চিত্র বন্ধ করার পদক্ষেপ

- বাংলাদেশে এখন চলচ্চিত্রের এক অস্থির সময় চলছে। এখন ছবি বলতেই লোকে বোঝে অশ্লীলতা। তাই সরকারের উচিত জাতীয় সংসদে অশ্লীল ছবি প্রদর্শনী রোধে একটি সময় উপযোগী বিল উত্থাপন করা এবং এসংক্রান্ত নতুন আইন প্রনয়ন করা। বর্তমানে ছবি সেন্সর হয় ১৯৬৩ সালের সেন্সর নীতিমালায় অনেক পুরনো নীতিমালা হওয়ায় এর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধ সমর্থিত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতিমালা প্রনয়ন করা দরকার।
- পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও জেলা তথ্য অফিসারকে ছবি বলতেই পোস্টার ফটোসেট জব্দ করার ক্ষমতা প্রদান করা দরকার।
- অশ্লীল ছবির শিল্পী-কলাকুশলী ও প্রদর্শকের সর্বোচ্চ ৩ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ড প্রদানের বিধান সহ মোটা অংকের জরিমানা বাধ্যতামূলক করা।
- অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শন করলে প্রতিদিনের জন্য মোটা অংকের টাকা হারে জরিমান করা।
- প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এসব মামলার বিচার হবে।
- সেন্সর বোর্ডের বক্তব্য না শুনে কোনও আদালতের পক্ষে একতরফাভাবে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাবে না।

এছাড়া চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ও ঘুষ-উৎকোচ সহ অনাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মহা নবী (দঃ) এর আদর্শ তথা আল হাদীসের আলোকে আরো কতিপয় সুপারিশ হচ্ছে-

১. আল-কুরআন ও আল-হাদীসে বর্ণিত পূর্বযুগের অবাধ্য ও অনাচার জাতির শোচনীয় পরিণতির কথা দেশের জনসাধারনের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

২. ইসলাম প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাই সমাজে অনাচার সংঘটিত হবার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই বন্ধ করতে হবে।

৩. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনাচার এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে Media বই পুস্তক, পত্রিকা বা অন্যান্য মাধ্যমে জাতির সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

৪. কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে।

৫. ইসলামী শরীয়াভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে অনাচারকারীদের দ্রুত ও সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

৬. পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিধানের যথাযথ চর্চা করা; সন্তানদের বাল্যকাল থেকেই ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার আচরনে অভ্যস্ত করে তোলা; সমাজ পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে এমন নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌ভীতি জন্ম নেয় এবং অপরাধের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. অনাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে কেউ মারা গেলে তিনি শহীদ হবেন এবং জান্নাতে যাবেন। এই বিশ্বাস সবার হৃদয়ে দৃঢ় করতে হবে।

৮. যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৯. কারাগারকে চরিত্র সংশোধন এবং তাকওয়া চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

১০. জেল ফেরত আসামীদের পূনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

১১. আন্তর্জাতিক অনাচারচক্র নস্যাৎকরণ, গডফাদারদের অপশক্তির উৎখাতকরণ সাধারণ অনাচার কারীদেরকে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের দিকে ফিরে আসার সুযোগ দান এবং তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পূনর্বাসিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সুস্থ, সুন্দর এবং নৈতিক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগনের হৃদয়ে অনাচারের প্রতি ঘৃণা, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্বশিলতা-তথা সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটানো।

১৩. সমাজে অবহেলিত ইয়াতিম বিধবা, শহরের নিঃস্ব টোকাই ও অসহায় জনগোষ্ঠী, দুর্যোগ কবলিত ও দুঃস্থ মানুষের নিরাপত্তা বিধান, তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন, নারী কল্যাণ, যুব কল্যাণ, শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচী, ভিক্ষুক ও ছিন্নমূল মানুষের পূনর্বাসন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

১৪. সদ্য স্বাধীন প্রাপ্ত বিচার বিভাগকে সকল প্রকার কু-প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে সকল পর্যায়ে ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নয় বরং আল্লাহ পাকের কাছে তার সকল কৃতকর্মের জবাবদিহিতা করতে হবে এই ন্যায়ানুভূতি সকল বিচারকের অন্তরে লালন করে চলা ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে, পরিপূর্ণ জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূল পাক (সাঃ) এর উপর তা সর্ব কালের ও সর্বযুগের মানব জাতির সকল ধরনের সমস্যার সমাধান সহ যে কোন বিপর্যয় ও কঠিন বিপদ থেকে উত্তোরনের সক্ষম দিক নির্দেশক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক বিপর্যয়ের বর্তমান সময়ের এক মারাত্মক পরিস্থিতি হিসেবে বহুল পরিচিত বাংলাদেশের 'সামাজিক অনাচার' প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার প্রেরিত রিসালাত একমাত্র মহৌষধ। সৃষ্টির জন্য যা চির কল্যাণকর সৃষ্টি কর্তার চেয়ে তা ভাল জানার কেউই নেই। মানবীয় কর্মকান্ডের দ্বারা সৃষ্ট অশোভনীয় গর্হিত আচরণ সমুহ সামাজিক অনাচার রূপে ঘাতক ব্যাধিতে পরিনত হওয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রিসালাত নামক গাইডবুক এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রেসক্রিপশন বর্তমান সময়ের একমাত্র দাবি। এদেশের চলমান সামাজিক অনাচার সমুহ প্রতিরোধে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত- পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু-সুন্দর ও সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অনুপম দৃষ্টি ভঙ্গি যা এ অভিসন্দর্ভে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার সাধারণ সেন্টিমেন্ট হচ্ছে ইসলাম সমর্থিত আদর্শে পথ চলা বা 'ইসলামিক আইডিওলোজিকে' সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা। তাই কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের 'সামাজিক অনাচার' এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা এদেশের সর্বস্তরের মানুষের একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের চলমান অনাচার গুলো সামাজিক ভাবে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে তেমনি সামাজিক সমস্যা গুলোও কঠিন ও ঘৃণ্য 'সামাজিক অনাচার' সংঘটিত হতে সহায়তা করে। তাই বাংলাদেশের 'সামাজিক অনাচার' ও সমস্যা পরস্পর নির্ভরশীল, সম্পর্কযুক্ত এমনকি একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক । দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা, শ্রম ও পারশ্রমিক সমস্যা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, ভিক্ষকু ও ভবঘুরে, আগ্রাসী যুদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলো বিভিন্ন সামাজিক অনাচার যেমনঃ-নারীও শিশু নির্যাতন চুরি-ডাকাতি, নৈরাজ্য-সন্ত্রাস, ছিনতাই, মাদক-মাদকাশক্তি, সুদ ও সুদ প্রথা, ঘুষ, উপঢৌকন, অশ্লীল প্রকাশনা, অসুস্থ চলচ্চিত্র সহ আরো অনেক সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি কারী ও সমাজ বিধ্বংসী অনাচার এর বিস্তার ঘটায়। আমাদের দেশের সামাজিক অনাচার গুলো ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল এবং বহুমাত্রিক এদেশের সামাজিক অঙ্গঁনে অনাচার এর পরিধি পরিমান ব্যাপক ও অনেক হলেও মৌলিক ভাবে সামাজিক অনাচার হিসেবে এ গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়গুলোকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল অনাচার সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অর্থনেতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক ও মানসিক কারণ সমূহ বর্তমান।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়ানক পরিস্থিতি শুধু বাংলাদেশেই নয় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান অনাচার হিসেবে বিবেচিত। কন্যা শিশুদের প্রগতি, উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন ও সঠিক অধিকার নিশ্চিত করনের সস্তা বিজ্ঞাপণ দিয়ে বিশ্বের ডিক্টেটর রাষ্ট্র গুলো নারীদের পর্নোগ্রাফিতে পরিনত করে এদেশের কোমলমতি মানুষের হৃদয়ে পরোক্ষভাবে নারী ও শিশু নির্যাতনের বীজ বপন করছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা হচ্ছে- শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি উৎসাহ দান, নারীকে অর্থপার্জনের অধিকার দান, উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন, যৌতুক প্রদান নয় মোহরানা গ্রহনের অধিকার প্রদান, মর্যাদা ঘোষণা, স্বামী গ্রহণ ও যুক্তি যুক্ত কারনে তালাক প্রদানের অধিকার দান, একাধিক বিবাহ নিয়ন্ত্রণকরণ, স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান, পর্দার বিধান প্রদান, অশ্লীলতা নিষিদ্ধকরণ, শিশু শ্রম নিষিদ্ধ প্রভৃতি ।

বিশ্বের প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ মাদকের শিকার। আমাদের দেশে এ সংখ্যা ১৩ লক্ষাধিক। ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, রাহাজানী, ছিনতাই, সামাজিক অবক্ষয়, সড়ক দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি অন্যতম প্রধান কারণ এই মাদকাসক্তি। এ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ, তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতির লালন, মাদকা সক্তির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি সম্পর্কে সবাইকে সতর্কীকরণ, এবং মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারজাত করণকে সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধকরণ একান্ত আবশ্যক।

দুর্নীতিকে বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় অনাচার হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমনে ইসলাম প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সমাজে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার বা তার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দেয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী বিধানের পূর্ণ অনুসরণ তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতির লালন এবং পরকালমুখী জীবন গঠনের আহবান জানিয়েছে। এরপরেও দুর্নীতি সংঘটিত হলে ইসলাম প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা তথা শাস্তির বিধান দিয়েছে। ইসলামের প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক' ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এ দেশ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ সম্ভব।

সমাজে সন্ত্রাসী আগ্রাসন এক ভয়ংকর অনাচার রূপে পরিচিত। একজন মানুষ জন্মের পরই সন্ত্রাসী হয়না। সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতি তাকে সন্ত্রাসী হতে সাহায্য ও বাধ্য করে। কিন্তু সকলে তো সন্ত্রাসী হয়না। সুতরাং যারা সন্ত্রাসী হয় তারা নিজেরাই সন্ত্রাসী হবার পথটিতে কোন না কোন ভাবে আত্মসমর্পিত হয়েছে। সন্ত্রাস নামক অনাচার সৃষ্টির কতিপয় কারণ যেমন- নৈতিক অবক্ষয়, দুনীতি, অভিভাবকদের অবহেলা, প্রভাবশালীদের মদদ, প্রশাসনের দুর্বলতা, আইনের শিথিলতা, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, অবৈধ ব্যবসা হতে অর্জিত বিপুল মুনাফা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাঞ্চনা বঞ্চনার শিকার, প্রেমে ব্যর্থতা, হতাশা, মাদকাসক্তি এবং সমাজের প্রতিবাদের সক্রিয় ক্ষেত্র না থাকা প্রভৃতি। সন্ত্রাস নামক সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, সামাজিক পারিবারিকভাবে প্রতিবাদের ক্ষেত্র গড়ে তোলা, সন্ত্রাসীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ, প্রশাসনকে যথাযথ দায়ীত্ব পালনে সচেষ্ট করা প্রভৃতির মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বিদূরিত করা মোটেই অসম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

চুরি-ডাকাতি সমাজের সু-সম্পর্কের ভিত্তি দূর্বল করে। এদেশের অধিকাংশ চুরি-ডাকাতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দারিদ্র্যতাকে। পেশাদার চোর-ডাকাত থাকলেও সংখ্যায় নগণ্য। দারিদ্র্যতা কমিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা, উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত, কর্মের প্রেরণা দান, শ্রমের যথাযথ মজুরীদানের ভিত্তিতে অভাব-অনটন লাঘবের মধ্যদিয়ে ইসলাম চুরি ডাকাতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখিয়েছেন। তার পরেও অভাবের কারনে নয় পেশা হিসেবে চুরি করলে ইসলামে হাত কাটার এবং ডাকাতির জন্য চার প্রকারে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু ক্ষুধা, অভাব অনটনের তাড়নায় চুরি ডাকাতির জন্য হাত কাটাসহ যে কোন কঠিন শাস্তি লাঘব করে অনাচারকারীকে পূনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছেন ইসলাম। ইসলাম নির্দেশিত পথে সমাজ পরিচালিত হলে এদেশের চুরি-ডাকাতির কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকতে পারেনা।

ছিনতাই আপাতঃ দৃষ্টিতে একটি স্বতন্ত্র অনাচার হিসেবে পরিচিত থাকলেও মূলতঃ এটি ডাকাতি, রাহাজানির আধুনিক রূপ। ছিনতাই আধুনিক সভ্যতার করুণ অভিশাপ। এর ফলে ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে, বিমানে সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা চরমভাবে বিরাজ করছে। হাইজ্যাক বা ছিনতাই সমাজ জীবনে চরম দুর্যোগ তথা মহাবিপদ ডেকে আনে। ছিনতাই, অপহরণ, হাইজ্যাক সম্পর্কিত ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও দন্ডবিধি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।

কিছু সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত এ দেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাই সুদ ভিত্তিক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদকে হারাম ঘোষণা সহ সুদী কারবারীর বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। সুদ সামাজিক শোষনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণী আরো দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরো ধনী হয়। সুদের ক্ষতিকর দিক কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। সুদের এ মহা বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবীদগণও শিউরে উঠছেন। তাই এ দেশের সামাজিক অনাচার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদকে নিষিদ্ধি ঘোষণা করা একান্ত অপরিহার্য ।

ঘুষ, উৎকোচ ও উপঢৌকন অত্যন্ত পরিচিত অনাচার। যে কোন স্তরেই এর কম বেশী উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষই ঘুষ নামক সহজ ব্যবসার সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে কোন ভাবেই। ঘুষ গ্রহনের অভিযোগে সরাসরি প্রশাসনের হাতে ধরা পড়েছে অনেক সরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে অনেক ঘুষ গ্রহীতা। অথচ ঘুষ, উপঢৌকন অনাচার কেলেংকারীতে লজ্জাবোধ করছেনা অনাচারে জড়িতরা।

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিরাজ করছে এক অস্থির অবস্থা। এদেশের উদীয়মান তরুন তরুনীরা ছবি, নাটক, উপন্যাস, গল্পসহ যে কোন কাব্য কবিতায় অশ্লীলতার বিষয়টি অনুসন্ধান করে সর্ব প্রথম। আর সমস্যাই বা কোথায় আকাশ সংস্কৃতি, মোবাইল সংস্কৃতি বর্তমানে অশ্লীলতা ও অনাচারকে সহজলভ্য করে দিয়েছে। কবি-সাহিত্যিক, লেখক-লেখিকা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ অশ্লীলতা, নির্লজ্জতাকে ব্যবসায়ী বাজারে চমকপ্রদ পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। নভেল নাটক, উপন্যাস, সামগ্রী এবং এদেশের ছায়াছবি গুলোর নামকরনের মধ্যেই রয়েছে যুব সমাজের নৈতিকতা ধ্বংসের হাতছানি। তাই এগুলো থেকে পরিত্রানের জন্য ১৯৬৩ সালের অত্যন্ত পূরাতন সেন্সর নীতিমালার আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন করা, লেখক-লেখিকা, কবি সাহিত্যিকদের অশ্লীল, নির্লজ্জ লেখনী, কুরুচীপূর্ণ ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা, চলচ্চিত্রের কলা-কুশলীদের প্রয়োজনে শাস্তিসহ আর্থিক জরিমানা, তাদের দেশান্তর করা, অশ্লীল প্রকাশনা ও নোংরা চলচ্চিত্রের পান্ডুলিপি, ছবি, পোষ্টার, ফটোসেট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জব্দ করা, সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলা। সর্বোপরি নৈতিক,আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকদের এ অনাচার থেকে মুক্ত রাখা।

মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের 'সামাজিক অনাচার' আমাদের জাতীয় ব্যাধি। এ অনাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এদেশের সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ইসলাম যে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে, কুরআন-হাদীসের নীতিমালার আলোকে তা বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে এ দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও অনাচার মুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব হবে। এটাই হোক আমাদের একমাত্র আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রত্যয় ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায় হউন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম

২. সাইয়েদ আবুলআলা মওদূদী (রহঃ) : অনুবাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহঃ) তাফহীমুল কুরআন (১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১৮তম খণ্ড)।

৩. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম: তাফসীরে নূরুল কোরআন, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম, ২য়, ৩য় ও ২৬তম খণ্ড।

৪. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী: তাফসীরে সাঈদী, প্রকাশক, গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল-বুখারী: সহীহুল বুখারী।

৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী: সহীহু-লি মুসলিম।

৭. আবূ আব্দুর রহমান আহম্মদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ: সুনানুন নাসাঈ।

৮. আবূ-ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী: সুনানুত তিরমিযী।

৯. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস- সিজিস্তানী: সূনানু আবী দাউদ

১০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাযাহ আল-কাযভীনী: সূনানু ইবনে মাজাহ।

১১. স্যামুয়েল কোনিগ: সমাজ বিজ্ঞান অনুবাদক, ড. রঙ্গলাল সেন, জে. কে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স।

১২. শরীফ আহমদ: ইতিহাস ও সামাজ চিন্তা।

১৩. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা।

১৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ: ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, ঢাকা শিরীন পাবলিকেশন্স।

১৫. শহীদ সৈয়দ কুতুব (মিসর): ইসলাম ও সামাজিক বিপ্লব, কেরামত আলী নিজামী কর্তৃক অনুমোদিত, ঢাকা শিরীন পাবলিকেশন্স।

১৬. সৈয়দ শওকতুজ্জামান: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা।

১৭. প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান, আসম সালাহ উদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম: বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা হাসান-বুক হাউস, ২০০১ খ্রি.)।

১৮. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন: আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদিসের ভূমিকা, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

১৯. আতিকুররহমান, স্নাতক সমাজ কল্যাণ, (ঢাকা কুরআন মহল, ১৯৯০ খ্রি.)।

২০. খান সিরাজুল হোসেন উপমহাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত।

২১. রেবতী বর্মন: সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

২২. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির: কোরআন চিরকাল আধুনিক (সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স)।

২৩. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরি, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রাহমান খান: উচ্চমাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান।

২৪. বি.এম জাকির হোসেন: ডিগ্রী সমাজ বিজ্ঞান (প্রথম পত্র)।

২৫. ড. অজয়েন্দ্র নাথ সরকার, উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, পরিবেশক, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. ড. ইউসুফ আল কারযাভী: মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম (কায়রো মাকতাবায়ে ওহারা ১৯৮৬ খ্রি.)।

২৭. Upendranath Tagor: Corruption in Ancient India, মোঃ আতিকুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকা আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০)।

২৮. ড. ইউসুফ আল কারযাভী কর্তৃক উদ্ধৃত: ইসলামে হালাল হারামের বিধান, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৯ খ্রি.)।

২৯. অধ্যক্ষ হাওলাদার আব্দুর রাজ্জাক: মহানবী (সাঃ) এর অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব অগ্রপথিক (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলদেশ, জুন ১৯৯৫ খ্রি.)

৩০. বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম সংখ্যা)

৩১. শিলনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ

৩২. বিনয় ঘোষ: সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র-১৯৬৬ খ্রি.

৩৩. সোনিয়া নিশাত আমিন: বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৭৬-১৯৩৯ খ্রি.)

৩৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন: সুদ, সমাজ অর্থনীতি (ঢাকা: ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ১৯৯২ খ্রি.) ।

৩৫. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (২য় খণ্ড) ১৯৮২ খ্রি. ।

৩৬. আবুল আলা আল জিহাদ উদ্ধৃত, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নজির: রাজনৈতিক আন্দোলোন, সন্ত্রাসবাদিতা ও ইসলাম "মাসিক মদিনা", সেপ্টেম্বর ২০০১ খ্রি.।

৩৭. মাওলানা সাইয়্যেদ জালাল উদ্দিন আনসার উমরী: ইসলামী সমাজে নারী অনুবাদ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী-১৯৯৮ খ্রি.)।

৩৮. সাইয়্যেদ সাবেক: ফিকহুস সুন্নাহ (কায়রো: দারুল ফাতহ লিল ইলমিল আরাবী, ১৯৯০ খ্রি.)।

৩৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম: অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম: আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.।

৪১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম: নারী: ঢাকা সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.।

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম: পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.।

৪৩. অধ্যাপক, কে আলী. ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা আলী পাবলিকেশন্স ১৯৮৫ খ্রি.।

৪৪. আল্লামা মহিউস্ সুন্নাহ বাগবী (রহঃ): মিশকাতুল মাছাবীহ।

৪৫. হুমায়ুন আযাদ: নারীর সামাজিক অবস্থা ।

৪৬. সুলতানা কামাল: আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, জুন-১৯৯৮ খ্রি.।

৪৭. দীপংকর মোহান্ত: লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ।

৪৮. সংবাদপত্র পরিবীক্ষন ২০০৬, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত ।

৪৯. হুমায়ুন আযাদ: নারী।

৫০. বেইজিং + ১০, সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদন, বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. মুহাম্মদ সামাদ: মাদকাসক্তি এবং মাদক দ্রব্য চোরাচালানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা , ৪৪ সংখ্যা , ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ খ্রি.)

৫২. এ. কে. নাজিবুল হক: মন ও মনোবিজ্ঞান, সম্পাদনা এ. খালেক ও এ. ইউ. আহমেদ (ঢাকা ১৯৮৯ খ্রি.)।

৫৩. এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল ১৯৯৯ খ্রি.)।

৫৪. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম: সমাজকল্যাণ অনুক্রম (ঢাকা-১৯৯৫ খ্রি.)।

৫৫. আব্দুল মতিন: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন , (ঢাকা মাদক প্রকাশনী-১৯৯০ খ্রি.)।

৫৬. আব্দুল হাকিম সরকার প্রমূখ: বাংলাদেশ মাদকাসক্তি সমস্যা: সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৭০, অক্টোবর-২০০৪ খ্রি.)।

৫৭. এস.ই হক: মাদকাসক্তি: জাতীয় ও বিশ্ব প্রেক্ষিত (ঢাকা ছায়া প্রকাশনা-১৯৯৩ খ্রি.)।

৫৮. শাহীন আক্তার: মাদকদ্রব্য ও বর্তমান বিশ্ব (ঢাকা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-১৯৯০ খ্রি.)।

৫৯. মাওলানা এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম: ইসলামে নেশা , (ঢাকা: মা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.)।

৬০. আবু তালেব: হেরোইন : আর এক মারণাস্ত্র (খুলনা: আমরাবতী প্রকাশনী-১৯৮৮ খ্রি.)।

৬১. মানস রায় চৌধুরী: জেনে শোনে বিষ করেছি পান, দেশ পত্রিকা (ঢাকা: ৫৫ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, গত জুলাই ১৯৮৮ খ্রি.)।

৬২. মীর আফরোজ জামান: মাদকের ভয়াল ধ্বংসের মুখে যুব সমাজ, সাপ্তাহিক রোববার (ঢাকা: ২৬ সংখ্যা এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.)।

৬৩. আলী হাসান: শতাব্দীর অভিশাপ ড্রাগশক্তি: বিপন্ন তারুণ্য , মাসিক রোকসানা (ঢাকা: আগস্ট-১৯৮৮ খ্রি.)।

৬৪. মোঃ আবু তাহের: মাদকের অপব্যবহার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (ঢাকা: মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)।

৬৫. নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মাসিক গণস্বাস্থ্য), (ঢাকা: ৮ম সংখ্যা-১৯৮৫ খ্রি.)।

৬৬. মোহাম্মদ হাসান: মাদকাসক্তি নিরাময় পরিবারের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ।

৬৭. বশিরা মান্নান: বাংলাদেশে মাদকাসক্তি নিরাময়ে পরিবার ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন (ঢাকা: বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য বিরোধী ফেডারেশন, ১৯৯৪ খ্রি.)

৬৮. Upendranath tagor : Corruption in ancient India মোঃ আতিকুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত, বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকা: আল কুরআন পাবলিসেন্স, ২০০০ খ্রি.)।

৬৯. জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা : "দুর্নীতির স্বরূপ ও পুলিশ প্রশাসন" প্রকাশক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ খ্রি.) প্রকাশ ম্যাচ লাইন মিডিয়া সেন্টার ।

৭০. চৌধুরী মজুমদার: বাংলাদেশ দুর্নীতির আধামিশ্র অভয়াশ্রম ; Bangladesh Journal of Political Economy, Vol, 17.

৭১. মাওলানা আবু তৈয়ব আব্দুল্লাহ পুরী : প্রসঙ্গ- সন্ত্রাস ও একটি সমীক্ষা মাসিক মঈনুল ইসলাম, সেপ্টেম্বর, ২০০৪ খ্রি.।

৭২. ফরহাদ মজহার : " সন্ত্রাস আইন ও ইনসাফ " প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত।

৭৩. মোঃ আবদুল কাদের মিয়া : "সন্ত্রাস ও অপরাধ প্রতিরোধ বিধান" এ.কে প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশ কাল- জানুয়ারি, ১৯৯৩ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. ম. আবু তাহের : অধ্যাপক সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটি মতামত পর্যালোচনা।

৭৫. এন.এস.এফ. প্রচারপত্র. ঢাকা: জানুয়ারী ১৯৬৯ খ্রি.।

৭৬. কামরুল হাসান মঞ্জু : গবেষণা প্রতিবেদন ; চলচ্চিত্র সন্ত্রাস ও যুব সমাজ ।

৭৭. শফীকুররহমান: অর্থনৈতিক চিন্তা-ধারা ক্রমবিকাশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি-১৯৮৮ খ্রি.)।

৭৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী: সুদ ও আধুনিক ব্যাংক .অনু আব্বাস আলী খান ও আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা আধুনিক প্রকাশনা, ১৯৭৯ খ্রি.)।

৭৯. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী: শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা, যৌনতা ও অশ্লীলতা।

৮০. শুধাংশু রঞ্জণ ঘোষ : লেডি চ্যাটালিজ লাভার নিয়ে 'মামলা' প্রকাশক: খোশরোজ কিতাব মহল ঢাকা-১৯৮৬ খ্রি.।

৮১. সৌমেন দাস : চলচ্চিত্রে সন্ত্রাস ও যুব সমাজ প্রকাশকাল জুলাই-২০০৪ খ্রি.।

৮২. Harold Greenberg : "Social Environment and Behaviour"

৮৩. সামাজিক গবেষণা, পদ্ধতি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ, মুরশিদ আল হাসান, কল্লোল প্রকাশনী।

৮৪. মাহমুদা ইসলাম : সামাজিক ইতিহাসের পটভূমি।

৮৫. আবদুল খালেক : নারী ও সমাজ (ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

৮৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : ইসলামে যাকাতের বিধান, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশন-১৯৯৫ খ্রি.।

৮৭. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) : ইসলামী অর্থনীতি, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী-১৯৯৪ খ্রি.।

৮৮. অধ্যাপক গোলম আযম: যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.।

৮৯. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস: সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ঢাকা মুক্তমন প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.।

৯০. মাওলানা সাইয়েদ জামাল উদ্দীন আনসার উমরী: ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদ মোজাম্মেল হক, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনা-১৯৯৮ খ্রি.।

৯১. মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী: ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ঢাকা আল হেরা প্রকাশনী-১৯৯২ খ্রি.।

৯২. সৈয়দ বদরুদ্দোজা : হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তার শিক্ষা ও অবদান, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-১৯৯৭ খ্রি.।

৯৩. BBS, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1989 (Dhaka Ministry of Planning Govt. of Bangladesh.

৯৪. G. Foster : Traditional culture and Impact of Technological change (New York; Harperand Brothers Publishers, 1962)

৯৫. John J Hader and Eduard C Lindeman : 'Dynamic Social Research'.

৯৬. David Dressler : Sociology; The study of human Interaction, (New York; Alfred A Knopt Inc 1969)

৯৭. Samuel Koenig : Sociology; An Introduction to the Science of Society. (New York ; Barmes & Noble Inc 1968).

Dhaka University Institutional Repository

৯৮. Kimbal Young W. Mack Raymond : Sociology and Social Life, (New York, 1962).

৯৯. E- Roab and G. J selsnick major Social problem (New York; Row Peterson Co. 1959)

১০০. John J Hoder and Eduard C lindeman. " Dynamic Social Research".

১০১. P. Sorokin : Contemporary Sociology theories (New York, Harper and Row, 1984).

১০২. S. M. Miller and Pamela Rofby: Poverty changing Social Stratification, New York 1965).

১০৩. Raja Rammohon Roy : The Life and Letters. Edition by Dilip Kumar Bissas, Paravat Chandra Ganguly, 1962.

১০৪. J.C. Marsh man : The Life and Timed of Carey, Marsh man and word (VOL. II), 1859.

১০৫. B. Klienmuntj Essential of Abnormal psychology (New York; Harper and Row publishers 1974).

১০৬. Bucher (Est all). The Fundation of health Meredith (New York publishing Company. 1967).

১০৭. A. Huxly : The Door of Perception (London: Chalt and Windus. 1954).

১০৮. Roben K. Merton and Robert Nesbet (Eds): Contemporary Social Problem, (New York; 1971).

১০৯. Report on the study of Drug Abuse Among the stuedent in Dhaka City: Prevalance and Related Factors' 1991 Dept of Psychiatry: (IPGMR).

১১০. World Bank Improving the Investment client in Bangladesh-2003.

১১১. Ramnath Sharma: India Social Problem (Bombay Media Promoter's and publishers pvt, Ltd.1942).

১১২. Robert Klitgard: 'Corruption as a System in the Next stage o Anti Corruption, Special Report. By Deniel Kaufman.

১১৩. Oxford Advance Learners Dictionary, Sixth Edition.

১১৪. Ashutosh day: Students favourite Dictionary New Edition, September-2003.

১১৫. Student development training guide, Publication; working for better life.

১১৬. Professor Hean : History of Economics Though (1964).

১১৭. Dr. Anwar Iqbal Quraishi : Islamabad the theory of Interest (Dhaka Islamic Foundation Bangladesh, 1987).

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. Iftekharuzzaman. Corruption and human Insecurity in Bangladesh, paper presented at the Seminar organized by transparency International Bangladesh to mark the International Anti Corruption Bay on 9th December.2006.
১১৮. AM Shah, BS Baviskar. EA Ramas Wamy : Social Structure and change.
১১৯. Armand Matteland : The Information Society.
১২০. Encyclopedia Britannica (1978, VOL: No-20).
১২১. The New English Bible, 1961.

পত্র-পত্রিকা

* দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।
* দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা।
* দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।
* দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।
* দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।
* The Bangladesh Observer's Dhaka
* সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা।
* সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা।
* সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা, ঢাকা।
* সাপ্তাহিক ছুটি, ঢাকা।
* সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ঢাকা।
* সাপ্তাহিক মুক্তধারা, ঢাকা।
* মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
* মাসিক মদীনা, ঢাকা।
* মাসিক পৃথিবী, ঢাকা।
* মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী।
* মাসিক তরজুমান, ঢাকা।
* মাসিক গণকেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

* মাসিক রোকসানা, ঢাকা।
* ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা।
* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা।
* শিক্ষাবার্তা, ঢাকা।
* গণ সাহিত্য, ঢাকা।
* নয়া পদধ্বনি, ঢাকা।
* দেশ পত্রিকা, ঢাকা।
* সিরাজুম মুনীরা পত্রিকা, ঢাকা।
* The Journal of Islamic Banking and Finance, Dhaka.
* The Islamic University Studies, Kushtia.
* World Development Report, 1997.
* UNESCO Seminar Report, Bankok, 1964.